NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

PG : POLITICAL SCIENCE

(PGPS)

PAPER - VIII
(Bengali Version)

MODULES : 1 - 4
(All Units)

POST GRADUATE
POLITICAL SCIENCE

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমত কোনো উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এর পর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর, প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায় ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

প্রথম সংস্করণ : মে, 2016

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় : রাষ্ট্রবিজ্ঞান স্নাতকোত্তর স্তর

[Post Graduate Political Science (PGPS)]

নতুন সিলেবাস (জুলাই, ২০১৫ থেকে প্রবর্তিত)

অষ্টম পত্র

এশিয়ার রাজনীতি এবং সমাজ ঃ নির্বাচিত অঞ্চলসমূহ

উপদেষ্টামণ্ডলী

অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্য

অধ্যাপক রাধারমণ চক্রবর্তী

অধ্যাপক কৃত্যপ্রিয় ঘোষ

ঃ বিষয় সমিতি ঃ

অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত

অধ্যাপক তপন চট্টোপাধ্যায়

অধ্যাপক অপূর্ব মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক সুমিত মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য

অধ্যাপক দেবনারায়ণ মোদক

অধ্যাপক বর্ণনা গুহঠাকুরতা (ব্যানার্জী)

অধ্যাপক মনোজ কুমার হালদার

পাঠ রচনা

পর্যায়	একক	রচনা
প্রথম	১-৪	অধ্যাপক কিংশুক চ্যাটার্জী
দ্বিতীয়	১-৪	মূল রচনা—অধ্যাপক রাজকুমার কোঠারি অনুসৃজন—অধ্যাপক সপ্তর্ষি পাল
তৃতীয়	১-৪	অধ্যাপিকা ঈশানী নস্কর
চতুর্থ	১-৪	অধ্যাপক ত্রিদিব চক্রবর্তী এবং অধ্যাপিকা তিলোত্তমা মুখার্জী

সম্পাদনা ঃ অধ্যাপক পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য

সম্পাদকীয় সহায়তা বিন্যাস এবং সমন্বয়সাধন ঃ অধ্যাপক দেবনারায়ণ মোদক এবং
অধ্যাপক মনোজ কুমার হালদার

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ড. অসিত বরণ আইচ

কার্যনির্বাহী নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ঃ স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

[Post Graduate Political Science (PGPS)]

পর্যায় ঃ এক ঃ পশ্চিম এশিয়া

একক	১	❑ আরব জাতীয়তাবাদ	7-26
একক	২	❑ পশ্চিম এশিয়ায় ধর্ম এবং রাজনীতি	27-45
একক	৩	❑ পশ্চিম এশিয়ায় তেলের রাজনীতি	46-55
একক	৪	❑ পশ্চিম এশিয়ার আঞ্চলিক রাজনীতি এবং আঞ্চলিক সংগঠনসমূহ	56-70

পর্যায় ঃ দুই ঃ মধ্য এশিয়া

একক	১	❑ মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহ : বৈশিষ্ট্য, সমস্যা ও সম্ভাবনা	71-84
একক	২	❑ মধ্য এশিয়ার নিরাপত্তা ও ভূ-রণনীতিগত বিষয়	85-101
একক	৩	❑ অর্থনৈতিক অবস্থান্তরের সমস্যাসমূহ	102-112
একক	৪	❑ মধ্য এশিয়ায় ইসলাম ও গণতন্ত্র	113-120

পর্যায় ঃ তিন ঃ এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চল

একক ১ ❑ এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের ধারণা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে তার তাৎপর্য 121-136

একক ২ ❑ নির্বাচিত কিছু এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের রাষ্ট্রে কর্তৃত্ববাদ, সামরিক-অসামরিক সম্পর্ক ও তাদের গণতান্ত্রিকরণের সম্ভাবনা ঃ ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স ও উত্তর কোরিয়া 137-145

একক ৩ ❑ এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের আর্থ-রাজনীতি 146-151

একক ৪ ❑ এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলে নৃকুলগত (Ethnic) সমস্যাসমূহ 152-166

পর্যায় ঃ চার ঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

একক ১ ❑ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্র এবং নাগরিক সমাজ ঃ একটি পর্যালোচনা 167-180

একক ২ ❑ প্রবাসী চীনাদের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশে বসবাস করার বিষয়ে আলোচনা ঃ মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের উদাহরণ 181-195

একক ৩ ❑ থাইল্যাণ্ড ও মায়ানমারের সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রনীতি 196-206

একক ৪ ❑ বিশ্বায়ন এবং ঠাণ্ডাযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংস্কৃতি 207-220

পর্যায় - ১

পশ্চিম এশিয়া

একক ১ আরব জাতীয়তাবাদ

একক ২ পশ্চিম এশিয়ায় ধর্ম এবং রাজনীতি

একক ৩ পশ্চিম এশিয়ায় তেলের রাজনীতি

একক ৪ পশ্চিম এশিয়ার আঞ্চলিক রাজনীতি এবং আঞ্চলিক সংগঠনসমূহ

পর্যায় - ১ : পশ্চিম এশিয়া

একক—১ ❑ আরব জাতীয়তাবাদ

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ আরব জাতীয়তাবাদ এবং নিখিল আরববাদ

১.৩ আরব জাতীয়তাবাদের ঐতিহাসিক ভিত —আল নাহ্‌দা

১.৪ আরব লীগ

১.৫ নাসেরবাদ

১.৬ সিয়োনিজম্ (Zionism)

১.৭ আরব জাতীয়তাবাদ এবং প্যালেস্টাইন সমস্যা

১.৮ আরব জাতীয়তাবাদের ভবিষ্যৎ

১.৯ নমুনা প্রশ্নাবলী

১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্যগুলি হল—

- আরব জাতীয়তাবাদ ও আরব রাষ্ট্রসমূহের জাতীয়তাবাদের পার্থক্য অনুধাবনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।
- রাজনৈতিক আন্দোলন হিসাবে আরব জাতীয়তাবাদের উত্থান ও বিকাশ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা।
- আরব লীগের উত্থান কিভাবে হয়েছে সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অবগত করা।
- সিয়োনিজ্‌ম-এর উত্থানের কারণ ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবগত করা।
- আরব জাতীয়তাবাদের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্যালেস্টাইন সমস্যার অবস্থান অনুধাবনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।

১.২ আরব জাতীয়তাবাদ এবং নিখিল আরববাদ (Pan Arabianism)

আরব জাতীয়তাবাদ বলতে বোঝায় একটি বৌদ্ধিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলন যার উদ্ভব হয়েছিল বিংশ শতকের গোড়ায়, উসমানী সাম্রাজ্যের আরব ভাষাভাষী অঞ্চলে। তুর্কি জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রিকরণমূলক প্রবণতার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আরব জাতীয়তাবাদের প্রবক্তাগণ মনে করতেন যে, সাম্রাজ্যের আরব ভাষাভাষী প্রজারা প্রকৃতপক্ষে একটি আরব জাতির অন্তর্ভুক্ত, যারা খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দের গৌরবোজ্জ্বল আরব সভ্যতার উত্তরাধিকারী, এবং এঁরা মনে করতেন যে এঁরা তুর্কি জনগোষ্ঠীর থেকে স্বতন্ত্র এবং তাদের অধীনতা থেকে মুক্ত থাকার যোগ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে উসমানী সাম্রাজ্যের পতনের আশায় এই মতের অনেক প্রবক্তাই সমগ্র আরব ভাষাভাষী মানুষকে একটি অখণ্ড আরব রাষ্ট্রের আওতায় আনার জন্য সচেষ্ট হয়েছিল।

তবে আরব ভাষাভাষী সব অঞ্চলগুলিই উসমানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আরব জাতীয়তাবাদ প্রসারের সময় এমন একটি ধারণা দানা বাঁধতে শুরু করে যে ভূমধ্যসাগরীয় পশ্চিম এশিয়া, আরব উপদ্বীপ এবং উত্তর আফ্রিকা মিলিয়ে একটি অখণ্ড আরব জাতি। আরব ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে—তা সে স্বাধীন রাষ্ট্র, উসমানী সাম্রাজ্যের বা অন্য কোনও রাষ্ট্রের অংশ হলেও—যে বৃহত্তর ভাতৃত্ববোধের জন্ম হয় তাকেই বলা হয় Pan-Arabism বা নিখিল-আরববাদ। আরব জাতীয়তাবাদের মত নিখিল আরববাদ যদিও কখনোই সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচি সম্বলিত একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপান্তরিত হতে পারেনি, কিন্তু তাও পশ্চিম এশিয়ার রাজনীতিতে আরব ভ্রাতৃত্বের অস্পষ্ট একটি চেতনার রেশ রেখে দিয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ব্রিটিশ এবং ফরাসি ম্যাণ্ডেট সরকার (লেবানন, সিরিয়া, প্যালেস্তাইন, ইরাক এবং টান্স-জর্ডান-এ) জাতিরাষ্ট্রের সৃষ্টি করে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকে সমর্থন যুগিয়ে ওই অঞ্চলটির নতুন মানচিত্র এঁকে আরব জাতীয়তাবাদের গতিরোধ করে দেয়। তবু আরব জাতীয়তাবাদ (এবং এক অর্থে নিখিল-আরববাদ) বিংশ শতকের মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, যাতে জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক বৈধতা প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট স্বৈরাচারী সরকারগুলির ভাগ্যের বিরুদ্ধে একটি প্রতর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। তাই, (বাথ পার্টি বাদ দিলে) রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভে আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিশেষ সফল না হলেও আরব জাতীয়তাবাদ বিংশ শতকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আন্দোলন হিসাবেই গণ্য হবে।

১.৩ আরব জাতীয়তাবাদের ঐতিহাসিক ভিত—আল নাহ্‌দা

আরব জাতীয়তাবাদের উৎস খুঁজতে হবে উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে কয়েকটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত উপাদানের মধ্যে। একদিকে আগ্রাসনবাদী রুশ সাম্রাজ্যের উন্নত সামরিক প্রযুক্তি এবং ব্যবস্থার সম্মুখীন হয়ে এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যের ইউরোপীয় প্রদেশগুলিতে খ্রীষ্টান প্রজাদের বিদ্রোহের মোকাবিলা করতে করতে ওই সময়ে উসমানী সাম্রাজ্য এক অস্তিত্বের সঙ্কটের মুখোমুখি হয়ে পড়েছিল। এই কারণে উসমানী সাম্রাজ্য তাঞ্জিমাত (সংস্কার) আন্দোলনের সূচনা করে, যার উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যের আধুনিকীকরণ করে আভ্যন্তরীণ এবং বাইরের বিপদের মোকাবিলা করা।

এক স্তরে তাঞ্জিমাত প্রকল্পের অর্থ ছিল সাম্রাজ্যের প্রবল কেন্দ্রিকরণ—ঐতিহাসিক ভাবে যে সমস্ত ক্ষেত্র সাধারণত প্রাদেশিক শাসকদের হাতে ন্যস্ত থাকত সেখানেও ইস্তাম্বুলের নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দেওয়া এবং সেই কারণে প্রাদেশিক স্তরে প্রবল বিক্ষোভের জন্ম। তাঞ্জিমাত আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল তুর্কী সামরিক পদাধিকারীরা এবং সনাতনী প্রাদেশিক এলিটগণ ছিল এই পরিবর্তনের ফলে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত—তাই তুর্কীভাষী দরবারের সঙ্গে আরবিভাষী প্রাদেশিকদের মনমালিন্য দেখা দেয়।

অন্য স্তরে তাঞ্জিমাত আন্দোলন আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন করেছিল, কারণ শিল্প-প্রযুক্তিতে ১৯ শতকের ইউরোপের প্রগতির সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত হবার জন্য এটি খুবই জরুরী ছিল। উসমানীরা তাই ফরাসি, ব্রিটিশ, জার্মান এবং মার্কিন শিক্ষাবিদদের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে অনুমতি দেয়। ফলস্বরূপ যে নতুন ধারণাগুলি ছড়াতে শুরু করে তার মধ্যে অন্যতম ছিল জাতীয়তাবাদ, যা জার্মানি এবং ইতালিতে সফল পরিণতি পেয়েছিল। সেই কারণে উসমানী কেন্দ্রিকরণ প্রক্রিয়া অনেকাংশেই সদ্যজাত তুর্কী জাতীয়তাবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়, যেখানে তুর্কী ভাষা এবং জাতিসত্বা সাম্রাজ্যের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর থেকে উৎকৃষ্ট বলে মনে করা হতে শুরু করে। এর ফলে সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলি থেকে আরবী ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে একটি প্রতিক্রিয়া জন্ম নেয়।

আরব জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয়েছিল ক্ষমতার কেন্দ্রিকরণ এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার যৌথ প্রভাবে। পাশ্চাত্য শিক্ষা সরকারী চাকরির জন্য আবশ্যিক সাব্যস্ত হওয়াতে যে সব আরবী ভাষাভাষী ছাত্রেরা ওই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলিতে যেতে শুরু করে তারা জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার সকাশে আসে। উসমানী নেতৃবর্গ নিজেদের ইসলামী সভ্যতার গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারক-বাহক বলে জাহির করতে সচেষ্ট ছিলেন।

আরবী ভাষাভাষী প্রাদেশিক বুদ্ধিজীবিরা প্রশ্ন তোলেন সেই গৌরব ম্লান হয়ে গেল কেন এবং পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টান শক্তির কাছে ইসলামের এবং পিতৃভূমির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন বলে তাঁরা উসমানীদের তীব্র সমালোচনা করেন। আরও উল্লেখযোগ্য ভাবে সেই প্রথম ইসলাম এবং ইসলামী সভ্যতার চমকপ্রদ বিস্তার শুধুই ধর্মের নিরিখে না দেখে আরবী ভাষার সঙ্গেও একাত্ম করে দেখা হতে শুরু করে এবং বলা হতে থাকে যে ইসলামী সভ্যতা প্রকৃতপক্ষে আরব সভ্যতা ছিল। সেই সূত্র ধরেই দীর্ঘ দিন পরে "আরব" সাংস্কৃতিক সত্বাটি আঞ্চলিক সুরি (সিরিয়ার বাসিন্দা), মিস্রি (মিশরের), বাগদাদী, মসুলি এবং বাস্রাওয়ি (বাসরার) সত্বার থেকেও বড় সাব্যস্ত হতে থাকে।

বোঝা দরকার যে আরব জাতীয়তাবাদ কোনও একমাত্রিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছিল না, এতে ন্যূনতম দুটি উপাদানের উপস্থিতি লক্ষণীয়। একদিকে ছিলেন তাঁরা যারা সতি আল-হাসরির (১৮৮০-১৯৬৮) অনুসরণ করে মনে করতেন যে আরবী ভাষার (এবং তার সঙ্গে যুক্ত সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ) মধ্যেই আরব জাতীয়তাবাদের মূল উপাদান নিহিত আছে—এই মতাবলম্বীদের বলা হত ওরবা ('Urba)। ওরবার প্রবক্তাগণ জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে একটি ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থান নিতেন, এবং মুসলিম খ্রীষ্টান নির্বিশেষে এক জাতির অন্তর্গত বলে মনে করতেন। আরব জাতীয়তাবাদের অপর এবং তুলনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ধারার প্রবক্তারা (যেমন শাকিব আরসালান বা আব্দাল রহমান আল-কাওয়াকিবি) মনে করতেন আরব সভ্যতার সঙ্গে ইসলামের যোগ অবিচ্ছেদ্য। তাই আরব জাতীয়তাবাদ কেবল ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতেই গড়ে উঠতে পারে, যা সাম্প্রদায়িক বিভাজনের ওপরে উঠতে আরবদের সাহায্য করবে।

আরব জাতীয়তাবাদের একটি স্পষ্ট শ্রেণী চরিত্রও ছিল। উসমানী সাম্রাজ্যের আরব প্রদেশগুলিতে যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটতে শুরু করে—তা সে প্রায় স্বাধীন মিশরেই হোক, বা বিলাভ আল-সাম (সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন), বাগদাদ, বসরা, মসুল—সাধারণত সরকারী চাকরীতে আগ্রহী সামাজিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় (যাদের বলা হত এফিন্দিয়া [effendiyah]) এর সুযোগ নিতে এগিয়ে আসে; খুব অল্পক্ষেত্রেই সনাতনী ভূস্বামী (আশ্রাফিয়া [ashrafiya]) সম্প্রদায়ের এতে কোন আগ্রহ দেখা যেত। নিজেদের কায়েমী স্বার্থের জন্য আশ্রাফিয়া শ্রেণী সাধারণত সাম্রাজ্যের আধুনিকীকরণের বিরোধিতা করত, এবং তাই এঁদের কোনও বৃহত্তর আরব চেতনার থেকে ক্ষুদ্রতর আঞ্চলিক সত্বার প্রতি বেশি টান ছিল। অন্যদিকে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এফেশিয়া শ্রেণী যারা প্রাদেশিক প্রশাসন এবং সামরিক বাহিনীতে যোগদান করতে শুরু করে এবং অর্থনীতির আধুনিক পরিসরে এবং নাগরিক সমাজে সক্রিয় হতে থাকে এবং কর্মসূত্রে সাম্রাজ্যের

বিভিন্ন প্রান্তে যেতেও শুরু করে, তাদের মধ্যে স্থানীয় চেতনার ওপরে এক আরব চেতনা জাগতে শুরু করে।

গৌরবময় ইসলামী সভ্যতা যে প্রকৃতপক্ষে আরবদেরই গৌরবগাথা এই মতের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন এফেন্দিয়া শ্রেণীর লোকেরা। তাঁরা মনে করতেন যে তুলনামূলকভাবে হীন জাতির (যেমন তুর্ক) অধীনতা স্বীকার করার ফলে কালক্রমে আরবরা তাদের গৌরব হারায়, কিন্তু সহজাতভাবে আরবদের সম্ভাবনা অনেক বেশি। আরব জাতীয়তাবাদীরা মনে করতেন যে আরব জাতি যেন নিছক ঘুমিয়ে রয়েছে, সেই ঘুম ভাঙলেই আবার তাদের শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলতঃ, ১৯শ শতকে এফেন্দিয়াদের উদ্যোগে আরব ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কার এবং আরব সাংস্কৃতিক প্রস্ফুটন ঠিক তেমনই এক পুনরুত্থান বলে দেখা হতে শুরু করে, যে কারণে এটিকে সাধারণত আল-নাহাদ (জাগরণ) বলা হয়ে থাকে। উনবিংশ শতকের শেষে মশ্রিক (পূর্বদিক, অর্থাৎ উসমানী লেভন্ট, মেসপটেমিয়া, মিশর), মঘ্রেব (পশ্চিম, অর্থাৎ মিশরের পশ্চিমে স্থিত উত্তর আফ্রিকা) এবং জজিরা (উপদ্বীপ, অর্থাৎ আরব উপদ্বীপ) সম্মিলিতভাবে একটি অখণ্ড আরব দুনিয়া বলে মনে করা হতে শুরু করে।

১৯০৮ সালের তরুণ তুর্কী বিপ্লব এবং তার পরবর্তী রাজনৈতিক কেন্দ্রীকরণ আরব জাতীয়তাবাদী চেতনাকে রাজনৈতিক রূপ দিয়েছিল। আরব আশ্রাফিয়া শ্রেণী তরুণ তুর্কীদের কেন্দ্রীকরণের রাজনীতির বিরুদ্ধে ছিলেন; এফেন্দিয়ারা কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে ছিলনা, কিন্তু তাঁরা সাম্রাজ্যের তুর্কীকরণ চায়নি। তাই তরুণ তুর্কী বিপ্লবের অব্যবহিত পরে আল-ফতাত, আল-অহদ প্রভৃতি এমন অনেকগুলি সংগঠন তৈরি হয় যেখানে আশ্রাফিয়া এবং এফেন্দিয়া উভয় শ্রেণীর সদস্যরা একত্রিত হয়ে একটি পৃথক আরব রাজনৈতিক বৃত্তের কথা ভাবতে শুরু করে যা সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে তৈরি করা গেলে ভাল, নচেৎ তার বাইরেই করতে হবে। ইস্তাম্বুল এবং দামাস্কাস (এবং খানিকটা বেইরুট) ছিল এই রাজনৈতিক প্রবণতার মূল কেন্দ্র। যদিও এই ধরণের অধিকাংশ গুপ্ত সমিতিই সীমিত পরিসরে গড়ে ওঠে স্থানীয় চেতনাকে কেন্দ্র করে, তবু তার মধ্যেই একটা "আরব স্বর" ছিল স্পষ্ট।

আরব জাতীয়তাবাদের পালে হাওয়া লাগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, যখন উস্মানীরা জার্মানির পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয়। প্রত্যুত্তরে মিশরকে—যেখানে ১৮৮২ সাল থেকেই ব্রিটেন প্রশাসনের ওপরে নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে রেখেছিল—ব্রিটেন protectorate বলে ঘোষণা করে এবং উসমানী সাম্রাজ্যের আরব প্রদেশগুলিতে অসন্তোষের আঁচ পেয়ে তারা বিদ্রোহে উস্কানি দিতে শুরু করে। কায়রো-স্থিত ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মক্কার মুফতি, হাশমি বংশোদ্ভূত শরীফ আল-হুসেনকে (যিনি ছিলেন হজরত মহম্মদের সরাসরি বংশধর) বিদ্রোহে উৎসাহ দিতে থাকে। কায়রো হুসেনকে কথা দেয় যে উসমানী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত

সমগ্র আরব ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি নিয়ে একটি আরব রাজ্য গঠিত হবে। দামাস্কাস এবং বাগদাদের রাজনৈতিক চক্রগুলিতে খোঁজ নিয়ে বিপ্লবের সম্ভাব্য সাফল্যের বিষয়ে আশ্বস্ত হয়ে ১৯১৬ শরীফ হুসেন আরব বিদ্রোহের সূচনা করেন। বিদ্রোহের ফলে হেজাজ অঞ্চল থেকে শুরু করে দামাস্কাস অবধি সমস্ত এলাকা উসমানী নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে যায়।

বসরা, বাগদাদ এবং দামাস্কাসের মত সুদূর প্রদেশেও আরব রাজনৈতিক এবং সামরিক এলিটবর্গ হাশমী পতাকার নীচে দাঁড়ানোর কারণে ঠিক যে সময়ে আরব জাতীয়তাবাদ চূড়ান্ত সাফল্যের সামনে দাঁড়িয়ে তখনই তাতে সব থেকে বড় ধাক্কা লাগে। ১৯১৬ সালে সম্পন্ন সাইক্স-পিকো সমঝোতা অনুসারে ব্রিটেন এবং ফ্রান্স তাদের নিজস্ব প্রভাবের বৃত্তগুলি স্থির করে ফেলেছিল; যুদ্ধ শেষের পরে শান্তি-চুক্তি সেই সমঝোতাকেই আইনি রূপ দিয়েছিল। তাই লীগ অফ নেশনস-এ স্থির হয়ে যে বৃহত্তর আরব জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে স্থানীয় আনুগত্যের ওপর দাঁড়ানো কতকটা সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদকেই স্বীকৃতি দেওয়া হবে। ফ্রান্সকে দায়িত্ব দেওয়া হয় সিরিয়ার জনগণকে স্বায়ত্তশাসনের যোগ্য করে তোলার—এই উদ্দেশ্যে ফ্রান্স অনতিবিলম্বেই খ্রীষ্টান-প্রধান ভূমধ্যসাগরীয় তটবর্তী অঞ্চলটিকে লেবানন প্রজাতন্ত্র এবং মুসলিম প্রধান আভ্যন্তরীণ এলাকাটিতে সিরিয়া প্রজাতন্ত্র সৃষ্টি করে। মেসপটেমিয়ায় অনুরূপ দায়িত্ব পেয়ে ব্রিটেন বসরা, মসুল এবং বাগদাদ প্রদেশগুলিকে একত্রে এনে ইরাকের জন্ম দেয় এবং শরীফ হুসেনের ছেলে এবং দামাস্কাস বিজয়ের নায়ক ফয়সলকে তারা রাজা ঘোষণা করে। সিরিয়ার থেকে প্যালেস্তাইন বিচ্ছিন্ন করে জর্ডান নদীর পূর্ব তটবর্তী জমিতে Transjordan রাজ্য সৃষ্টি করে ব্রিটেন হুসেনের অন্য ছেলে আব্দুল্লাহ-কে তারা রাজা ঘোষণা করে। জর্ডান নদীর পশ্চিম তট থেকে ভূমধ্যসাগর অবধি বিস্তৃত জমিতে ব্রিটেন ইহুদীদের জন্য একটি বাসভূমির অঙ্গীকার করেছিল। ফলে, অখণ্ড আরব রাজ্যের ধারণা প্রায় কর্পূরের মতই উবে গিয়ে একাধিক আরব রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

একাধিক আরব রাষ্ট্রের জন্ম হলেও, আরব জাতীয়তাবাদ শুধু টিকেই গিয়েছিল তা নয়, বিংশ শতাব্দীতে তা একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। উসমানী সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার পরে সৃষ্ট রাষ্ট্রগুলি মূলত এফেন্দিয়া গোষ্ঠীর সেই সব সদস্যের দ্বারা চালিত হয় যাদের হাতে জনশিক্ষার সামাজিক ভিত এতটাই প্রশস্ত হয় যাতে শিক্ষা সামাজিক উত্তরণের একটি বড় হাতিয়ার সাব্যস্ত হয়। যত বেশী সংখ্যক লোক শিক্ষা পেতে শুরু করে সামাজিক উচ্চাকাঙ্খাও ততটাই বাড়তে থাকে—লোকে ভাল জীবনের আশায় গ্রাম ছেড়ে শহরে এবং ছোট শহর ছেড়ে বড় শহরের দিকে পা বাড়াতে শুরু করে। কিন্তু প্রায় কোথাও-ই অর্থনীতি এদের সকলের জন্য কর্মসংস্থান করতে পারে এতটা উন্নত ছিল না। এহেন পরিস্থিতিতে সামাজিক ভাবে উচ্চাকাঙ্খী শিক্ষিত সামাজিক বর্গগুলি রাষ্ট্রীয় পরিষেবায় যোগ

দেয়—অর্থাৎ আমলাতন্ত্রে বা সামরিক বাহিনীতে। এই শ্রেণীর লোকেরা তাদের দেশের ওপরে পাশ্চাত্য শক্তিগুলির প্রভাব মেনে নিতে না পেরে বিভিন্ন র‍্যাডিকাল চিন্তাধারা অনুসরণ করতে শুরু করে—যেমন মিশরে নাসিরিয় সমাজতন্ত্র, সিরিয়া এবং ইরাকে বাথ মতাদর্শ—যা আরব ভাষাভাষী মানুষের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের কথা বলত।

র‍্যাডিকাল রাজনৈতিক মতাদর্শের উদ্ভব এবং সামসাময়িক (কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে চলতে থাকা) জাতীয়তাবাদী কিংবদন্তীর প্রজন্ম, উসমানী সাম্রাজ্যের ভাঙনের অন্য একটি পরিণামের জন্য তরান্বিত হয়েছিল। বহু শতাব্দী ধরে উসমানী সাম্রাজ্য ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তটবর্তী আরবিভাষী প্রদেশগুলি এবং উত্তর আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলকে একটি অখণ্ড বাজার রূপে ধরে রাখতে সহায়ক হয়েছিল যেখানে পণ্য, শ্রমিক এবং পুঁজি বিনা বাধায় চলাচল করতে পারত। উসমানী সাম্রাজ্যের ভাঙন এবং নতুন রাষ্ট্রসমূহের উত্থানের ফলে একাধিক রাজনৈতিক সীমান্ত সৃষ্টি হয়, ফলে অবাধে চলতে থাকা পণ্য, শ্রমিক এবং পুঁজির লেনদেন-এর পথে প্রথম বিধিনিষেধ জারি হতে থাকে। বণিক সম্প্রদায় যারা বহু শতক ধরে চলতে থাকা বাণিজ্যিক সম্পর্কগুলির ভিত্তিতে এতদিন ব্যবসা করে আসছিল পাশ্চাত্যের ম্যাণ্ডেটরি দেশগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা (অর্থাৎ সিরিয়া এবং লেবানন ফ্রান্সকে কেন্দ্র করে, মিশর, ইরাক, ট্রান্স-জর্ডন এবং প্যালেস্তাইন ব্রিটেনকে কেন্দ্র করে) এই নতুন ব্যবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এমন অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত লোকেদের মনে ম্যাণ্ডেটরি দেশগুলির দ্বারা শুরু করা ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি তীব্র বিদ্বেষ জমে থাকে, এবং এঁরা একটি অখণ্ড আরব বাজার-এর পক্ষে অবস্থান নেন। এর সঙ্গে যোগ হয় সদ্য সৃষ্ট রাজনৈতিক এলিট বর্গের ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ এবং সেই কারণেই তারাও একটি অখণ্ড আরব বাজারের আকাঙ্খা জিইয়ে রাখতে সক্ষম হয়।

বিশ শতকের মাঝামাঝি এই বিভিন্ন ধারাগুলির সমন্বয়ে আরব জাতীয়তাবাদ কাঠামোগতভাবে তার সাবেক রূপের তুলনায় অনেকটা ঢিলেঢালা কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে অনেক বেশী কার্যকরী সাব্যস্ত হয়েছিল। মধ্যপ্রাচ্যের স্বৈরাচারী শাসকরা তাদের অ-জনপ্রিয় নীতিগুলি অনেক সময়েই জাতীয় স্বার্থে রচিত বলে চালাবার চেষ্টা করেন। সেই ক্ষেত্রে আরব জাতীয়তাবাদ একটি প্রতি-তর্কের কাজ করে—অর্থাৎ নীতি মিশরীয় সরকারের সংকীর্ণ স্বার্থ সিদ্ধ করলেও, মিশরের আরব জনগণের স্বার্থে নাও হতে পারে। বস্তুত, একটি অখণ্ড সার্বভৌম আরব রাষ্ট্র নির্মাণে সফল না হলেও আরব জাতীয়তাবাদ অন্ততঃ তিনটি মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রের—নাসেরীয় মিশর, সিরিয়া এবং ইরাকি বাথ—শাসকগোষ্ঠী এর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

১.৪ আরব লীগ

উসমানী সাম্রাজ্যের ভাঙন, (ফরাসী ম্যাণ্ডেটের অধীনে) লেবানন এবং সিরিয়া, (ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেটের অধীনে) ইরাক, ট্রান্সজর্ডান, প্যালেস্তাইন এবং মিশরের উত্থানে ভূমধ্যসাগরীয় পশ্চিম এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকার অখণ্ড অর্থনৈতিক বৃত্ত সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ে। এই সমগ্র অঞ্চলটি মোটামুটি খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক থেকে একটি অখণ্ড বাজার হিসাবে গড়ে উঠেছিল, যদিও এর বড় সময় ধরে এই অঞ্চলে কোনও রাজনৈতিক ঐক্য ছিলনা। এই অখণ্ড বাজারের মূল স্থপতি ছিল শতাব্দী-প্রাচীন বণিকদের নেটওয়ার্ক এবং ওই অঞ্চলের এলিট এবং শ্রমিক শ্রেণীর লোকের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাবার অবাধ গতিবিধি। কিন্তু ব্রিটিশ এবং ফরাসী ম্যাণ্ডেটরি শাসনে সদ্যসৃষ্ট রাষ্ট্রগুলির সীমান্তগুলি পূর্ববৎ উন্মুক্ত না থাকাতে এবং নাগরিকত্ব, পাসপোর্ট এবং অভিবাসন সম্পর্কিত বিধিনিষেধ চালু হওয়াতে এবং সর্বোপরি অর্থনীতির অভিমুখ তাদের অঞ্চলের অর্থনীতির থেকে ঘুরিয়ে ঔপনিবেশিক শক্তির দিকে ঘুরিয়ে দেওয়াতে (অর্থাৎ সিরিয়া এবং লেবানন ফ্রান্সের দিকে, মিশর, ইরাক, ট্রান্সজর্ডান এবং প্যালেস্তাইন ব্রিটেনের দিকে) আগেকার অখণ্ড বাজার লোপ পায়।

এছাড়া অন্যান্য পরিবর্তন-ও হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যে। সদ্যসৃষ্ট এফেন্দিয়া প্রধান জাতীয়তাবাদী এলিটশ্রেণী তাদের নিজেদের রাষ্ট্রগুলি ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যে থেকেই আধুনিকীকরণের চেষ্টা করেছিলেন। ব্রিটিশ সামরিক তত্ত্বাবধানে থাকা মিশর এই কর্মসূচীতে সবথেকে এগিয়ে ছিল এবং অচিরেই সিরিয়া এবং ইরাক-ও অনুরূপ কর্মসূচী নেয়। এই কর্মসূচীর মূল বৈশিষ্ট্য ছিল পাশ্চাত্যের অনুসরণে শিল্পোৎপাদনে যন্ত্রের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার এবং সার্বিক শিক্ষার প্রচলন এবং এই কর্মসূচীর যৌথ রূপায়নের ফলে নগরায়নের গতি বহুলাংশে বেড়ে যায়। আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ার গতি বাড়ার ফলে গোটা মধ্যপ্রাচ্যেই প্রাক আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবল চাপের মধ্যে পড়ে। ফলে, এই প্রাক-আধুনিক সামাজিক ক্ষেত্রটিতে ঔপনিবেশিক শক্তি তথা পাশ্চাত্যের প্রতি এক তীব্র বিদ্বেষ জন্মায় এবং প্রাক-আধুনিক যুগের বিষয়ে এক নস্টালজিয়া। ১৯৩০-এর দশকের বিশ্বব্যাপী মহামন্দার সময় ঔপনিবেশিক অর্থনীতিগুলি চরম সঙ্কটের মুখোমুখি হলে মধ্যপ্রাচ্যের আধুনিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়ে। ফ্রান্স এবং ব্রিটেন যখন তাদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য অবলম্বন করে ঘুরে দাঁড়াতে চেষ্টা করছিল, প্রধানত মিশর এবং ইরাকে জাতীয়তাবাদীরা সমগ্র আঞ্চলিক অর্থনীতিকে আবার অখণ্ড রূপ দিয়ে মহামন্দার কবল থেকে বেরোবার চেষ্টা করছিল। ওই এক-ই সময়ে প্যালেস্তাইন-এর ঘটনাক্রম বহু আরবের কাছে আরবদের পারস্পরিক বিভাজনের সুযোগে পাশ্চাত্যের ক্ষমতা বিস্তারের প্রচেষ্টার স্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে অক্ষ শক্তির তরফ থেকে বিভিন্ন মধ্যপ্রাচ্যের দেশের কাছে অক্ষ শক্তির সঙ্গে যোগ দেবার জন্য আহ্বান আসতে থাকে। ঔপনিবেশিক দুনিয়ার অন্যান্য নেতাদের মতই আরবদের মধ্যেও অনেকেই মনে করতেন যে যুদ্ধে অক্ষ-শক্তির জেতার সম্ভাবনাই বেশী, তাই তারাও কম বেশী সেদিকেই ঝুঁকছিলেন; তবে আরও অনেকেই এই প্রশ্নে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা মাথায় রেখে লন্ডন আরব দুনিয়ার ঐক্যসাধনের আশা আবার জাগিয়ে তোলে। ১৯৪১ সালের মে মাসে ব্রিটিশ বিদেশ সচিব স্যার অ্যান্থনি ইডেন মেনে নেন "যে আরব দেশগুলি বর্তমানে যতটা ঐক্যবদ্ধ তার থেকে আরও বেশী ঐক্য তারা চায়," এবং তেমন "কোনও কর্মসূচী যদি সকলের সমর্থন পায়" তাহলে ব্রিটেন তাদের পূর্ণ মদত দেবে।

আরবরা তাই বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল। উগ্র জাতীয়তাবাদীরা জাতিরাষ্ট্রগুলির অবসান ঘটিয়ে একটি অখণ্ড আরব রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখছিল, কিন্তু বিচ্ছিন্ন জাতিরাষ্ট্রগুলির সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলি তেমন যে কোনও প্রয়াস-ই ব্যর্থ করার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। এই পরিস্থিতিতে একমাত্র বিকল্প ছিল জাতিরাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার পত্তন করা যেখানে এক "আরব জনমত" প্রকাশিত হবে।

জার্মানির কাছে ফ্রান্সের পরাজয়ের ফলে ১৯৪৩ সালে সিরিয়া এবং লেবাননের ম্যান্ডেটের অবসান ঘটলে ওই অঞ্চলের পুনর্গঠনের প্রশ্ন উঠে আসে। আম্মান, কায়রো এবং বাগদাদ থেকে দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে একাধিক বিকল্প আলোচিত হতে শুরু করে। ট্রান্সজর্ডানের আমীর আবদুল্লাহ চাইছিলেন অনতিবিলম্বে বৃহত্তর সিরিয়াকে (অর্থাৎ ট্রান্সজর্ডান, প্যালেস্তাইন, সিরিয়া এবং লেবানন) হাশমী বংশের (অর্থাৎ তাঁর) অধীনে একটি অখণ্ড রাষ্ট্রে পরিণত হোক। দামাস্কাসে যে জাতীয়তাবাদীরা ক্ষমতা দখল করেছিল তারাও বৃহত্তর সিরিয়ার সংযুক্তিকরণ চাইছিল, কিন্তু হাশমী শাসন নয়; হাশমী বংশের ক্ষমতা বিস্তারের ব্যাপারে সৌদি আরবেরও আপত্তি ছিল। ইরাকের প্রধানমন্ত্রী নুরি আল-সঈদ প্রস্তাব দেন সমগ্র Fertile Crescent (অর্থাৎ ইরাক এবং বৃহত্তর সিরিয়া)—এর সংযুক্তিকরণ, কিন্তু কায়রো ইরাকের ক্ষমতার বৃত্ত বাড়তে দিতে চাইছিল না। এই সমস্ত বিষয়ে বিশদ আলোচনার পরে ১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বর মাসে আলেকজান্দ্রিয়ায় সিরিয়া বাদে সব আরব রাষ্ট্রই মেনে নেয় যে আরব রাষ্ট্রগুলির পূর্ণ রাজনৈতিক সংযুক্তিকরণ তখনই সম্ভব নয়। সম্মেলনে গৃহীত আলেকজান্দ্রিয়া প্রোটোকল সংশ্লিষ্ট আরব রাষ্ট্রগুলিকে তাদের আঞ্চলিক এবং শাসক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে আরব লীগ নামক একটি কনফেডারেশন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সচেষ্ট হতে বলে। এরই সূত্র ধরে আলেকজান্দ্রিয়া প্রোটোকল-এর স্বাক্ষরকারী দেশগুলি ১৯৪৪-এর মার্চ মাসে আরব চুক্তি-র মাধ্যমে আরব লীগ গঠন করে। জন্মলগ্নে এর সদস্য ছিল ইরাক,

ট্রান্সজর্ডান, লেবানন, মিশর, সিরিয়া এবং সৌদি আরব, ইয়েমেন এতে যোগ দেয় দুমাস পরে। প্যালেস্তাইন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র না হওয়াতে এর অংশ হতে পারেনি।

আরব লীগের প্রধান কাজ ছিল সদস্য দেশগুলির মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানো এবং সামগ্রিক আরব স্বার্থে কাজ করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌম কর্তৃত্ব যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে নজর রাখা। লীগের সদস্যদের কর্তব্য ছিল এমন কোনও নীতি না অনুসরণ করা যাতে অন্য কোনও সদস্য রাষ্ট্রের স্বার্থহানি ঘটতে পারে। সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক (যেমন বাণিজ্য, শুল্ক, মুদ্রা-ব্যবস্থা, শিল্প), যোগাযোগ ব্যবস্থা (যেমন রেলপথ, সড়কব্যবস্থা, জলপথ পরিবহন, বিমান পরিবহন, ডাক-ব্যবস্থা), নাগরিকত্ব (অভিবাসন-সংক্রান্ত বিষয়, অনুপ্রবেশকারী প্রত্যার্পণ), সমাজকল্যাণ, স্বাস্থ্য এবং সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে সহযোগিতা বাড়ানোর দায়িত্বও লীগের ওপরে ন্যস্ত ছিল। লীগের সদস্যরাষ্টদের মধ্যে বিবাদ মেটাতে হিংসার আশ্রয় নেওয়া নিষিদ্ধ এবং কোনও বিবাদ উঠলে একমাত্র সীমান্ত বিষয়ক সমস্যা ছাড়া অন্য যে কোনও বিষয়ে লীগের মধ্যস্থতা মেনে নেওয়া বাধ্যতামূলক।

ছয় সদস্য নিয়ে শুরু হলেও পশ্চিমে আলজেরিয়া থেকে পূর্বে ওমান অবধি বিস্তৃত আরব লীগের বর্তমান সদস্য-সংখ্যা বাইশ। আরব ভাষাভাষী দেশগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ এই কূটনৈতিক সংগঠনটির সদস্য দেশগুলি সৌদি আরব থেকে জিবুটি, সুদান থেকে কোমোরো প্রভৃত বৈচিত্র্যময়। মাঝেমধ্যে লীগের নীতি লঙ্ঘনের জন্য কোনও রাষ্ট্রের সদস্যপদ বিলম্বিত করা হয় (যেমন, কুয়েত আক্রমণের পরে ইরাকের বা ২০১১-য় গৃহযুদ্ধ শুরু হবার পরে সিরিয়ার এবং ২০১৫ সালে ইয়েমেনের), কিন্তু সাধারণত লীগের স্বীকৃতি শাসনের বৈধতা নির্ণয়ের মাপকাঠি বলে মনে করা হয় (যেমন গদ্দাফি সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হবার আগেই লিবিয়ার সদস্যপদটি Transitional National Council-কে দিয়ে দেওয়া হয়)।

১.৫ নাসেরবাদ

নাসেরবাদ হল মিশরের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি গামাল আব্দল নাসেরের রাজনৈতিক চিন্তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটি আরব জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দর্শন যা ১৯৫০ এবং '৬০-র দশকে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং বর্তমানেও যথেষ্ট সমর্থন পেয়ে থাকে। ১৯৭০-এর দশকে এই মতবাদ অন্যান্য জাতীয়তাবাদী দর্শনের উপরে প্রভাব ফেলে। কিন্তু ১৯৬৭ সালে ছয় দিনের যুদ্ধে মিশরের বড় পরাজয়ের ফলে নাসেরের নেতৃত্ব এবং তার মতবাদ দুটিই বড় ধাক্কা খায়।

নাসেরবাদ জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তথাকথিত আরব সমাজতন্ত্রের এক মিশ্র রূপ। এর রাজনৈতিক দর্শন হল এমন একটি নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি যেখানে সম্পদের বন্টনে রাষ্ট্র একটি বড় ভূমিকা নেয়, যাতে

কোনও ব্যক্তি বা সমষ্টির হাতে সামঞ্জস্যহীন সম্পদ না থাকে। মতাদর্শগতভাবে নেসেরবাদ পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদ এবং কমিউনিজম, উভয়েরই বিরুদ্ধে ছিল কারণ দুটি মতবাদই আরব সমাজের ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় চরিত্রের পরিপন্থী ছিল। প্রকৃতপক্ষে নাসেরবাদ ছিল একটি উন্নয়নধর্মী মতাদর্শ যার উদ্দেশ্য ছিল শীতলযুদ্ধে লিপ্ত ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের জাঁতাকলে জড়িয়ে না পড়ে মিশরের অর্থনীতির আধুনিকীকরণ। তাই নাসেরবাদের প্রবক্তাগণ ১৯৫০ থেকে শুরু করে ১৯৮০-র দশক অবধি আরব দুনিয়ায় কমিউনিজমের প্রসার ঠেকাতে সচেষ্ট ছিলেন এবং মধ্যপ্রাচ্যে কমিউনিজম-এর প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের পক্ষপাতী ছিলেন। নাসেরবাদীরা আরব দুনিয়ায় পাশ্চাত্যের উপস্থিতিরও বিরুদ্ধে ছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে ঐক্য এবং নির্জোট দেশগুলির মধ্যে আধুনিকীকরণ এবং শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের দেশগুলিকে ঠেকাতে পারার সম্ভাবনা নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে সচেষ্ট ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে নাসের পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং অন্যান্য অনেক আরব চিন্তাবিদদের মতই তিনিও মনে করতেন যে সিয়োনিজম্ (Zionism) ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের নিছক আরেকটি রূপ।

আরব দুনিয়ার ইসলামী এবং খ্রীষ্টান ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়া সত্ত্বেও বাথ মতবাদের মতই নাসেরবাদ প্রধানত একটি ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ যা মিশরে পেশাজীবি বুর্জোয়াশ্রেণীকে আকর্ষণ করে। এই কারণে নাসেরবাদ ১৯৫০-এর সময় থেকেই ইসলামী আদর্শ অনুসরণকারী আরব আন্দোলনগুলির (যেমন মুসলিম ব্রাদারহুড) সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে, কারণ সমাজের একই শ্রেণীর লোকদের সমর্থন চাইতে উভয়েই।

এক সময় প্রবল প্রভাবশালী এবং নির্দিষ্ট রাজনৈতিক এবং সামাজিক লক্ষ্য সম্বলিত বৈপ্লবিক আন্দোলন হিসাবে পরিচিত হলেও ১৯৭০-এর দশকে মিশরের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে উন্নয়নের গতি শ্লথ হবার পর থেকেই মতাদর্শ হিসাবে নাসেরবাদের গুরুত্ব কমতে শুরু করে। বর্তমানে নাসেরবাদের অল্প কিছু আদর্শই আরব দুনিয়ায় প্রচলিত রয়েছে, সম্পূর্ণ মতাদর্শ হিসাবে আর তেমন গুরুত্ব জোটে না। কিছু লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং ছোটোখাটো রাজনৈতিক দলের কাছে নাসেরীয় চিন্তাধারার গুরুত্ব থাকলেও ইসলামী সামাজিক আন্দোলনের উত্থানের পর থেকেই অন্যান্য আরব জাতীয়তাবাদী আদর্শের মতই নাসেরবাদ-ও পিছু হটেছে। মজার ব্যাপার হল নাসের নিজে এক রাজনৈতিক বিরোধী শূন্য দৃঢ় একদলীয় স্বৈরাচারী ব্যবস্থা কায়েম করলেও বর্তমানের নাসেরবাদীরা গণতন্ত্রকেই সমর্থন করেন এবং নাসেরের একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে তৎকালীন রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা বলে উড়িয়ে দেন—অবশ্য এঁদের গণতান্ত্রিক চরিত্রের তেমন পরীক্ষা এখনও হয়নি।

১.৬ সিয়োনিজম্ (Zionism)

সিয়োনিজম্ (Zionism) হল এমন একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যা ১৯৪৮ অবধি চালিত হয়েছিল এরেৎস ইসরায়েল (ইস্রায়েলের ভূমি)-এ ইহুদীদের জন্য একটি রাষ্ট্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে, যেখানে বাইবেলে বর্ণিত ইহুদী শাসিত রাজ্য জুডেয়া এবং সামারিয়া অবস্থিত ছিল বলে মনে করা হত। এই আন্দোলনের শুরু হয় ১৮৯০-এর দশকে যখন ইউরোপীয়, ইহুদী অর্থাৎ আশকেনাজি-রা উৎপীড়নের শিকার হয়ে পূর্ব ইউরোপ (প্রধানত রাশিয়া এবং পোল্যান্ড), জার্মানি, ফ্রান্স এবং হাবসবুর্গ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পালাতে শুরু করে। যদিও এঁদের মধ্যে বেশিরভাগ লোকই (১৮৮০ থেকে ১৯১৪-র মধ্যে প্রায় ২০ লক্ষ লোক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিল, কিছু ইউরোপীয় ইহুদী বলতে শুরু করে যে, ইহুদীদের জন্য জেরুসালেম ও তাঁর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রতিশ্রুত জমিতেই ইহুদীদের ফিরে যাওয়া উচিত, যে অঞ্চল তখন ছিল উসমানী শাসিত প্যালেস্তাইন-এর অংশ। এঁদের অভীষ্ট Zino-এ (যে পাহাড়ের ওপরে ইহুদীদের প্রাচীন মন্দিরটি ছিল বলে তারা মনে করত) ফিরে যাওয়া ছিল বলে এই আন্দোলনের নাম হল Zionism।

Zionist-রা পালেস্তাইনকে তাদের অভিবাসনের জন্য যে বেছে নিয়েছিল তাঁর কিছু কারণ ছিল। একদিকে তারা মনে করত যে জেরুসালেমের সংলগ্ন বাইবেলে বর্ণিত কানান উপত্যকা, যেখানে জুডেয়া এবং সামারিয়ার প্রাচীন রাজ্যগুলি অবস্থিত ছিল, স্বয়ং ঈশ্বর তাঁদের বসবাসের জন্য দিয়েছিলেন। রোমান সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের সঙ্গে জুডেয়া-সামারিয়ার পতন হলে রোমানদের ইহুদী মন্দিরের ধ্বংস সাধন এবং ইহুদীদের বিতাড়ণ এবং বিশেষত ইহুদীদের জেরুসালেমে ফেরার তাড়না বহু শতক ধরে ইহুদী সত্বার এক নির্ণায়ক বৈশিষ্ট্য মনে করা হয়। তাই কিছু ইহুদী তাঁদের প্রতিশ্রুত জমিতে ফিরে গেলেও বাকিরা ভূমধ্যসাগরের চারিপাশে ছড়িয়ে পড়ে এবং জেন্তাইল (অর্থাৎ যারা ইহুদী নয়) সমাজের মধ্যে বসবাস শুরু করে। এহেন আদিবাসী ইহুদী সমাজে এক প্রতিশ্রুত জমির ধারণা ইহুদী সত্বাকে বাঁচিয়ে রাখতে সহায়ক হয়। ইহুদীরা ইউরোপীয় সমাজে কোনও সম্মান বা আইনী বৈধতা না পেলেও বহু শতাব্দী থাকার পর উৎপীড়ন যখন তাঁদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলে (যেমন জারের রাশিয়া তাঁদের বিরুদ্ধে গড়ে তোলা Pogrom, বা মধ্য এবং পশ্চিম ইউরোপের নাগরিক সমাজের ইহুদী বিদ্বেষের কারণে), তখনই তারা আমেরিকার মত নিরাপদ কোনও আশ্রয়ে যাবার চেষ্টা করত। আলেকজান্ডার হার্জেলের নেতৃত্বে Zionist আন্দোলনের লোকেরা মনে করত ক্রমশঃ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং জাতিরাষ্ট্রে বিভক্ত হতে থাকা দুনিয়ায় ইহুদীরা আর জেন্টাইল সমাজে নিরাপদে থাকতে পারবে না, তাই তাদেরও নিজস্ব বাসভূমি চাই। এছাড়াও অবশ্য একটি অন্য কারণ ছিল ইহুদীদের প্যালেস্টাইন-কে বেছে নেবার— উসমানী শাসনে প্যালেস্টাইন ছিল গোটা বিশ্বে অল্প কিছু জায়গার মধ্যে অন্যতম যেখানে ইহুদীদের ইহুদী হবার অপরাধে উৎপীড়নের শিকার হতে হয়নি।

প্রথম দিকে উসমানী অনুমতিক্রমে খুব অল্পসংখ্যক কিছু লোককেই Zionist সংগঠনের মাধ্যমে তাঁদের পবিত্রভূমিতে নিয়ে যাবার অধিকার থাকত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে প্রায় ৪০,০০০ লোকের ঠাঁই মেলে পবিত্রভূমিতে, যে কারণে ইহুদীরা যুদ্ধচলাকালীন.প্রত্যেকটি ক্ষমতাধর ইউরোপীয় দেশের সামনে তাদের বাসভূমির দাবী পেশ করতে শুরু করে। সেই আশ্বাস তারা পায় বালফুর ঘোষণার মাধ্যমে যাতে লন্ডন ইহুদীদের জন্য একটি বাসভূমির প্রতিশ্রুতি দেয় (কিন্তু ওই এলাকায় বসবাসকারী অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষদের অধিকার বিপন্ন না করে), এবং পরে লীগ অফ নেশনসের ম্যাণ্ডেট পেয়ে সেই প্রতিশ্রুতি পালনের উদ্দেশ্যে প্যালেস্টাইনের দরজা ইহুদী অভিবাসনের জন্য খুলে দেয়। এর পরের দশকে প্রায় ১২০,০০০ মানুষ পবিত্রভূমিতে এসে উপস্থিত হয় এবং বিশ্বের ইহুদীদের কাছ থেকে সঞ্চয় করা অর্থ দিয়ে Zionist সংগঠনের কেনা জমিতে ১৮৯৬ সাল থেকে বসবাস শুরু করে। ১৯২৯-৩৯ সময়কালে আরও ২,৫০,০০০ মানুষ জার্মানি এবং ইউরোপের অন্যান্য জায়গা থেকে ইহুদী উৎপীড়নে পালিয়ে চলে আসে।

এই বিপুল সংখ্যক অভিবাসীদের আসার কারণে পবিত্রভূমির জনসংখ্যার চরিত্র সম্পূর্ণ বদলে যায়। এতে দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা তো ছিলই, ইহুদী বসতিগুলির চরিত্রের কারণে স্বল্পমেয়াদি কিছু সমস্যাও দেখা দিতে শুরু করে। ইহুদী অভিবাসীরা—বিশেষত যারা কিবুৎস নামক কৃষি সমবায়িকায় থাকত সাধারণত এমন জমিতে বাস করত যা দামাস্কাস বা অন্য কোনও দূরবর্তী অঞ্চলে থাকা আরব জমিদারের থেকে কিনে নেওয়া হত। সিরিয়া, লেবানন, ট্রান্স-জর্ডান প্রভৃতি দেশের জন্ম হলে পরে সেখানে বসবাসকারী 'ভিনদেশীয়' ভূস্বামীরা জমি বিক্রি করতে পেরেই খুশী ছিল, সেগুলি Zionist সংগঠন কিনে নিত। জমিগুলি ইহুদী মালিকানায় এলে ইহুদী অভিবাসীদের জীবিকা নিশ্চিত করতে সেই সমবায়গুলিতে শুধু ইহুদী শ্রমিক ব্যবহার করা হত এবং প্যালেস্তিনিয় ফেলাহিন (ভূমিহীন কৃষক) সংলগ্ন শহরগুলিতে বিকল্প জীবিকার সন্ধানে চলে যেতে বাধ্য হত। এ ধরনের বাস্তুচ্যুত প্যালেস্তিনিয়দের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ইহুদীদের প্রতি বিদ্বেষ জন্মাতে শুরু করে এবং অনেক ক্ষেত্রে হিংসার ঘটনা ঘটতে থাকে।

বালফুর ঘোষণার ফলে ইহুদীদের জন্য কোনও পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্র দেবার প্রসঙ্গে ব্রিটিশরা দায়বদ্ধ ছিল, এমনটা তারা মনে করত না। তাই ইহুদী অভিবাসনকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হলেই ব্রিটিশরা সাময়িকভাবে অভিবাসন বন্ধ করে দিত—যেমন তারা দিয়েছিল ১৯২৯-৩৩ এবং ১৯৩৯-৪৫ সময়কালে। Zionist-রা তাই যতটা পারত ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থার মধ্যেই কাজ করত, কিন্তু ব্রিটিশ সমর্থন থাক বা না থাক, তারা একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র পেতে বদ্ধপরিকর ছিল। তাই খাইম ওয়াইৎসমান এবং দাভিদ বেন গুরিয়ন তাদের প্রতিশ্রুত ভূমিতে থাকার জন্য আলাপ-আলোচনার পক্ষপাতী থাকলেও জেভ জাবতিন্সকি

আরব এবং ব্রিটিশ উভয়ের প্রয়োজনে উভয়ের বিরুদ্ধেই লড়তে রাজী ছিলেন। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনালগ্নে ব্রিটেন যখন ইহুদী অভিবাসন সীমিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়, Zionist-রা আত্মরক্ষা বাহিনী (Haganah) এবং কিছু সন্ত্রাসবাদী দল (যেমন পাল্মাখ, ইরগুন, স্তারন গ্যাং) তৈরি করে একাধারে আরবদের বিরুদ্ধে লড়ার এবং ইহুদীদের প্রতিরক্ষার জন্য।

যুদ্ধ শেষ হতে হতে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে Zionist-রা প্যালেস্টাইনে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। পাশাপাশি ইউরোপে ঘটে যাওয়া ইহুদী নিধন যজ্ঞ সম্বন্ধে যত তথ্য আসতে শুরু করে তার পরে ইহুদীদের জন্য পশ্চিমী দেশগুলির সমর্থন বাড়তে থাকে। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটেন প্যালেস্টাইন ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলে সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রসংঘ বিষয়টি খতিয়ে দেখতে একটি কমিশন (UNSCOP) গঠন করে। UNSCOP দুটি পৃথক প্রস্তাব রাষ্ট্রসংঘের সামনে রাখে। এর সংখ্যাগুরু সদস্যরা প্যালেস্টাইনকে একটি ইহুদী এবং একটি আরব রাষ্ট্রে বিভাজনের প্রস্তাব দেন, যেখানে জেরুসালেম হবে একটি আন্তর্জাতিক প্রশাসনাধীন মুক্ত শহর, কমিশনের সংখ্যালঘু সদস্যেরা প্রস্তাব দেন প্যালেস্টাইন—কে অবিভক্ত রেখে একটি ফেডারাল কাঠামোর মধ্যে ইহুদী এবং আরব অংশ সৃষ্টি করার। রাষ্ট্রসংঘে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনে প্রস্তাব পাশ হয়েছিল, কিন্তু প্যালেস্তিনিয়রা এবং আরব দেশগুলি এটি মেনে নিতে রাজী হয়নি। ফলতঃ ১৯৪৮-এর জুন মাসে ব্রিটেন প্যালেস্টাইন ছেড়ে চলে গেলে Zionist-রা UNSCOP নির্দিষ্ট জমিতে ইজরায়েল রাষ্ট্র সৃষ্টির ঘোষণা করে দেয় এবং অবিলম্বেই প্রায় সব কটি আরব প্রতিবেশী রাষ্ট্রের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই যুদ্ধে ইজরায়েল জয়লাভ করে এবং অচিরেই আরব রাষ্ট্রের জন্য নির্দিষ্ট জমিও ইজরায়েল দখল করে নেয়।

১.৭ আরব জাতীয়তাবাদ এবং প্যালেস্টাইন সমস্যা

এক অর্থে উসমানী সাম্রাজ্যের ভাঙনে সবথেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল প্যালেস্তিনিয়রা এবং প্যালেস্টাইন সমস্যা আরব জাতীয়তাবাদের সব সামর্থ এবং ব্যর্থতার ওপরে আলোকপাত করতে পারে। মূল সমস্যাটি ছিল যে উসমানী শক্তির পতনের সময় (এমনকি ইতিহাসের কোনও সময়েই) প্যালেস্টাইনের কোনও স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অস্তিত্ব ছিলনা। বিশাল আল-শাম নামক অঞ্চলের অংশ এই অঞ্চটিকে যখন সিরিয়া এবং লেবাননের থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, প্যালেস্তিনিয়দের কোনও আঞ্চলিক সত্ত্বাও জন্ম নেয়নি যার ভিত্তিতে কোনও স্বতন্ত্র জাতীয় সত্ত্বা গড়ে উঠতে পারে। তাই প্যালেস্টাইনের জমিতে ইহুদী বাসভূমি প্রতিষ্ঠা করতে অঙ্গীকার করতে ব্রিটেনের সুবিধাই হয়েছিল যখন তারা জর্ডান নদীর পূর্ব পাড়ে তাদের মিত্র আমীর আব্দুল্লাহর জন্য ট্রান্স-জর্ডানের আমীরশাহী সৃষ্টি করে, কিন্তু নদীর পশ্চিম দিকের জমিটা নির্দিষ্ট কারও বলে ঘোষিত হয়নি।

প্রথম প্রথম প্যালেস্টাইনের অধিবাসীরা, যারা আরব বিদ্রোহে সামিল হয়েছিল, একটি অখণ্ড আরব রাষ্ট্রের সমর্থক ছিল। একাধিক সার্বভৌম আরব রাষ্ট্রের জন্ম হলে প্যালেস্তিনিয়রা প্রথম তাদের (সিরিয়া-স্থিত) সনাতন নেতৃত্বের দিকেই তাকিয়ে ছিল এবং বৃহত্তর সিরিয়ার দাবীকে সমর্থন জানায়। কিন্তু ম্যাণ্ডেটের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কার্যকলাপের সুবাদে যখন তারা "ইহুদী নয়" এমন প্রজা বলে চিহ্নিত হতে থাকে, তখন ঐ অঞ্চলের আরবিভাষী মানুষগুলি নিজেদের প্যালেস্তিনিয় আরব বলে জাহির করতে শুরু করে এবং গোটা প্যালেস্টাইনের ওপরে তাদের দাবী জানায়।

১৯২০-র দশকের শেষের দিকে, ইহুদী জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে যখন প্যালেস্তিনিয়দের ঘর ছাড়ার পালা শুরু হয়, কেউ কেউ গ্রাম থেকে শহরে যেতে থাকে এবং কেউ কেউ প্যালেস্টাইন ছেড়ে প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রগুলিতে যেতে চায়, যেমন মিশর, সিরিয়া এবং কিছুক্ষেত্রে ইরাক। সব কটি দেশই যেহেতু তখন প্রায় সদ্যজাত ছিল, প্যালেস্তিনিয়দের অভিবাসন কোথাও সমর্থন পায়নি। তার ওপরে এটা স্বতঃসিদ্ধ ছিল যে প্যালেস্তিনিয়দের দুর্দশার প্রকৃত কারণ ঐ অঞ্চলে পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উদ্দেশ্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। তাই আরব রাষ্ট্রগুলিতে ক্ষমতাসীন জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদদের সমালোচকরা প্যালেস্টাইন সমস্যাকে একটি "আরব" সমস্যা বলে চিহ্নিত করে এবং সরকারী নীতিতে ক্ষুব্ধ উচ্চকাঙ্খী মধ্য এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ব্যবহার করে। এই ধরনের সমালোচকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হাসান আল-বান্নার নেতৃত্বে ১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ইখওয়ান আল-মুসলিমিন (বা মুসিলম ব্রাদারহুড), যিনি প্যালেস্টাইনের বাইরে প্যালেস্তিনিয়দের সবথেকে বড় সমর্থক ছিলেন।

প্যালেস্টাইন সমস্যা একটি "আরব" সমস্যা বলে চিহ্নিত হওয়াতে মিশর, সিরিয়া, ইরাক এবং ট্রান্স-জর্ডান তাদের হয়ে ব্রিটিশ এবং ইহুদী, উভয়ের সঙ্গেই মীমাংসার চেষ্টা করত। প্যালেস্তিনিয় উদ্বাস্তুদের সংখ্যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং তার অব্যবহিত পরে এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে প্যালেস্টাইনের কোনও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পক্ষেই নিজের আরব চরিত্রের দাবী বিসর্জন না দিয়ে একটি ইহুদী রাষ্ট্রের জন্ম মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাছাড়া তাদের দেশের আভ্যন্তরীণ ভারসাম্যও প্যালেস্তিনিয় উদ্বাস্তুদের কারণে অনেক ক্ষেত্রেই বিপন্ন হয়ে পড়ছিল। তাই সমস্ত আরব দেশগুলিই প্যালেস্টাইনের বিভাজনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং ব্রিটেন প্যালেস্টাইন ত্যাগ করার পরের দিনই ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে মিশর, সিরিয়া, ট্রান্স-জর্ডান এবং ইরাক। যুদ্ধে পরাজিত হবার পরেও তারা ইজরায়েলের অস্তিত্ব মানতে অস্বীকার করে যতদিন না প্যালেস্টাইন সমস্যার কোনও স্থায়ী সমাধান না হয়। এবং এই সমস্যার সমাধান বলতে বলা হয় প্যালিস্তিনিয়দের নিজভূমে "ফেরার অধিকার," যে কারণে ট্রান্স-জর্ডান ছাড়া কোনও আরব দেশই প্যালেস্তিনিয়দের নাগরিকত্ব দিতে চায়নি। বলা যেতেই পারে

এর পিছনে কোনও আরব ভ্রাতৃত্ববোধ কাজ করছে না। প্রত্যেকটি আরব রাষ্ট্রই কম বেশী স্থিতিশীল হওয়াতে কোনও আরব জাতীয়তাবাদী ঢেউ ওঠার বা সফল হবার সম্ভাবনা আজ প্রায় নেই বললেই চলে। তথাকথিত আরব দুনিয়ায় একমাত্র প্যালেস্টাইন সমস্যাই আজ একমাত্র বিষয় যার সর্বত্র একটা আবেদন আছে এবং একমাত্র বিষয় যা প্রায় সব আরব শাসক গোষ্ঠীকেই একজোট হয়ে কাজ করতে বাধ্য করতে পারে।

১.৮ আরব জাতীয়তাবাদের ভবিষ্যৎ

আরব জাতীয়তাবাদের আবেদনের উত্থানপতন সত্ত্বেও পশ্চিম এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকার বহু অংশেই এই মতাদর্শের একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আরব লীগের অস্তিত্ব, ইজরায়েলের প্রতি বিদ্বেষ এবং প্যালেস্টাইনের প্রতি সার্বিক সমর্থন এবং সবথেকে ভাল প্রমাণ। কিন্তু তাও বিংশ শতকের মাঝামাঝি আরব জাতীয়তাবাদের যে আবেদন ছিল তা আজকের দিনে আর দেখা যায় না।

আরব জাতীয়তাবাদ ১৯ শতকের শেষ লগ্নে তুর্কী জাতীয়তাবাদের বিপ্রতীপে সৃষ্টি হয়, আরবী ভাষাভাষী লোকেদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৃত্তটি বজায় রাখার জন্য সেটিকে একটি রাজনৈতিক বৃত্তে রূপান্তরিত করে। উসমানী সাম্রাজ্যের পতনের পরে নতুন রাষ্ট্রগুলির সূচনার মধ্যে আঞ্চলিক চেতনার জয় আরব জাতীয়তাবাদের বৃহত্তর বৃত্তকে সঙ্কুচিত করেছিল। বিংশ শতকে জাতিরাষ্ট্রগুলির শিকড় এতটাই মজবুত হয়ে গিয়েছিল সে তা কায়েমী স্বার্থের রূপ নিয়েছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে পড়লে এত লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে যে জাতিরাষ্ট্রের স্বার্থ বিরুদ্ধ কিছু করার চেষ্টা করলে তাঁর ফল হবে সুদূরপ্রসারী। তাই মাঝে মধ্যে আরব জাতীয়তাবাদের পালে হাওয়া লেগেছে বলে মনে হলেও আঞ্চলিক স্বার্থ-সম্বলিত জাতিরাষ্ট্রকে ছাপিয়ে যাবার তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু তবুও ভবিষ্যতে সব আরব জাতি একত্রিত হবে এমন আশা লোকের মনে থেকেই যায়। মধ্য প্রাচ্যে তৈল-নির্ভর অর্থনীতিগুলি—যারা তেলের উৎপাদন করে এবং যারা তেল রপ্তানীকারী দেশগুলিতে শ্রমের রপ্তানী করে—ঐ অঞ্চলের আরব (এমনকি আরব নয় এমনও) দেশগুলিকে একটি আঞ্চলিক বৃত্তের মধ্যে নিয়ে এসেছে। ২৯শ শতকের যে কোনও আরব ব্যক্তি আরব দুনিয়ার ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক বলয় সম্বন্ধে বেশী সচেতন। আজকের দিনে তৈল-নির্ভর অর্থনীতির চালিকাশক্তি তেল রপ্তানীকারী দেশগুলির হাতেই রয়েছে। কিন্তু যেদিন এই অর্থনীতির বেহাল অবস্থা হবে এবং কায়েমী রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে, সমগ্র রাজনৈতিক কাঠামোর ভিত কেঁপে যাবে। সেই পরিস্থিতিতে আরব জাতীয়তাবাদ আবার জেগে উঠতে পারে এবং মোকাবিলা করতে পারে ইসলামী রাজনীতির, যা কিনা জনগণের চোখে যথেষ্ট বৈধতা উপভোগ করে এবং

শতাব্দী প্রাচীন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা নস্যাৎ করে সমগ্র উসমানী সাম্রাজ্য-উত্তর রাজনৈতিক বৃত্তটিকে একত্রিত করার ক্ষমতা রাখে।

১.৯ নমুনা প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

১. কেন ১৯ শতকের শেষ লগ্নে আরব জাতীয়তাবাদের উত্থান হয়েছিল তা আলোচনা করুন।

২. আরব সমাজের পরিবর্তিত সামাজিক প্রেক্ষাপট কিভাবে আরব জাতীয়তাবাদের আবির্ভাবকে প্রভাবিত করেছিল তা ব্যাখ্যা করুন।

৩. বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্যালেস্টাইন সমস্যা কিভাবে আরব জাতীয়তাবাদকে প্রভাবিত করেছিল তা আলোচনা করুন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী

১. আরব লীগের প্রতিষ্ঠা আরব জাতীয়তাবাদকে সাফল্য দিয়েছিল নাকি ব্যর্থতা—তা ব্যাখ্যা করুন।

২. ১৯৪৮ সালে ইসরায়েলের জন্মের মাধ্যমে সিয়োনিজমের বিকাশ আলোচনা করুন।

৩. একথা কি বলা যায় যে, আরব জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়েছে। উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. নাসেরিজম্ বলতে কি বোঝেন?

২. সিয়োনিজম (Zionism) বিষয়ে টীকা লিখুন

৩. আলোকজাদ্রিয়া প্রটোকল কি?

১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

1. Arthur Goldschmidt, jr and Lawrence Davidsan, *A Concise History of the Middle East,* (Boulder, CO, Westview Press, 2006).

2. Reinhard Schulze, *A Modern History of the Islamic World,* (London, I.B.Tauris, 2000)

3. Rashid Khalidi, Lisa Anderson, Muhammad Muslim, Reeva S. Simon ed), *The Origins of Arab Nationalism* (New York, Columbia University Press, 1991)

4. Adeed Dawisha, *Arab Nationalism in the Twentieth Century: from Triumph to Despair,* (Princeton: Princeton University Press, 2003)

5. Weldon Mathews, *Confronting an Empire, Building a Nation: Arab Nationalists and Popular Politics in Mandate Palestine,* (London and New York, I B Tauris, 2006)

একক—২ ❑ পশ্চিম এশিয়ায় ধর্ম এবং রাজনীতি

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ ভূমিকা

২.৩ তুরস্কের রাজনীতিতে ইসলাম

২.৪ সৌদি আরবের রাজনীতিতে ইসলাম

২.৫ মিশরে ইসলাম এবং রাজনীতি

২.৬ নমুনা প্রশ্নাবলী

২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্যগুলি হল—

- পশ্চিম এশিয়ায় ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক বিষয়ে জ্ঞানলাভে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।
- সামাজিক আন্দোলন কিভাবে তুরস্কের রাজনীতির চরিত্র পরিবর্তন করেছিল সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অবগত করা।
- সৌদি আরবে ইসলাম কিভাবে রাজনৈতিক বৈধতার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা গঠনে সাহায্য করা।
- মিশরে রাজনৈতিক ভাষ্য হিসাবে ইসলামের বিবর্তন অনুধাবনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা।

২.২ ভূমিকা

প্রায়শই ধরে নেওয়া হয় যে ধর্ম, বিশেষত ইসলাম, পশ্চিম এশিয়ার রাজনীতিতে এমন একটি ভূমিকা নেয় যা পৃথিবীর অন্যত্র অকল্পনীয়। অনেক পর্যবেক্ষক, যেমন ঐতিহাসিক Bernard Lewis বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Samuel Huntington, বিশ্বাস করেন যে বিশ্বের যে কোনও অংশের থেকেই পশ্চিম এশিয়ার রাজনীতির চরিত্রটা অনেকটাই আলাদা—যেমন তাদের দুনিয়া যখন গণতন্ত্রের দিকে এগিয়েছে,

পশ্চিম এশিয়া তখন অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। হান্টিংটনের মত অনেকেই মনে করেন এর কারণ এই অঞ্চলের দেশগুলির সাংস্কৃতিক বৈচিত্র, এঁরা বিশেষত জোর দেন সেই সব বিষয়ে যেখানে ইসলামের সঙ্গে কথিত ভাবে জনগণের সার্বভৌমত্বের তত্ত্বের মৌলিকভাবে বিরোধ আছে। লিউইস যেমন বারংবার তাঁর পাঠকদের মনে করাতে থাকেন যে পশ্চিম এশিয়ার সমস্যার মূল কারণ এখানে মানুষ এমন একটি ধর্মীয় বিশ্বাস আঁকড়ে পড়ে রয়েছেন যেখানে জনগণের সার্বভৌমত্ব লোকে মানতে রাজী নয় পাছে তাতে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব লোকে অস্বীকার করে।

যে কোনও ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা অঞ্চলকে বোঝার জন্য সরলীকৃত বা সংস্কৃতিধর্মী কোন প্রচেষ্টার একটি মৌলিক সমস্যা হল যে এই সিদ্ধান্তগুলি এমন কিছু অনুমানের ওপরে যা অনেক ক্ষেত্রেই বেঠিক। এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যগুলি ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক কারণে নয়, বরঞ্চ ঐতিহাসিক কারণেই তাদের বর্তমান রূপ পেয়েছে। বস্তুত আপাতদৃষ্টিতে মনে হতেই পারে পশ্চিম এশিয়ার রাজনীতিতে ইসলাম একটা বড় ভূমিকা নেয়, কিন্তু তার কারণ ধর্ম বা ধর্মীয় কোনও বিশ্বাস নয়, বরঞ্চ তার ব্যবহারিক গুরুত্ব (যেমন রাজনৈতিক বৈধতার দাবীতে, জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, ইত্যাদি)। অর্থাৎ, কোনও ব্যক্তির ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে তার রাজনৈতিক পছন্দের কোনও আবশ্যিক সম্পর্ক নেই—কোনও নিষ্ঠাবান মুসলিম ইসলামী রাজনীতিতে বিশ্বাস রাখবেনই এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই; আবার ইসলামী রাজনীতিতে আস্থাভাজন হলেই সে ব্যক্তি নিষ্ঠাবান মুসলিম হবেন তার কোনও মানে নেই। ইসলামের প্রয়োগ নিছকই একটি রাজনৈতিক কৌশল যা পশ্চিম এশিয়ার লোকেরা বিংশ শতাব্দীতে সময় সময় অবলম্বন করেছে, যা কখনও কখনও উপযোগী সাব্যস্ত হয়েছে, কখনও নির্ণায়ক।

পশ্চিম এশিয়ায় রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসাবে ইসলামের ব্যবহার আধুনিক যুগে শুরু হয় ১৯ শতকের শেষ দিকে। উসমানী সাম্রাজ্যে যখন আধুনিকতার জোয়ার বইতে শুরু করেছিল, তখন সমাজের সেই সব গোষ্ঠী যারা তদানীন্তন ব্যবস্থা ভাল রাখতে চেয়ে পরিবর্তনের বিপক্ষে অবস্থান নিতেন, তাঁরা সাধারণত তাঁদের অবস্থানকে ইসলামী ঐতিহ্যের নাম দিয়ে ব্যাখ্যা করতেন। উসমানী সাম্রাজ্যের অবসানের পরে একাধিক নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হলে (তুরস্ক, মিশর, লেবানন, সিরিয়া, ইরাক, ট্রান্স-জর্ডান) নতুন শাসকবর্গ আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ এবং অর্থনৈতিক আধুনিকীকরণের পথে হাঁটতে শুরু করে। কিন্তু পুরানো আর্থ-সামাজিক বলয় সম্পূর্ণত ভেঙে যাওয়ার ফলে সামাজিক এক উথাল-পাথালও শুরু হয়েছিল এবং আধুনিকীকরণের কর্মসূচির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে উঠতে শুরু করে। অনেক ক্ষেত্রেই সেই প্রতিবাদ ইসলামের পতাকার নিচে আশ্রয় নেয়, কারণ খণ্ড-রাষ্ট্র কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদের থেকে

নিঃসন্দেহে ইসলামের প্রতি আনুগত্যের বৃত্ত অনেক বড় ছিল—মিশর, সিরিয়া, তুরস্কে বিরোধিতার রাজনীতি এই ধারাতেই প্রবাহিত হয়েছিল।

ক্রমশঃ রাজনীতির ভাষা হিসাবে ইসলামী রাজনীতিও নিছক সামাজিক রক্ষণশীলতা এবং প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির অলিন্দ থেকে বেরিয়ে বিবর্তিত হয়েছে। পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ইসলাম শাসক শ্রেণী এবং বিরোধী পক্ষ উভয়ের জন্যই উপযোগী সাব্যস্ত হয়েছে, কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম হবার সুবাদে ইসলাম সমাজের অন্যান্য বিভাজন (যেমন শ্রেণী, গোষ্ঠী, উপজাতি, ভাষাগোষ্ঠী) ছাপিয়ে উঠতে পারে। অনেকেই চেষ্টা করেছেন যাতে দেশের জনগণকে একটি অখণ্ড সত্বা কেন্দ্র করে একটি জাতিরাষ্ট্রে পরিণত করা যেতে পারে—যেমন ইবন সউদের বংশ, যারা বিভিন্ন উপজাতীয় বিভাজনে দীর্ণ একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে মক্কা ও মদিনায় তাঁদের শাসনের সূত্রে ইসলামের পতাকার নীচে আনতে সফল হয়েছিল। অনেকে আবার ভৌগোলিক সীমানা দিয়ে নির্ধারিত জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে একটি সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের পক্ষপাতী যেখানে জাতি-নির্মাণের প্রক্রিয়াতে ইসলামকে বিপুল গুরুত্ব দেওয়া হয়—যেমনটা ঘটেছিল তুরস্ক, মিশর, ইরান এবং ১৯৮০-র দশক দশক থেকে প্যালেস্টাইনে।

কিছু ক্ষেত্রে ইসলাম নিয়ে রাজনৈতিক পরীক্ষানিরীক্ষা করার ফলে এর প্রবক্তারা ক্ষমতা দখল করে তা কুক্ষিগত করে রাখতে পেরেছে (যেমন সৌদি আরব বা ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানে)। অন্যত্র ইসলামী রাজনীতির প্রবক্তারা তাঁদের বিরোধীদের সঙ্গে সংগ্রাম করে কখনও জিতেছে (যেমন বর্তমানে তুরস্কে), কখনও হেরেছে (মিশর), কখনও বা দোলাচলেই থেকে গেছে (যেমন লেবানন ও সিরিয়া)। কখনও ইসলাম রঙ্গমঞ্চে এসেছে সমাজের তলা থেকে উঠে আশা সামাজিক আন্দোলনের রূপে (যেমন ঘটেছে লেবানন, তুরস্ক বা মিশরে), কখনও বা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে (ইরান) ক্ষমতায় এলেও তা তারা ধরে রাখতে পেরেছে।

তাই বোঝা দরকার যে ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির কোনও একমাত্রিক সম্পর্ক নেই পশ্চিম এশিয়ায়। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ঐতিহাসিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্রগুলি বিভিন্ন দেশকে বিভিন্ন দিকে নিয়ে গেছে। পরবর্তী অংশে আমরা এমন তিনটি দৃষ্টান্তের দিকে তাকাব—তুরস্ক, সৌদি আরব এবং মিশর।

২.৩ তুরস্কের রাজনীতিতে ইসলাম

রাজনীতিতে ইসলামের কী ভূমিকা হবে এই প্রশ্ন তুরস্কের রাজনৈতিক প্রতর্কে ১৯ শতকের মাঝামাঝি থেকেই আলোচিত হয়ে এসেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে বারংবার ইউরোপীয় শক্তির (বিশেষত রাশিয়ার) হাতে

পরাজিত হয়ে উসমানী সাম্রাজ্যের শাসনবর্গের কিছু লোক সাম্রাজ্যের আধুনিকীকরণের চেষ্টা করেছিলেন, সে প্রয়াস ইতিহাসে তাঞ্জিমাত কর্মসূচী বলে প্রসিদ্ধ। এই কর্মসূচীর অন্যতম উপাদান ছিল একটা বিশ্বাস সে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রবল অগ্রগতির কারণ বিজ্ঞান চর্চার অগ্রগতি এবং অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই উসমানী সাম্রাজ্যকেও তা আয়ত্ব করতে হবে। এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যের সমাজ ও অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন, তাই উভয় ক্ষেত্রেই কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে সংস্কারকদের সংঘাত বাধে, এবং সংস্কার বিরোধীরা ইসলামী ঐতিহ্যের দোহাই পারেন। আধুনিকীকরণে ব্যর্থ হয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে, Sevres-এর চুক্তি অনুসারে সাম্রাজ্যের আরব প্রদেশগুলি বিজয়ী মিত্রশক্তি কেড়ে নেয়। অবশিষ্ট অংশ থেকে মিত্রশক্তির দখলকারী সেনা তাড়িয়ে কামাল পাশার (আতাতুর্ক) নেতৃত্বে ১৯২৩-এর নভেম্বর মাসে তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের জন্ম হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে জন্ম নেওয়া এই কামাল-পন্থী জাতীয়তাবাদ ভাষা-জাতিভিত্তিক তুর্কী সত্বার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার সূত্র ধরে খলিফতের (অর্থাৎ উসমানী সম্রাটের গোটা মুসলিম দুনিয়ার ধর্মীয় নেতৃত্বের দাবীর) অবসান ঘটানো হয় ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে।

কামাল পাশার সরকারের মূল সমর্থক ছিল সামাজিকভাবে ঊর্ধ্বগামী মধ্য এবং নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণী (কামাল পাশা স্বয়ং এই শ্রেণী থেকেই আসেন) যারা উসমানী সাম্রাজ্যের পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে লাভবান হয়েছিলেন এবং সামরিক এবং বেসামরিক সরকারী চাকরীতে জীবিকানির্বাহ এবং সামাজিক উত্তরণের পথ খুঁজে পান। এঁরা তাই থমকে যাওয়া আধুনিকীকরণের কর্মসূচী ফের শুরু করে দেন, কিন্তু এবারে এঁদের গতি রোধ করার চেষ্টা করেন ভূস্বামী এবং প্রাক্-আধুনিক অর্থনৈতিক (যেমন, সনাতনী বণিকগোষ্ঠী) কায়েমী স্বার্থগুলি। অতএব কামালপন্থীরা সরাসরি এই কায়েমী স্বার্থের সামাজিক ভিতগুলিতেই আক্রমণ করেন। সাধারণত বণিক এবং ভূস্বামীশ্রেণীর কায়েমী স্বার্থগুলি ইসলামের নামে একজোট হত বলে কামালপন্থী সরকার তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের জনজীবন সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ করে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯২৫ সালে মাথায় পরার ফেজ টুপি (যাতে সামাজিক এবং ধর্মীয় পরিচয়ের ইঙ্গিত বহন করত) নিষিদ্ধ করে ইউরোপীয় হ্যাট চালু করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়; ১৯২৬ সালে ইসলামী ক্যালেন্ডার বাতিল করে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার চালু করা হয়; এর পরে সুফী দরবেশদের ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলি নিষিদ্ধ করা হয়; শরিয়তি আইনের বদলে (সুইস আইনব্যবস্থার অনুকরণে) ধর্মনিরপেক্ষ দেওয়ানি আইন, (ইতালির আইন অনুসারে) ফৌজদারী এবং (ইতালিয় এবং জার্মান আইন অনুসারে) বাণিজ্যিক আইন চালু করা হয়। এরপরে, তুর্কী ভাষা লেখার জন্য আরবী-ফারসি হরফ বাতিল করে ল্যাটিন হরফ অবলম্বনে সৃষ্টি নতুন তুর্কী হরফে লেখা বাধ্যতামূলক করা হয়।

জনজীবন ধর্মনিরপেক্ষ করার জন্য এত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও কামালপন্থীরা তাঁদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানত তুরস্কের শহুরে অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছিল, ফলে দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তার কোন প্রভাবই বিশেষ পড়েনি। এর একটা কারণ যদি পুরানোপন্থীদের বিরোধিতা হয়ে থাকে, তবে আরেকটি কারণ অবশ্যই এই যে অর্থনীতির আধুনিকীকরণ বিশ এবং ত্রিশের দশকে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি করতে পারেনি—ফলে, নতুন শিক্ষাব্যবস্থার উপযোগিতা দেশের অশিক্ষিত মানুষ বিশেষ বুঝে উঠতে পারেনি। ওই সময় তুরস্কের গ্রামাঞ্চলে পাশ্চাত্য শিক্ষার যেটুকু প্রসার ঘটেছিল তা হয়েছিল গ্রাম থেকে আসা সেই সব লোকের উদ্যোগে যারা সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে শিক্ষা লাভ করে, এবং গ্রামে ফিরে অন্যদের মধ্যেও সেই শিক্ষা ছড়াতে উদ্যোগ নিয়েছিল।

১৯৪৫-এর পরের যুগে, পুঁজির অভাব—তুর্কী শিল্পায়ন এবং অর্থনৈতিক আধুনিকীকরণের পথে সবথেকে বড় বাধা—খানিকটা দূর হয় মার্শাল প্ল্যানের সূত্রে আসা বিশাল আর্থিক বিনিয়োগের কল্যাণে। ১৯৫০ ও '৬০-এর দশকে তুরস্কের কৃষিক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেয় কৃষিকাজে যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে, এবং যে সমস্ত ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষক যন্ত্রের ব্যবহার করতে পারেনি তারা বাজারে পিছিয়ে পড়ে। কৃষি-অর্থনীতি থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়ে ওই ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকেরা অনেকেই বিকল্প জীবিকার সন্ধানে শহরের দিকে পা বাড়ায়। ষাটের দশক তাই তুরস্কের পক্ষে আর্থিক স্থবিরতা এবং সামাজিক উথাল-পাথালের সময় ছিল। ফলত, ওই সময়টা ছিল তুরস্কের সমাজের অন্তজঃ শ্রেণী এবং খুবই দুর্বল অবস্থায় শুরু হওয়া তুর্কী কমিউনিস্ট আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধির কাল। পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়ায় যে তুর্কী সামরিক বাহিনী তুরস্কে কমিউনিস্টদের উত্থান ঠেকাতে অভ্যুত্থান ঘটানোই শ্রেয় মনে করে।

ওই ষাটের দশকেই রাজনৈতিক বিকল্প হিসাবে ইসলামী রাজনীতিও মাথা চাড়া দিতে শুরু করে। গ্রামাঞ্চলে পাশ্চাত্য শিক্ষার তেমন প্রসার না হলেও সেখানে কোনও শিক্ষাই ছিল না তেমন নয়। আধুনিক অর্থনীতিতে "আধুনিক" শিক্ষাই যে সব থেকে বেশী প্রয়োজনীয় এটা পরিস্কার হয়ে যেতেই যে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলি একদা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার রুখতে চেয়েছিলেন, তারাই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা পরিমার্জন করে যে সমস্ত বিষয়ের চাকরীর বাজারে প্রয়োজন ছিল—যেমন ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক, বিজ্ঞান—সেগুলি মফস্বল শহরের লোকেদের পৌঁছে দেয়। এই ক্ষেত্রে নকশাবন্দি সুফী সিলসিলার নুরসি গোষ্ঠী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়।

গ্রাম থেকে যখন লোকে শহরতলি বা মফস্বল শহরে গিয়ে উপস্থিত হয়, তাঁদের পুরনোপন্থী সমাজদর্শন শহরের ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে একটা মানসিক ধাক্কা খায়। অভিবাসী যুবক এবং কিশোরেরা তাদের সনাতনী মূল্যবোধ এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি দুটি থেকেই বিযুক্ত বোধ করতে শুরু করে, এবং সেই কারণেই অনেকে কমিউনিজমের দিকে ঝুঁকতে থাকে। সমাজের এই "পচন" ঠেকাতে বিভিন্ন রকম উদ্যোগ নেওয়া হতে শুরু করে, যার মধ্যে অন্যতম ছিল আনাতলিয়ার কনিয়ে প্রদেশ থেকে শুরু হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া গুলেন আন্দোলন। বিভিন্ন পাঠচক্র এবং আলোচনাচক্রের মাধ্যমে ইসলামী পুস্তিকা এবং অন্যান্য পাঠ্যবস্তু নিয়ে আলোচনা করে যারা এতে অংশগ্রহণ করতে তাদের মধ্যে একটি গোষ্ঠীচেতনার সূচনা দেখা দেয়। এই ধরনের পাঠচক্রে মধ্যবিত্ত এবং অন্তজঃ শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর বিষয়গুলিতেও সাহায্য করার শুরু হলে পরে একটা বড় সংখ্যক লোকের পক্ষে এতদিন অধরা থাকা উচ্চশিক্ষার দরজাও খুলে যেতে শুরু করে। তুরস্কের সমাজজীবনে ইসলামের পুনঃপ্রবেশের ক্ষেত্রে গুলেন, নুরসি এবং অন্যান্য উদ্যোগগুলিই পরবর্তীকালে তুর্কী রাজনীতিতে ইসলামের প্রত্যাবর্তনের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল।

১৯৭০-এর দশকে তুরস্কের চারিপাশে মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনীতি তেলের দামে চমকপ্রদ বৃদ্ধি হবার সাথে সাথে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যেতে শুরু করে। আঞ্চলিক বাজারে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা বহুগুণ বৃদ্ধি পেলে প্রধানত রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত তুর্কী অর্থনীতি এই বাড়তে থাকা চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হয়, কিন্তু বেসরকারী উদ্যোগ এই সুযোগ হাতছাড়া করতে অনিচ্ছুক ছিল। ফলে প্রতিষ্ঠিত শিল্পাঞ্চলের বাইরে দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা দেখা দেয়, এবং কনিয়ের মত অনেক জায়গায় গুলেন গোষ্ঠীর শিক্ষাক্ষেত্রে নেওয়া উদ্যোগ সেই চাহিদা পুরণ করতে সফল হয়।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উর্ধ্বগামী এই পাতি-বুর্জোয়া এবং শিল্প-গোষ্ঠীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে জন্ম হয় নাজমুদ্দিন এরবাকান-এর Milli Görüs (জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি) আন্দোলন, যার মূল বক্তব্য ছিল মুসলিম কৃষক সম্প্রদায় এবং রক্ষণশীল পাতিবুর্জোয়া ব্যবসায়ীদের স্বার্থ এবং আনাতলিয়ার অনগ্রসরতা নিয়ে। এরবাকানের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল শ্রেণীভিত্তিক; তিনি কামালপন্থী সরকারী মতাদর্শকে "বিজাতীয়" এবং সরকারী অর্থনৈতিক নীতি মানুষকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় বলে সমালোচনা করেন। পরিবর্তে তিনি তুর্কো-ইসলামী মূল্যবোধ অনুসারে আধুনিকীকরণের (অর্থাৎ শিল্পায়ন, উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন) পক্ষে সওয়াল করেন। এরবাকান ভারী-শিল্পে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য কতকটা শিথিল ঋণ ব্যবস্থার এবং প্রযুক্তিগত সহায়তায় পক্ষপাতী ছিলেন, যাতে ইস্তাম্বুল-কেন্দ্রিক শিল্পপতিদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বিদেশী সংস্থান প্রভাব তুরস্কের অর্থনীতিতে কমানো সম্ভব নয়।

তুরস্ক অবশ্য সত্তরের দশকে মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনীতির পরিবর্তনে লাভবান হতে পারেনি, ফলে দেশে ক্রমশঃ অসন্তোষ এবং অস্থিরতা বাড়তে থাকে। সেই অস্থিরতা দেশের পথে পথে দক্ষিণ-পন্থী জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে র‍্যাডিকাল বামপন্থীদের দাঙ্গায় পর্যবসিত হয়েছিল, যার পরিণামে ১৯৭১ এবং ১৯৮০ সালে দুটি সামরিক অভ্যুত্থান অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭০-এর দশকে বিশ্বজুড়ে সমাজতন্ত্রের যে জোয়ার আসে, ইরানের ইসলামী বিপ্লবের মত আমেরিকার নেতৃত্বাধীন পশ্চিমি জোটের যে বিভিন্ন ধারাবাহিক বিপর্যয় ঘটে চলেছিল, তুর্কী সামরিক বাহিনীর কর্ণধারেরা মনে করতে শুরু করেন যে তুর্কী প্রজাতন্ত্রের জন্য অনেক বেশী বিপদজনক ছিল, ফলে তারা ইসলামীকরণের প্রবক্তাদের প্রসঙ্গে একটু নমনীয় অবস্থান নেওয়াই শ্রেয় মনে করেন।

সেই কারণেই ১৯৮৩ সালে এক গভীর অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হয়ে আঙ্কারা অর্থনৈতিক উদারীকরণের রাস্তায় হাঁটতে শুরু করলে তার নেতৃত্বে দেন নুরসি গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ তুরগুত অজাল (Turgut Özal) এবং তার দল, মাতৃভূমি। ওই সংস্কার বেসরকারি পুঁজি এবং শিল্পোদ্যোগকে স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার দেয়। কিন্তু তুরস্কের ধর্মনিরপেক্ষ এবং শহুরে এলিটের অন্তর্ভুক্ত না হলে পুঁজি সহজলভ্য ছিল না। ক্ষুদ্র এবং মাঝারি (বিশেষত প্রাদেশিক) উদ্যোগপতিদের পক্ষে ব্যবসার বিস্তারের জন্য পুঁজি জোটানো খুবই মুস্কিল হত। এর পরিণামে একাধিক উদ্যোগের সূচনা ঘটে। এর মধ্যে অন্যতম ছিল গুলেন গোষ্ঠীর অবদান। এঁরা প্রথমত আর্থিক সমবায় সৃষ্টি করে যাতে গুলেন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত লোকেদের ইসলামী "বে-রিবা" শর্তে (সুদ ছাড়া, অর্থাৎ মুনাফায় বিনিয়োগকারীর অংশীদারির শর্তে) ঋণ দেওয়া হত। এই উদ্যোগ এতটাই সফল হয় যে আঙ্কারা আইন বদলে ইসলামী ব্যাঙ্কিংকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। গুলেন গোষ্ঠী এর পরে তুরস্কের বাইরে (বিশেষ করে জার্মানিতে) অবস্থিত তুর্কী অভিবাসীদের কাছ থেকে বিনিয়োগ সঞ্চয় করে এবং প্রধানত এই ভাবেই আনাতলিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলের আর্থসামাজিক চরিত্র আমূল পাল্টে দেয়—জন্ম হয় তুরস্কের রাজনীতিতে এক নতুন চরিত্রের—ইসলামী বুর্জোয়া।

দ্রুত বদলাতে থাকা সামাজিক প্রেক্ষাপটে—এরবাকান এবং তার আন্দোলনের পালে হাওয়া লাগে, এবং তার সদ্ব্যবহার করে এঁরা পুর-প্রশাসনের জগতে কার্যত একটি বিপ্লবের সূত্রপাত করে ফেলেন। এরবাকানের নেতৃত্বে সদ্য প্রতিষ্ঠিত রেফা (জনকল্যাণ) পার্টি একের পর এক পুর-নির্বাচনে জিততে শুরু করে, এবং পুর-প্রশাসনের সম্পদ ব্যবহার করে ইসলামী বুর্জোয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করতে শুরু করে। এর ফলে নির্মাণ-শিল্প জোয়ার আসে এবং পুর-পরিষেবা এবং নাগরিক জীবনযাত্রার প্রভূত উন্নয়ন দেখা যায়। ৯০-এর দশকের মাঝামাঝি রেফা পার্টি ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির মোকাবিলা

করার মত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। আত্মবিশ্বাসী এরবাকান সমাজের ইসলামিকরণের দিকে অতি দ্রুত এগোতে শুরু করেন, তাঁরই দলের নরমপন্থী নেতা রজব তায়েব এরদোয়ানের পরামর্শ উপেক্ষা করে। স্বাভাবিকভাবেই তুর্কী সেনা ১৯৯৭ সালে আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এরবাকানের ইসলামিকরণের কর্মসূচী থামিয়ে দেয়। এরদোয়ান রেফা পার্টি ছেড়ে নরমপন্থীদের নিয়ে Adalet wa Kalkinima (ন্যায়বিার এবং উন্নয়ন) Party প্রতিষ্ঠা করেন এবং ২০০২, ২০০৭, ২০১১ এবং ২০১৫ উপর্যুপরি নির্বাচনে বিজয়ী হন।

২.৪ সৌদি আরবের রাজনীতিতে ইসলাম

মুসলিম দুনিয়ার অনেক দেশই নিজেদের শাসনব্যবস্থাকে "ইসলামী" বলে থাকে (অর্থাৎ, যেখানে ইসলামী আইন বিচারব্যবস্থাতে প্রযুক্ত হয়) এবং অনেকেই দাবী করে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। কিন্তু সৌদি আরব হল পৃথিবীর একমাত্র দেশ যারা সঠিকভাবে দাবী করতে পারে যে ওই দেশের সৃষ্টির ক্ষেত্রেও ইসলাম জড়িয়ে আছে। এর মানে এটা নয় যে সৌদি আরবের জনগণ অন্যান্য মুসলিম দেশগুলির তুলনায় বেশী ধর্মবিশ্বাসী বা নিষ্ঠাবান। এর মানে শুধু এই যে ইবন সৌদের ইসলামী ধর্মে আস্থাজ্ঞাপন সৌদি রাষ্ট্রে (যার আগে কোনও অস্তিত্ব ছিলনা), প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছিল।

ইবন সৌদের নেতৃত্বে আরব উপদ্বীপের একটা বড় অংশ ঐক্যবদ্ধ হবার আগে ঐ অঞ্চলে প্রায় এক হাজার বছর কোন কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল না। অনুর্বর জমি বা মরুভূমি প্রধান এই উপদ্বীপে বড় জনসংখ্যাকে খাদ্য জোগাতে পারে এমন কৃষিযোগ্য জমি বিশেষ ছিল না, ফলে কেন্দ্রীয় শাসন সম্ভব হবে তেমন ইঙ্গিত পাওয়া সম্ভব ছিল না, এবং বাইরের কোনও শক্তি আকৃষ্ট হতে পারে তেমন কোন কারণ ছিল না। লোহিত সাগর, আরব সাগর এবং পারস্য উপসাগরের তটবর্তী অঞ্চলে সমৃদ্ধ বাণিজ্য ছিল ঠিকই, কিন্তু উপদ্বীপের অন্তর্বর্তী অঞ্চলগুলিতে বেদুঈনদের পশুপালন, প্রান্তিক চাষিদের মরুদ্যান-সংলগ্ন জমিতে চাষ এবং ভ্রাম্যমাণ বণিকদের ব্যবসা (যাদের পসরার ওপরে ঐ ধরণের ইতস্তত) ছড়িয়ে থাকা গ্রামগুলি নির্ভরশীল ছিল)—এই ছিল উপদ্বীপের মোট অর্থনৈতিক কার্যকলাপ। তাই লোহিত সাগরের তীরবর্তী হেজাজ বা উপদ্বীপের দক্ষিণ উপকূলের ওপরে বাইরের শক্তিদের (উসমানী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ এবং ব্রিটিশ) নজর থাকত, কিন্তু উপদ্বীপের অভ্যন্তরে নেজদ, হাসা এবং আসির কেন্দ্র করে স্বল্প-মেয়াদী আমীরশাহীর উত্থান-পতন লেগেই থাকত, যারা সবসময় চেষ্টা করত উপজাতীয় কনফেডারেশন তৈরি করার—প্রধান উদ্দেশ্য সম্পদের সন্ধান এবং প্রত্যেকটি প্রয়াস ব্যর্থ হবার কারণ সেই সম্পদেরই অভাব।

ইবন সৌদের বংশ ঐ ধরণের উপজাতীয় কনফেডারেশনের ভিত্তিতে আমীরশাহীর পত্তন করেন দুবার (১৭৪৪-১৮১৮, ১৮২৯-৯১) যেগুলি চরম গোঁড়া ওয়াহাবি সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমঝোতার কারণে অন্যান্য আমীরশাহীর তুলনায় দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। হাম্বালি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ওয়াহাবি গোষ্ঠী ছিল অষ্টাদশ শতকের চিন্তাবিদ আব্দল ওয়াহাবের অনুগামী, এঁরা সুন্নী মুসলিমদের মধ্যে চরম রক্ষণশীল বলে পরিচিত। নেজদ অঞ্চলের উত্তরের দিকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জনবিরল হদর (স্থায়ী বাসিন্দা) গোষ্ঠীর মধ্যে এঁরা ব্যাপক সমর্থন পেতেন। ওয়াহাবিরা মনে করতেন দুনিয়ার অধিকাংশ মুসলিমই প্রকৃত ইসলামী আচরণ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এহেন কট্টর অবস্থান নেওয়ার সুবাদে ওয়াহাবি উলেমা মানুষের চোখে যে সম্ভ্রম অর্জন করে তাতে উষর জমি সম্বলিত নেজদ অঞ্চলে যে আড়ম্বরহীন জীবনই স্বাভাবিক ছিল তা লোকের কাছে ধর্মীয় মাহাত্ম্য রূপে সাব্যস্ত হয়। সৌদি বংশ এই ওয়াহাবি সম্প্রদায়ের সঙ্গে হাত মেলায় এবং Mutawwain-দের (এক ধরণের স্বল্প শিক্ষিত আলিম যাদের কাছে ধর্মের প্রকাশ ছিল শুধু আচার-আচরণে) ইসলামী আচার ব্যবস্থা বলবৎ করার প্রচেষ্টায় সমর্থন যোগায়। ওয়াহাবি সমর্থনে সৌদি রাজনৈতিক সম্প্রসারণ এক রকম বৈধতা পেতে শুরু করে যার সুবাদে তারা কিছুদিনের জন্য মক্কা এবং মদিনাও দখল করে নেন—অনতিবিলম্বেই অবশ্য উসমানী সাম্রাজ্য সৌদিদের হাত থেকে মক্কা এবং মদিনা কেড়ে নেয়। উসমানী সেনা এবং পরে নেজদের আল-রশিদ বংশের কাছে হেরে সৌদি আমীরশাহী ভেঙে গেলেও সৌদি বংশের সঙ্গে ওয়াহাবি সম্প্রদায়ের যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ থেকে যায়।

উপদ্বীপের রাজনীতিতে সৌদি প্রত্যাবর্তন ঘটে. ১৯০২ সালে, সেই mutawwain-দের সাহায্যে, কিন্তু আরও তাৎপর্যপূর্ণভাবে ব্রিটিশ ভারতের ভর্তুকির ভরসায়। ব্রিটিশরাজ আরব উপসাগরের প্রায় প্রত্যেকটি ছোট বড় আমীরশাহীর সঙ্গে ১৯শ শতকে রাজনৈতিক বন্দোবস্ত করে নিয়েছিল যাতে উপসাগরীয় উপকূলে জলদস্যুদের বাগে আনা যায়—সৌদিরাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। উসমানী সাম্রাজ্যের সঙ্গে ব্রিটিশ সম্পর্ক মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে খারাপ হতে শুরু করলে উপদ্বীপে নিজেদের উপস্থিতি মজবুত করতে ব্রিটিশরা ইবন সৌদকে মদত দিতে শুরু করে। ব্রিটিশ রাজের কাছ থেকে পাওয়া ভর্তুকি সৌদি বংশের সচ্ছলতা বাড়ায়, যেটি তারা উপদ্বীপের নানা প্রান্ত থেকে আসা বেদুঈন যোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত এক বাহিনী তৈরি করতে ব্যবহার করে যারা ওয়াহাবি ইসলাম মেনে চলতে রাজী ছিলেন। এই দুর্ধর্ষ বাহিনীর নাম ছিল ইখওয়ান (Ikhwan বা Brotherhood)। ইখওয়ানের সাহায্যে আরব উপদ্বীপের উপকূলবর্তী আমীরশাহী গুলি বাদ দিয়ে প্রায় সব অঞ্চলগুলি তাঁদের আয়ত্তে এনে সৌদিরা ১৯২৬ সালে হেজাজের তৎকালীন হাশ্‌মি শাসক আল্-হুসেনকে (যিনি ১৯১৬-র আরব বিদ্রোহের হোতা ছিলেন) অপসারিত করে। তার প্রায় ছয় বছর পর আবার উপদ্বীপের একটি বড় অংশ ঐক্যবদ্ধ করে ১৯৩২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে সৌদি আরব রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

সৌদি আরব রাজ্যটি সফল সামরিক অভিযানের ফসল হলেও সৌদি রাজবংশ বরাবরই তাঁদের শাসনের বৈধতার সন্ধান করেন তাঁদের ওয়াহাবি ইসলামের প্রতি আনুগত্যে। হুসেনকে (যিনি ছিলেন স্বয়ং হজরত মহম্মদের বংশধর) অপসারণ করার পরে তাঁদের ইসলামী চরিত্রের প্রমাণ স্বরূপ শুধু ওয়াহাবি ইসলামের সমর্থনকেই সৌদিরা যথেষ্ট মনে করতেন না। ফলে, তাঁরা মক্কা এবং মদিনার রক্ষণাবেক্ষণের গুরুদায়িত্বের নিষ্ঠাপূর্বক পালনের ওপরেও জোর দেন। অর্থাৎ ইসলামী বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত পবিত্রতম স্থান দুটির রক্ষণাবেক্ষণই নয়, বাৎসরিক হজ যাত্রার (যা প্রত্যেক ধর্ম বিশ্বাসী মুসলমানের জীবনে একবার যাওয়া বাধ্যতামূলক) সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও বটে। সৌদি রাজ্য মনে করে আল্লাহ-ই একমাত্র সার্বভৌম শক্তি এবং তাঁরা হাম্বালি সম্প্রদায়ের ওয়াহাবি মত দেশের আইনব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলামকে সৌদি রাজ্য এতটা কেন্দ্রীয় অবস্থান দেবার একটা কারণ সম্ভবত এই যে রাজ্যের ২৬টি মূল এবং আরও অনেক গৌণ উপজাতির মধ্যে ধর্ম এবং ভাষা ছাড়া কোন কিছুতে মিল নেই; ওয়াহাবি ইসলামকে এতটা প্রাধান্য দেবার কারণ mutawwain এবং ইখওয়ানের মিলিত শক্তিতেই উপদ্বীপে সৌদি রাজবংশের রাজনৈতিক আধিপত্য নিষ্কণ্টক হয়েছিল।

তবে সৌদি রাজ্যের ইসলামী চরিত্র বুঝতে সৌদি দাবীকে আক্ষরিক অর্থে না নেওয়াই ভাল। আরব উপদ্বীপের সমগ্র ইতিহাসে কখনও কোনও রাজার শাসন ছিলনা এবং অনেকেই মনে করতেন যে ইমারা (আমীরশাহী) বা সালতানত (সুলতানী শাসন) ইসলামী শাসনব্যবস্থা হলেও রাজতন্ত্র ইসলাম-সিদ্ধ নয়। বস্তুতঃ ১৯২৭ সালে ইখওয়ানের বিদ্রোহের সময় ঠিক এই যুক্তিই দেওয়া হয়—তাঁরা সৌদি বংশের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে, একটি আপাত শিথিল উপজাতীয় কনফেডারেশন চাইছিল যেখানে ওয়াহাবি মত অনমনীয় ভাবে বলবৎ করা হবে। কিন্তু প্রথম সৌদি রাজা, আব্দল আজিজ ইবন সৌদ খুব যত্ন সহকারে এক দৃঢ় কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা তৈরি করছিলেন যার লাগাম থাকবে তাঁর নিজের হাতে। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে উপজাতীয় অন্তর্বিরোধ এবং অনুদানের লোভ দেখিয়ে ইখওয়ানের বিদ্রোহ দমন করেন। প্রায় প্রতিটি উপজাতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে এবং উপজাতীয় নেতৃবর্গকে নিয়মিত আর্থিক অনুদান দিয়ে (যা ১৯৩০ সাল অবধি ব্রিটিশ অনুদান ব্যবহার করে দেওয়া হত) ইবন সৌদ এটা নিশ্চিন্ত করেছিলেন যে যদি তাঁর সঙ্গে ইখওয়ান বা অন্য কার বিবাদ হয়, তবে উপজাতীয় নেতৃবর্গ নিজেদের স্বার্থেই ইবন সৌদকেই সমর্থন করবে। উলেমার হাতেও যথেষ্ট আর্থিক অনুদান দেওয়া হতে থাকত এবং সরকারী ধর্ম হিসাবে ওয়াহাবি মত প্রতিষ্ঠা করতে সৌদি বংশ সহায়ক হয়েছিল, ফলে তাদের তরফ থেকেও রাজবংশের ধর্মনিষ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন করার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না।

১৯২০-র দশকে তেল আবিষ্কার হলে এবং ১৯৩৩ সালে আমেরিকানদের দ্বারা তেলের বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু হবার পরে সৌদি রাষ্ট্রে খাজনা-ভোগী রাষ্ট্র হিসাবে যে কতটা দৃঢ়তা অর্জন করে তা বোঝানো

সহজ নয়। রাজা এবং উপজাতীয় নেতৃবর্গের মধ্যে যে পরস্পর নির্ভরশীলতার যে সম্পর্ক ছিল—অর্থাৎ ইসলাম অনুমোদিত রাজস্বের মাধ্যমে সামাজিক উদ্বৃত্ত আহরণ—তা প্রায় বাতিল হয়ে যায়। ১৯৪০ এবং '৫০-এর দশকেই তেলের রপ্তানী যত বাড়তে থাকে, ততই রাজস্বের সনাতনী উপাদানগুলি থেকে সৌদি রাজবংশ কার্যত স্বাধীন হয়ে যায়। উপজাতীয় নেতারাও ক্রমশঃ বাড়তে থাকা অনুদানের সুবাদে রাষ্ট্রের ওপরে আরও বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়ে—বিনিময়ে রাজতন্ত্রের প্রতি নিঃশর্ত এবং সম্পূর্ণ আনুগত্য দিতে হত।

পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে তৈল-জাত রাজস্বের কল্যাণে সৌদি আরবের চেহারাই পাল্টে গেছে। রাজ্যের সামরিক এবং আর্থিক ক্ষমতার আমূল পরিবর্তন হতে শুরু করলে সৌদি বংশ আধুনিক যুগে প্রবেশের গতিতে খানিকটা রাশ টেনে ধরতে চেষ্টা করতে শুরু করে, যাতে দ্রুত পরিবর্তনে বিপন্ন বোধ করে কেউ "ইসলাম বিপন্ন হয়েছে" বলে রাজ্যের একতা অখণ্ডতা কে চ্যালেঞ্জ জানাতে না পারে। রাজা ফয়জল, যার শাসনকাল (১৯৬৪-৭৫) তেলের উর্ধ্বগামী দামের সঙ্গে সমসাময়িক, এই ক্ষেত্রে রাজ্যের সুর বেঁধে দিয়েছেন—তিনি একাধারে প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ এবং কড়া সামাজিক অনুশাসনের পক্ষপাতী। সৌদি প্রজাদের বিপুল ভর্তুকি দেওয়া শুরু হয়—সেদেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ কল্যাণ ধীরে ধীরে প্রায় সম্পূর্ণত ভর্তুকির ওপরে চলছে; অন্যদিকে রাষ্ট্রকে দেয় রাজস্ব নামমাত্র হয়ে দাঁড়ায়। রাষ্ট্র শক্তি যত প্রজাদের ওপর থেকে আর্থিক ভাবে নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠে, ততই রাষ্ট্র মতপার্থক্যের প্রতি কম সহনশীল হতে থাকে।

তৈল-জাত রাজস্বের ফলে রাজতন্ত্রের সঙ্গে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কের ধরণও সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। উলেমাকে না চটিয়ে রাজ্যে আধুনিকতার প্রসার কীভাবে করা সম্ভব তা এক সময় রাজতন্ত্রের সামনে একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল—১৯২৬ সালে হেজাজ অধিকার করার পরে উসমানী টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা ইসলাম-সম্মত কি না তা নিয়ে ওয়াহাবি উলেমা বিস্তর তর্কাতর্কি করেছিল। তেল বিক্রি থেকে যখন রাজস্ব আসতে শুরু করে, তা রাজ্যের উপজাতীয় নেতৃবর্গের মধ্যে বন্টনের দায়িত্ব পায় ওয়াহাবি উলেমা—ফলে তাঁদের সঙ্গে সৌদি রাজতন্ত্রের যোগ আরও নিবিড় হতে থাকে। তাছাড়া, রাজস্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সনাতনী ইসলামী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগও বহুগুণ বেড়ে যায়—যা পৃথিবীর অন্যত্র (এমনকি ইরানেও) যা ঘটেছে তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যত বেশী ছাত্র পড়তে যাবে, তারা তত বেশী অনুদান পাবে। উলেমা স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারে যে তাঁদের জন্য এর থেকে বেশী অনুকূল পরিস্থিতি হওয়া সম্ভব নয়—তাই তারা যে ইসলামী জীবনচর্যার শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা সৌদি বংশের এই দাবীর বিরোধিতা কেউ সহজে করত না।

১৯৭০-এর দশক থেকেই সৌদি রাজতন্ত্র পরিকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং শিল্পক্ষেত্রে বিপুল বিনিয়োগ করে চলেছে, এবং এক বৈপ্লবিক নগরায়ানের জন্ম দিয়েছে যেখানে ছোট ছোট বসতি বিভিন্ন আকারের নগরে পরিণত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ের সঙ্গে তুলনা করলেও দেখা যাবে যে শুধু হজযাত্রা ঘিরে যোগাযোগ ব্যবস্থার যে প্রভূত উন্নতি হয়েছে তা যে কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই চমকপ্রদ। পাছে তাঁদের বিরুদ্ধে ওয়াহাবি আদর্শ থেকে বিচ্যুতির অভিযোগ ওঠে তাই সৌদি রাজতন্ত্র ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা এবং পুরানো মসজিদগুলিকে ঢেলে অনুদান দেওয়া ছাড়াও নতুন শহরগুলিতে নতুন মসজিদ স্থাপন করে উলেমাকে বিচরণের নিত্য নতুন ক্ষেত্র দিতে থাকে।

ওয়াহাবি ইসলামী প্রতিষ্ঠান সযত্নে লালন করে সৌদি রাজতন্ত্র রাজ্যে রাজনীতির পরিসর থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে কার্যত নির্বাসনে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাই বিংশ শতাব্দীতে ওটা জনগণের সার্বভৌমত্বের দাবী দৃঢ় হস্তে দমন করা হয়েছে—এমনকি সংবিধানের দাবীও নস্যাৎ করা হয়েছে এই বলে যে কুরান-ই মুসলিমদের জন্য একমাত্র সংবিধান। কিন্তু ১৯৮০-র দশক থেকে তেলের রাজস্বের রমরমা কমতে শুরু করলে সৌদি রাজতন্ত্রও তার দাক্ষিণ্যের ভর কমাতে বাধ্য হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে খরচ সাপেক্ষ হতে শুরু করে, কিন্তু, আধুনিকীকরণের গতি শ্লথ থাকায় অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা আনুপাতিকভাবে বাড়েনি। তাই বিক্ষোভ এবং অসন্তোষ রাজ্যে আবার মাথা চাড়া দিয়েছে। এহেন সমালোচনার মূল লক্ষ্য সৌদি রাজবংশের সদস্যদের ইসলাম-বিরুদ্ধ জীবনযাপন এবং রাজ্যের সম্পদের থেরে রাজ্যের মানুষ কেমন বঞ্চিত থেকে গেছেন। এই ধরনের সমালোচনা এড়াতে সৌদি রাজতন্ত্র সেই সমস্ত কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে যেগুলি জনমানসে ইসলামের সঙ্গে যুক্ত (যেমন ১৯৮০-র দশকে আফগানিস্তানে সোভিয়েত আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ)। বিশ্বের অন্যত্র ওয়াহাবি দর্শনের প্রসারের জন্য সমর্থন যেমন সোভিয়েতোত্তর যুগে মধ্য, দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মাদ্রাসা নির্মাণ এবং সেখানে স্থানীয় মুসলিমদের প্রশিক্ষণের জন্য উলেমা সরবরাহ করার সৌদি নীতি একদিক থেকে সমালোচকদের দেশের বাইরে পাঠানোর ব্যবস্থা বলেই লোকে মনে করে। এর অন্যতম নিদর্শন হল ওসামা বিন লাদেন।

রাষ্ট্র স্বয়ং যেখানে রাজনীতির ভাষাকে ইসলামী রূপ দিয়েছে, সৌদি আরবে বিরোধীরাও সেই একই কৌশল নিয়ে থাকে। সৌদি সমাজের যে সব গোষ্ঠী তেলের বাণিজ্যের সুবাদে লাভবান হয়েছিল তারাও রাজ্যের মসজিদ ও মাদ্রাসাতে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করে এসেছে। ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলির পৃষ্ঠপোষকতার সুবাদে এঁরা উলেমা একটি অংশের সমর্থন পেয়ে থাকেন। তেলের সুবর্ণ যুগ শেষ হয়ে গেলে পরে উলেমা এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকরা রাষ্ট্রের সম্পদের বিষয় সরকারের দায়বদ্ধতার দাবী জানাতে শুরু করে। এহেন গোষ্ঠীদের মধ্য অন্যতম Committee for Defence of Legitimate Rights (বা বৈধ

অধিকার রক্ষা কমিটি) এবং Movement of Islamic Reform in Arabia (আরবদেশে ইসলামী সংস্কার আন্দোলন) যারা ১৯৯০-এর দশকে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছে।

ইসলামী সংস্কারের দাবীর আপাত সাফল্যের শুরু হয় ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়, যখন সৌদি আরব মার্কিন যুদ্ধ-যাত্রার খরচ বহন করতে গিয়ে চরম আর্থিক অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে। সেই অবকাশে বিরোধীপক্ষ সরকারের ক্ষমতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপের দাবী জানায়। পরিণামে আসে সরকারের তরফে প্রথম সংস্কার—রাজ্যের মৌলিক আইনের প্রবর্তন। এর পর থেকেই ধীরে ধীরে এমন কিছু সংস্কার আসতে শুরু করে যা আগে ইসলাম বিরুদ্ধে বলে উড়িয়ে দেওয়া হত মজলিস আল্-শুয়া (আলোচনা সভা)-র গঠন, পৌরসভার জন্য আংশিক নির্বাচন ব্যবস্থা এবং ১৯১৫ সালে মহিলাদের রাজনীতিতে প্রবেশাধিকার দেওয়া এর মধ্যে অন্যতম।

২.৫ মিশরে ইসলাম এবং রাজনীতি

কতকটা তুরস্কেরই মত, মিশরেও ইসলামী রাজনীতি এক প্রবল ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির সম্মুখীন হয়ে এক উর্ধ্বগামী সামাজিক আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। সৌদি আরব বা তুরস্কের মত মিশরে ইসলামী রাজনীতির প্রবক্তারা এখনও ক্ষমতার অলিন্দে নিজেদের তেমন প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি—২০১১ সালের ক্ষণস্থায়ী বিপ্লবের পরে মহম্মদ মুরসির রাষ্ট্রপতি হিসাবে সময়টুকুই তাঁরা ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছিলেন। মিশরে তাই ইসলামী রাজনীতির ভাষা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর ভাষা নয়, প্রতিবাদী রাজনীতির ভাষা এবং ইরানের ১৯৭৯ সালের বিপ্লবের আগের ইসলামী রাজনীতির ভাষাকে বাদ দিলে বোধহয় সবথেকে পরিণত ভাষা।

উসমানী সাম্রাজ্যের আরব প্রদেশগুলির মধ্যে মিশরই প্রথম পশ্চিমি ঔপনিবেশিক শক্তির এবং আধুনিকতার প্রবাল্যের স্বাদ পেয়েছিল। মহম্মদ আলি পাশার নেতৃত্বে মিশর ধীরে ধীরে উসমানী বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে ঔপনিবেশিক বৃত্তে প্রবেশ করে—১৮৮২ সালে ব্রিটেনের সামরিক উপস্থিতির সুচনা হয় এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে মিশরকে ব্রিটেনের Protectorate বলে ঘোষণা করা হয়। ১৮৮২ সাল থেকেই অবশ্য ব্রিটিশ উপস্থিতির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠতে থাকে, এমনকি তাঁদের মধ্যেও যারা মিশরে আধুনিকীকরণের পক্ষপাতী ছিল। ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন থাকাকালীন আধুনিকীকরণ চাইলেও দেশকে উপনিবেশ বানিয়ে রাখতে চায়নি। জাতীয়তাবাদী Wafd পার্টির সঙ্গে যুক্ত এই শ্রেণী ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিকতার সমর্থক ছিল।

ঔপনিবেশিক শাসনে থাকাকালীন ব্রিটিশ শক্তির আপোষহীন বিরোধিতা করলেও Wafd জাতীয়তাবাদীরা ১৯২০ এবং '৩০-এর দশকের অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটি সমঝোতা করতে বাধ্য হয়—তাঁরা এমন এক

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে মেনে নেয় যেখানে চিরাচরিত ভূস্বামী শ্রেণী এবং শহুরে, পেশাজীবি এবং বাণিজ্যিক মধ্যবিত্তের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পাশ্চাত্যের কায়েমী স্বার্থগুলিকেও তাঁদের স্বীকৃতি দিতে হয়, যার মধ্যে অন্যতম ছিল সুয়েজ খালে ব্রিটিশ সামরিক উপস্থিতি। এই পর্যায়ের ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ মিশর রাষ্ট্রের "নির্মাণ" নিয়ে ব্যস্ত ছিল, যার দরুন শিক্ষার পরিকাঠামো এবং শিল্পে ব্যাপক বিনিয়োগ হয়েছিল, কিন্তু পশ্চিমি স্বার্থ বিপন্ন না করে। অর্থনীতির আধুনিকীকরণের এই প্রক্রিয়ায় পুরানো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত গোষ্ঠীগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, খানিকটা উসমানী বাজার ভেঙে যাবার জন্য এবং খানিকটা পাশ্চাত্য অর্থনৈতিক স্বার্থের সহযোগিতা করে উঠে আসা নতুন অর্থনৈতিক এলিটের উত্থানের জন্য।

১৯৪০-এর দশকে মিশরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চমকপ্রদ উত্থান দেখা যায় যারা মফস্বল এবং গ্রামাঞ্চল থেকে উঠে এসে তেমন অর্থনৈতিক সম্ভাবনা দেখতে না পেয়ে সামাজিক উচ্চকাঙ্খা চরিতার্থ করতে সামরিক বাহিনীতে যোগ দেয়। এই শিক্ষিত সামরিক পেশাজীবী শ্রেণী মিশরে ব্রিটিশ উপস্থিতি এবং প্রভাবের বিরুদ্ধে ছিল এবং এরাই ১৯৫৩ সালে গামাল আব্দল নাসেরের নেতৃত্বে Free Officers গোষ্ঠীর অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ব্রিটিশ ঘনিষ্ঠ রাজা ফারুককে ক্ষমতাচ্যুত করে। নাসের যে শুধুই মিশরের রাজনীতিতে পুরানো জমিদার এবং শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রমরমার অবসান ঘটান তাই নয়, ১৯৫৬ সালে সুয়েজের যুদ্ধের সুত্রে মিশরের অর্থনীতি ঔপনিবেশিক বৃত্তের বাইরেও নিয়ে যেতে সফল হন। এরপরে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে পুঁজি জোগাড় করতে ব্যর্থ হলে নাসের তাঁর বিখ্যাত আরব সমাজতন্ত্রের সূচনা করেন এবং পুঁজিবাদের বিষয়ে গভীর ভাবে সন্দিহান নাসের মিশরের সমস্ত বড় শিল্পদ্যোগের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।

পরবর্তীকালে নাসেরের আরব সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যর্থ হলে তাঁর উত্তরসূরি রাষ্ট্রপতি সাদাত (১৯৭০-৮১) এক নতুন যুগের সুচনা করেন। নাসেরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হওয়া সত্ত্বেও ১৯৭০-এর দশকে সাদাত মিশরের অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইনফিতা বা উদরীকরণের সূত্রপাত করেন। শিল্পক্ষেত্র থেকে মিশরের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ কমিয়ে এনে বেসরকারি, এমনকি বিদেশী পুঁজির প্রবেশের পথ খুলে দেয় সাদাত। কিন্তু নাসেরের সময় মিশরের সামরিক বাহিনী যেভাবে অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল তাতে সাদাতও কোন বদল ঘটাতে চাননি।

সাদাতের উত্তরসূরি হস্নি মুবারক ইনফিতা নীতি চালিয়ে যান এবং বেসরকারি তথা বিদেশী পুঁজির ওপরে বিধিনিষেধ ক্রমশঃ কমাতে থাকেন, কিন্তু তিনিও মিশরের অর্থনীতিতে সামরিক বাহিনীর প্রাধান্য বজায় রাখতে দেন। এমনকি ১৯৮০-র দশকে বিশ্ব আর্থিক সংস্থা অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমাবার বিধান দিলে মুবারক কিছু রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ অসামরিক নিয়ন্ত্রণ থেকে সামরিক নিয়ন্ত্রণে পাঠিয়ে দেন।

বেসরকারি পুঁজি শুধু সেই সব ক্ষেত্রেই প্রবেশ করতে দেন যেখানে সামরিক নিয়ন্ত্রণে থাকা শিল্পোদ্যোগের জন্য কোনও প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হবে না, বা কোনও বড় বেসরকারি শিল্প সংস্থা তৈরি হবে না। ১৯৯০-এর দশকে মুবারক যে অর্থনৈতিক উদারিকরণের শুরু করেন সেখানেও এই একই প্রবণতা দেখা গিয়েছিল।

এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মিশরের অর্থনীতি সরকারের জন্য চিরকালই এক বড় সমস্যা থেকে গেছে। বিংশ শতকে মিশরের কৃষিক্ষেত্র ক্রমশ দুর্বল হয়ে এসেছে, যে কারণে এক বড় সংখ্যক লোক গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে যেতে বাধ্য হয়। পাশাপাশি শিল্পক্ষেত্রে তেমন আনুপাতিক হারে কর্মসংস্থান না বাড়ার ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েই এই বিপুল সামাজিক চাপের সৃষ্টি হয়েছিল, যার খানিকটা পরিণতি দেখা যায় নাসেরিয় বিপ্লবে।

মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের মতই মিশরেও ১৯শ শতকের গোড়া থেকেই ঔপনিবেশিক শক্তির বিপক্ষে সমাজের পুরনোপন্থীরা ইসলামকে ব্যবহার করে এসেছিলেন। কিন্তু যে ইসলামী রাজনীতি বিংশ শতাব্দীতে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে চলেছে তা স্পষ্টতই পূর্ববর্তী ইসলামী রাজনীতির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নগরায়নের সমস্যা, ক্রমশ বাড়তে থাকা শহরের জনসংখ্যাকে খাবার, বাসস্থান এবং জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন থেকেই ১৯২৮ সাল জন্ম নিয়েছিল হাসান আল-বান্নার প্রতিষ্ঠিত ইখওয়ান আল-মুস্লিমিন (Muslim Brotherhood), যা সম্ভবত বিংশ শতকের সবথেকে প্রভাবশালী ইসলামী সংগঠন। ইখরয়ানের জন্ম হয় মিশরের গ্রাম তথা মফস্বল থেকে আসা অভিবাসীদের জন্য সৃষ্টি হওয়া নাগরিক সমস্যাগুলির মোকাবিলা করতে। গ্রাম বা মফস্বল থেকে আসা মানুষগুলি হত হয় অশিক্ষিত, না হয় মাদ্রাসায় শিক্ষিত, যাদের অল্প মজুরীতে কম দক্ষতার কাজ ছাড়া বিশেষ কিছু জুটত না। এদের মধ্যে কাজ শুরু করে, ১৯৩০-এর দশকে ইখওয়ান প্যালেস্টাইনের ইহুদী অভিবাসনের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নেয়, কারণ ইহুদী আভিবাসনের ফলে বাস্তুচ্যুত প্যালেস্তিনিয় উদ্বাস্তু মিশরে উপস্থিত হলে তারা জীবিকার ক্ষেত্রে ঠিক সেই সামাজিক বর্গের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল যাদের নিয়ে ইখওয়ান কাজ করত। প্যালেস্টাইন এবং দেশের অন্যান্য সমস্যার ক্ষেত্রে মিশরের রাজতন্ত্রের কাজে হতাশ হয়ে ইখয়ান ১৯৫২ সালে নাসেরীয় বিপ্লবে সহযোগিতা করেছিল।

নাসেরের সরকার যে তীব্র দমননীতি নিয়েছিল তার প্রত্যক্ষ ফল ছিল সৈয়দ কুতবের নেতৃত্বে ইখওয়ান আন্দোলনের হিংসার আশ্রয় নেওয়া, যা শুরু হয় ১৯৬০-এর দশকে। এবং ইখওয়ানের হিংসার জবাবে সরকারী দমননীতি আরও তীব্র হয়ে ওঠে—স্বয়ং কুতবের কারাদণ্ড এবং পরে মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল। ইসলামী হিংসার জবাবে ১৯৬৭ সালে জরুরী ব্যবস্থা সংক্রান্ত আইন পাশ হয় যা ২০১১ অবধি জারি থাকে। সাদাতের আমলে যে দমন-পীড়ন অব্যাহত থাকে, যদিও সাদাত মাঝেমধ্যে ইসলাম-পন্থীদের

ওপরে কড়াকড়ি শিথিল করে মিশরের রাজনীতিতে বামপন্থীদের (যারা সাদাতের ইনফিতা নীতির বিরুদ্ধে ছিল এবং সমাজের অন্তজ শ্রেণীর মধ্যে নিজেদের ভিত মজবুত করতে চেষ্টা করছিল) বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিত। এমনই এক শিথিলতার সুযোগ নিয়ে ইজরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার অপরাধে ইসলামপন্থীরা সাদাতকে হত্যা করে।

১৯৯০-এর দশকের গোড়ায় মুবারক নরমপন্থীদের রেহাই দিয়ে প্রবল দমন নীতির মাধ্যমে ইখওয়ানের কট্টরপন্থীদের শিরদাঁড়া ভেঙে দিতে সফল হয়েছিলেন। জরুরী ব্যবস্থা আইনের আড়ালে মুবারক ইখওয়ানের স্বাভাবিক কাজকর্ম করার কোনও উপায় রাখেননি। ইখওয়ানের কট্টরপন্থীরা মূল সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গামা ইসলামিয়া বা আল-জেহাদ আল-ইসলামী প্রতিষ্ঠা করে তাদের উগ্রপন্থী কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকে—যেমন কপ্টিক খ্রীষ্টানদের ওপরে চালান হত্যাকাণ্ড বা ১৯৯৭ সালে লাক্সরে বিদেশী পর্যটকদের নিধন—কিন্তু মূল ইখওয়ান হিংসাত্মক আন্দোলন থেকে সরে যায়।

তার মানে অবশ্য এটা নয় যে গোটা ইখওয়ান আন্দোলনকে সাদাত ও মুবারক বিনষ্ট করতে সফল হয়েছিলেন। ইখওয়ানের সহিংস আন্দোলনের সময়েও সংগঠনটির মূল সমাজকল্যাণের কাজ অব্যাহত ছিল—যেমন সমাজের অন্তজ শ্রেণীর জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন, দরিদ্র সেবা, দুর্বল, বিধবা এবং অনাথদের দেখভাল ইত্যাদি—যা প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্রের করার কথা। ১৯৮০-র দশকে ইসলামী আন্দোলনের এক নতুন ধারা দেখা যায় মিশরের মধ্যবিত্তের মধ্যে—বিশেষত উপসাগরীয় দেশ থেকে কাজ করে ফিরে আসা পেশাজীবীদের মধ্যে। খানিকটা ইসলামী আচরণের ক্ষেত্রে বেশী নিয়মনিষ্ঠা, খানিকটা ইসলামী মূল্যবোধ অনুসারে নাগরিকের অধিকার বোধ এবং খানিকটা মানুষের জীবন যাত্রার মানের উন্নতির প্রসঙ্গে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে এই দেশে ফেরা পেশাজীবিরা মিশরীয় রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ এবং প্রজা-কল্যাণকামী দাবী নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করে। ইখওয়ানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এঁরা সমস্ত পেশাজীবী সংগঠনে (যেমন উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষাবিদ) প্রবেশ করে, সংগঠনগুলিকে প্রতিনিধিত্বমূলক করে তুলে ইসলামের জন্য জায়গা তৈরি করতে সফল হয়। মুবারক সরকার যখন ১৯৯০-এর দশকে আঞ্চলিক সরকারের বিভিন্ন স্তরে নির্বাচনের ব্যবস্থা করে, এই সংগঠনগুলি ব্যবহার করে ইখওয়ানের সদস্যরা আঞ্চলিক সরকারের অংশ নেয়, (যদিও কাগজে কলমে ইখওয়ানের কোনও রাজনৈতিক অস্তিত্বই ছিল না) এবং ইখওয়ানের কর্মসূচী কার্যকর করতে থাকে।

ওই একই সময়ে গাদ আল-হক আলি গাদ আল-হক আল-আজহারের শীর্ষ মুফতি (১৯৮১-৯৬) ইসলামকে সরকারের বিরোধিতার কাজে লাগাতে শুরু করেন। আল-আজহার নামক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টি বহু শতক ধরে সুন্নী ইসলামী বিদ্যাচর্চার জগতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পীঠস্থান ছিল।

আল-আজহারের গৌরবময় ঐতিহ্য নাসেরীয় আমলে অনেকটাই খাটো হয়ে যায় যখন এটিকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। আজহারের অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আরও নতুন কিছু ইসলামী বিদ্যাচর্চার পীঠস্থানের উদ্ভব হয়—যেমন কায়রো, দামাস্কাস, বেরুত, জায়তুনা, ইত্যাদি। আজহারের হৃত গৌরব ফিরে পেতে গাদ আল্-হক সনাতনী ইসলামী চিন্তাকে আবার অগ্রাধিকার দিতে শুরু করেন, সনাতনপন্থী বুদ্ধিজীবিদের আজহারে নিয়ে আসেন এবং ১৯৬০-এর দশক থেকে গড়ে ওঠা "রাষ্ট্রের অনুগামী" তকমাটি ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করেন। একাধিক ক্ষেত্রে আল-আজহার প্রকাশ্যে রাষ্ট্রীয় নীতির বিরোধিতা করেন এই বলে যে "সমাজকে অশুভের পথ থেকে সরিয়ে ধর্মের পথে নিয়ে যাওয়া [তাঁদের] কর্তব্য"। অর্থাৎ নাগরিক সমাজে ইসলামের জন্য রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত যে পরিসরের সৃষ্টি হয়েছিল, আল-আজহারের বলিষ্ঠ প্রয়াস সেই পরিসরটিকে আরও প্রশস্ত করতে পেরেছিল।

মিশরের নাগরিক সমাজে ইসলামের প্রভাব ক্রমশ বেড়ে চলেছে। ইখওয়ানের মতন ইসলামপন্থীরা নাগরিক পরিষেবা এবং নাগরিক সমাজে (মানে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পেশাজীবিদের সংগঠন, সংবাদ মাধ্যম, প্রভৃতি) বিস্তারের মাধ্যমেই এটি করতে পেরেছে। ইরানি সমাজতত্ত্ববিদ আসেফ বায়াত এই প্রক্রিয়াকে "ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়াই ইসলামিকরণ" বলে অভিহিত করেছেন। উনি মনে করেন সহিংস ইসলামী আন্দোলনের যুগের অবসান হয়েছে এবং সমাজে ইসলামী বৃত্তটি আর একমাত্রিক বলে মনে করার কোনও কারণ নেই। এই ইসলামিকরণের গতি রদ করা অনেক শক্ত কারণ এখন আর সরাসরি রাষ্ট্রশক্তির ওপরে কোনও আঘাত হানা হয়না, ইসলামী আন্দোলনের অগ্রগতি হচ্ছে নিঃশব্দে, কতকটা চুপিসাড়ে। বায়াক দেখিয়েছেন যে ইসলামী মূল্যবোধ অনুসারে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষা এবং অন্যান্য নাগরিক পরিষেবা চালিয়ে ইসলামপন্থীরা কায়রোর দরিদ্রতম এলাকাগুলিতে কার্যত একটি সমান্তরাল রাষ্ট্রের রূপ দিয়েছে। সমাজে অন্তজ শ্রেণীর মধ্যে কাজ করার ফলে সমাজের একটি বড় অংশের লোকেদের জন্য কার্যত একটি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই কাজগুলি 'আল্-ফিএ" (দান) নামক মূল্যবোধ অনুসারে করা হয় বলে বলা হয়ে থাকে। পাশাপাশি হাসান হালিফা এবং অম্র খালিদের মতন প্রভাবশালী বুদ্ধিজীবির করা গণমাধ্যমের সুচারু ব্যবহার উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত বৈঠক খানাতে ইসলামকে অনায়াসে পৌঁছে দিয়েছে।

২০১১ সালে মিশরে মুবারকের শাসনের বিরুদ্ধে যে জন-জাগরণ হয় তাতে আপাতদৃষ্টিতে সবার মনে হয়েছিল ইখওয়ান রাজনৈতিকভাবে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকবে, কারণ সরকারের দমননীতি সত্ত্বেও সাংগঠনিক ভাবে একমাত্র ইখওয়ানেরই অস্তিত্ব ছিল। রাষ্ট্রপতি হিসাবে মহম্মদ মুরসির নির্বাচন এবং আইনসভায় ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলির প্রাধান্য এই ধারণাকেই পরিপুষ্ট করে। কিন্তু মিশরের ইসলামী

রাজনীতির প্রবক্তাদের মতই (যেমন ইখওয়ান নিছকই শহুরে ইসলামপন্থীদের প্রতিনিধি) মিশরের সময় সমাজ বহুধাবিভক্ত, ফলে ইসলামিকরণ জোর করে চাপিয়ে দিলে তাতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়াই স্বাভাবিক—যেমনটা হয়েছে ২০১৪ সালে, যখন মুরসিকে ক্ষমতাচ্যুত করে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তাদের সমর্থন নিয়ে সামরিক শাসন পুর্নবহাল করা হয়।

২.৬ নমুনা প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

১. বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তুরস্কের রাজনীতিতে ইসলামের কর্তৃত্বমূলক আবির্ভাবকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

২. এটা কি বলা ঠিক যে, সৌদি রাজত্বের ক্ষমতা ইসলামের তুলনায় তেলের উপর বেশী নির্ভর ছিল? আপনার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন।

৩. রাজনৈতিক ক্ষেত্রের প্রতিবাদ ছাড়াও সমসাময়িক মিশরে যথার্থ সামাজিক আন্দোলনের সাক্ষী হল ইসলাম। ব্যাখ্যা করুন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী

১. তুরস্কের জনগণ কি কারণে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি আকর্ষণ হারিয়েছে?

২. মিশরে মুসলিম ব্রাদারহুড-এর সাফল্যকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

৩. সৌদ হাউস-এর কর্তৃত্ব দৃঢ়করণে ওয়াহবিবাদের ভূমিকা আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. তুরস্কের নগর বিপ্লবে ইসলামিক নেটওয়ার্ক কি ভূমিকা পালন করেছিল?

২. মিশরে মুসলিম ব্রাদারহুড কিভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে?

৩. সৌদি ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় উপজাতীয় জোটসমূহের গুরুত্ব লিখুন।

২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

1. Reinhard Schulze, *A Modern History of the Islamic World.*, (London, LB.Tauris, 2000)

2. Arthur Goldschmidt, *A Brief History of Egypt,* (New York, Facts on file, 2001)

3. Madawi al-Rashid, *A history of Saudi Arabia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010)

4. Feroz Ahmad, *Making of Modern Turkey,* (London: Routledge, 1993)

5. Umut Azak, *Islam and Secularism in Turkey; Kemalism.. Religion and the Nation State,* (London : I.B. Tauris, 2010)

একক—৩ ❑ পশ্চিম এশিয়ায় তেলের রাজনীতি

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ ভূমিকা

৩.৩ তেলের রাজনীতি

৩.৪ OAPEC গঠন এবং তার কাঠামো

৩.৫ ১৯৭০-এর পরের তেলের রাজনীতি

৩.৬ নমুনা প্রশ্নাবলী

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্যগুলি হল—

- পশ্চিম এশিয়া অঞ্চল জুড়ে বিশ্বব্যাপী তেল বাণিজ্য ও রাজনীতি সম্পর্কে পরিচিত হতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।
- পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলে তেল কোম্পানীগুলির বাজার আধিপত্য কিভাবে তেল রপ্তানিকারী দেশ সমূহের হাতে হস্তান্তরিত হয় সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা গঠনে সাহায্য করা।
- বিশ্ব তেল বাণিজ্যে OAPEC (ওপেক)-এর ভূমিকা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনে সহায়তা করা।
- ১৯৭০ দশক থেকে তেল বাজারের পরিবর্তন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা গঠনে সাহায্য করা।

৩.২ ভূমিকা

পশ্চিম এশিয়ায় গোটা বিশ্বের মোট তেল ভাণ্ডারের অর্ধেকের বেশী তেল মজুদ আছে, এবং বর্তমানে বিশ্বের মোট তেল এবং গ্যাস উৎপাদনের অর্ধেক ওখান থেকেই হয়। তাই ঐ অঞ্চলটি বিশ্বের অর্থনীতির জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল বলে মনে করা হয়, এবং ঐ অঞ্চলের স্থিতিশীলতা বিশ্ব-রাজনীতির

একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। সেই কারণে বলা যায় পশ্চিম এশিয়ায় রাজনীতিতে তেল এবং গ্যাসের কার্যত দুটি ভূমিকা রয়েছে। একদিকে বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলির নজর এই অঞ্চলের ওপরে রয়েছে যাতে সেখান থেকে তেল বা গ্যাস সরবরাহে কোনও বিঘ্ন না ঘটে। পশ্চিম এশিয় দেশগুলিও এই শক্তিধর দেশগুলির ওপরে নির্ভরশীল, কারণ তেল বা গ্যাসের ভাণ্ডার সন্ধান, খনন এবং রপ্তানী— এই তিনটি ক্ষেত্রেই প্রযুক্তিগত কারণে পশ্চিম এশিয় দেশগুলি স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি। অন্যদিকে বাইরের দেশগুলির উপস্থিতির কারণে পশ্চিম এশিয় দেশগুলির বিবর্তনের স্বাভাবিক ধারা এবং গতি ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু এটাও ঠিক যে শক্তিধর দেশগুলিতে পশ্চিম এশিয় দেশের সরকার বা নাগরিকদের চাহিদা বা প্রয়োজন নিয়ে যে সচেতনতা রয়েছে তা খুব কম অঞ্চলের ক্ষেত্রেই রয়েছে।

৩.৩ তেলের রাজনীতি

তৈল শিল্পের চারিত্রিক কারণেই বিশ্ব তৈল সম্পদের প্রায় ষাট শতাংশ পশ্চিম এশিয়ায় মজুদ থাকলেও, তৈল-সমৃদ্ধ দেশগুলির বিশ্ববাজারে আনুপাতিক প্রভাব থাকেনা। বিংশ শতকের শুরুতে পশ্চিম এশিয়ায় তেলের বিপুল ভাণ্ডার পাওয়া গেলেও, কিন্তু সেই ভাণ্ডার সন্ধান (অর্থাৎ কোনও জায়গায় তেল আছে কিনা দেখা), খনন (অর্থাৎ মাটির তলা থেকে সেটা তোলার ব্যবস্থা) এবং বণ্টন (অর্থাৎ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করা) এই তিনটি ক্ষেত্রেই প্রযুক্তিগত কারণে পাশ্চাত্য দেশগুলির (যেমন আমেরিকা, ব্রিটেন, হল্যান্ড) কোম্পানীগুলিই বিশ্ব-বাণিজ্যে চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করত। পরবর্তীকালে ইউরোপ-আমেরিকার বাইরের কিছু সংস্থাও এই বাণিজ্যের জগতে ঢুকেছে (যেমন চীনের সিনোপেক এবং CNPC)। কিন্তু তবুও সাতটি বড় তেলের কোম্পানি (Seven Sisters)[1] বিশ্বের তেলের বাজারে মাত্রাতিরিক্ত প্রভাবশালী থেকে গেছে।

শিল্প-প্রধান অর্থনীতিতে শক্তির উৎস হিসাবে তেলের ব্যবহার ইউরোপ এবং আমেরিকায় প্রায় একই সময়ে শুরু হয়। তেলের ভাণ্ডারের প্রধান কিছু আবিষ্কারের অন্যতম উদহারণগুলি সবই আমেরিকায় হবার ফলে তৈল শিল্পে মার্কিন কোম্পানিগুলি অনেকটাই এগিয়ে যায়। ব্রিটিশ তৈল শিল্পের প্রথম বড় আবিষ্কার ছিল পারস্য রাজ্যে, যেখানে তাদের Anglo-Persian Oil Corporation (APOC, পরবর্তীকালে ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম) ১৯১৩ সাল থেকে তেল রপ্তানী শুরু করে। পারস্যে তেলের সন্ধান

[1] Seven Sisters-এর অন্তর্গত সাতটি কোম্পানি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে। এর মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল মার্কিন সংস্থা—যেমন এক্সন, মবিল, শেভ্রণ, টেক্সমাকো,—যারা সময়ে সময়ে অন্যান্য বড় সংস্থার সঙ্গে মিলেও গেছে। আমেরিকান নয় এমন কোম্পানীর মধ্যে অন্যতম ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম এবং রয়াল ডাচ শেল।

মিলতেই পারস্য উপসাগরের অন্যত্র সন্ধান শুরু হয়, যার বড় অংশের নেতৃত্ব দেয় ব্রিটিশরা। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে এটা মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে উসমানী সাম্রাজ্যের মেসপটেমিয়া অঞ্চলে তেলের ভাণ্ডার থাকবে, ঠিক যেমনটা থাকবে তার দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত কুয়েতে। ব্রিটেন বাগদাদ, বাসরা, মসুল এবং কুয়েতের ম্যাণ্ডেট পেলে প্রথম তিনটি অঞ্চলকে ইরাক বলে একটি রাষ্ট্রে সংগঠিত করে, কিন্তু কুয়েতকে ব্রিটিশ নিরাপত্তাধীন আমীরশাহীতে পরিণত করা হয় (এই ব্যবস্থা ১৯৬১ সাল অবধি চলেছিল)— এবং উভয় রাষ্ট্রই ব্রিটিশ-প্রধান একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা Turkish Petroleum Company (TPC)-কে তেল সন্ধানের ভার দিয়েছিল। মার্কিন তৈল সংস্থাগুলিও পশ্চিম এশিয়ার বাজারে প্রবেশাধিকার চাইতে শুরু করে এবং ইউরোপীয় সংস্থাগুলি মেনে নেয় যে তেলের সন্ধানে প্রতিযোগিতার থেকে সহযোগিতা ভাল।

অতঃএব ৩১ জুলাই ১৯২৮ সালে ইরাকে বিপুল তেলের ভাণ্ডার আবিস্কার হবার পরে APOC, রয়াল ডাচ শেল, ফরাসী Compagnie Francaise des Petroles (CFP, পরবর্তীকালে টোটাল), এবং মার্কিন যৌথ সংস্থা Near East Development Corporation (NEDC) বেলজিয়ামের অস্টেণ্ড শহরে Red Line চুক্তি সই করে। এই চুক্তি অনুসারে TPC কুয়েত বাদে সুয়েজ খাল এবং ইরানের মধ্যে অবস্থিত যে কোনও জায়গায় তেলের বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার পাবে। APOC, CEP, NEDC এবং শেল চারটি সংস্থাই TPC-র অপরিশোধিত তেলের ২৩.৭৫% পাবে। এটিও স্বীকৃত ছিল যে এই ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী চারটি সংস্থা TPC-র জন্য নির্দিষ্ট অঞ্চলে বাকি স্বাক্ষরকারী সংস্থাগুলির অনুমতি ছাড়া অন্য কোনও তেলের খনিতে নিবেশ করতে পারবেনা।

এই শেষ শর্তটি ছিল মোক্ষম। পশ্চিম এশিয়ায় ইউরোপীয় এবং মার্কিন কোম্পানীগুলির সবথেকে বড় সুবিধা ছিল ঐ দেশগুলিতে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির অভাব। তাই তেলের সন্ধানের প্রথম দিকের বরাতগুলি - যেমন ড'আরসি পেয়েছিলেন পারস্যে এবং ফ্রাঙ্ক হোমস পেয়েছিলেন মেসপটেমিয়ায় - কোম্পানিগুলির পক্ষে খুব লাভজনক শর্তে পাওয়া গিয়েছিল, তেলের মালিক দেশগুলি তেল উৎপাদন এবং বিক্রীর লাভের ওপর একটি নামমাত্র অংশ পেয়ে থাকত। উপসাগরীয় শাসকবর্গের কেউই প্রায় তেমন সমৃদ্ধ না হওয়াতে মুনাফার অংশ হিসাবে তাঁদের যত কমই দেওয়া হোক না কেন, তাঁদের রাষ্ট্রীয় কোষাগারে তা বিপুল সংযোজন সাব্যস্ত হত। অর্থাৎ মুনাফার সিংহভাগ রাখত তেল কোম্পানিগুলি। এহেন লাভজনক ব্যবসাতে প্রতিযোগী ব্যবসায়িক সংস্থা থাকলে বরাত দিতে থাকা দেশগুলির পক্ষে দর কষাকষির সুযোগ বেড়ে যেত। তাই তেলের ভাণ্ডারের আন্দাজ পাওয়া মাত্রই তেলের কোম্পানিগুলি ঐ চুক্তি সই করে প্রতিযোগিতার রাস্তা বন্ধ করে দিতে সচেষ্ট হয়েছিল।

Red Line চুক্তি পশ্চিম এশিয়ার তেলের ব্যবসায় বিনিয়োগ বিপুল লাভজনক করে তোলে, কারণ ঐ তেলের ভাণ্ডার থেকে উত্তর আমেরিকা বা রুশ তেলের ভাণ্ডারের তুলনায় অনেক সহজে (অতঃএব

অনেক সস্থায়) তেল বের করে আনা যেত। প্রতি একক পিছু তেলের সন্ধান, খনন এবং বন্টনের খরচ অন্য যে কোনও দেশের তুলনায় কম হওয়ায় এবং তৈল-সমৃদ্ধ দেশের শাসকদের সঙ্গে নামমাত্র রয়্যালটির অঙ্গীকার থাকায় (প্রথম বিশ বছরে পারস্য মোট লাভের মাত্র ৫% রয়্যালটি বাবদ পেয়েছিল।)— একক পিছু বিশাল মুনাফা হত।

কিন্তু Red Line চুক্তির দুটি বড় সমস্যা ছিল। প্রথমত, স্বাক্ষরকারী চারটি সংস্থার বাইরে থেকে কোনও প্রতিযোগিতা ঠেকাবার কোনও উপায় ছিলনা। ১৯২৮ সালে Socal বাহরেন-এ তেলের সন্ধানে বরাত পায়, এবং ১৯৩৩ সালে তারাই সৌদি আরবে আল-হানা অঞ্চলেও বরাত পায়। ১৯৩৬ সালে টেক্সাকো California Arabian Standard Oil Company-র (Socal-এর অধীনস্থ আরব কোম্পানি, যা ১৯৪৪ সালে সৌদি আরামকো বলে পরিচিত হয়) ৫০% শেয়ার কিনে নেয়। এর পরে Socal এবং টেক্সাকো Jersey Standard এবং Socony সংস্থাদুটিকে আরামকো-তে যোগ দিতে আহ্বান করে, কিন্তু সংস্থা দুটি NEDC-র অংশীদার হওয়াতে APOC, CFC এবং শেলের সম্মতি না নিয়ে যোগ দিলে তা Red Line চুক্তির বিরুদ্ধে যেত। তাই Jersey Standard এবং Socony মার্কিন সরকারের ওপরে চাপ সৃষ্টি করে যাতে Red Line চুক্তি পরিমার্জন করা হয়— চুক্তির পরিবর্তিত বয়ানে সৌদি আরব, ইয়েমেন, বাহরেন, মিশর, ইজরায়েল এবং জর্ডানের পশ্চিমাংশের জন্য অব্যাহতির ব্যবস্থা করা হয়।

দ্বিতীয় সমস্যাটি ছিল আঞ্চলিক শাসকবর্গকে দেওয়া রয়্যালটির প্রসঙ্গ। পশ্চিম এশিয় শাসকরা তেলের বাণিজ্যের বরাত পাশ্চাত্যের সংস্থাগুলিকে দিত কারণ তেলের ভাণ্ডার সন্ধান, খনন বা বণ্টন কোনটাই করার মত প্রযুক্তিগত জ্ঞান তাঁদের ছিলনা। পারস্য এবং ইরাকে তেল পাবার পরে এই বিষয়ে সচেতনতা বাড়তে থাকে। ইরান ১৯৩৩ সালে তাদের প্রাপ্য রয়্যালটি বাড়াবার একটি প্রচেষ্টা করে, তা বিশেষ সফল না হলেও রয়্যালটি যতটা বেড়েছিল তাতে রেজা শাহ পহলবী ইরানে শিল্পায়ন এবং আধুনিকীকরণের সূচনা করতে সফল হয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে হতে তেল সংস্থাগুলি কীভাবে তেল-সমৃদ্ধ দেশগুলিকে শোষণ করছে সে বিষয়ে সচেতনতা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল, যার পরিণাম ছিল ১৯৫২-৫৩ সালে ইরানে Anglo-Iranian Oil Corporation (AIOC, যা আগে APOC ছিল)-এর সরকারী অধিগ্রহণের ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

ইরানের তেলের রপ্তানীর ওপরে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে ইরান ব্যর্থ হলেও তেল কোম্পানিগুলির তেলের বাজারে বিসদৃশ প্রভাবের স্বরূপ দৃষ্টিকটুভাবে প্রকট হয়ে পড়ে। সৌদি এবং ইরাকি তেলের রপ্তানী বাড়তে থাকলে রিয়াধ এবং বাগদাদেও এই উপলব্ধি দেখা যেতে শুরু করে। ১৯৫৯ সালে মধ্যপ্রাচ্য এবং ভেনেজুয়েলার তেলের দাম কোম্পানীগুলি একপাক্ষিক ভাবে ১০% কমিয়ে দিলে রপ্তানীকারী দেশগুলি— প্রধানত সৌদি আরব — ভীষণ চটে যায়, কারণ তাদের রয়্যালটি বাবদ

রোজগারও কমে গিয়েছিল। ১৯৬০ সালে আরেকবার একতরফা দাম কমানোতে ইরান, ইরাক, সৌদি আরব, কুয়েত এবং ভেনেজুয়েলা Organisation of Petroleum Exporting Countries বা OPEC নামক কার্টেল সৃষ্টি করে, যেটিতে কাতার (১৯৬১), লিবিয়া (১৯৬২) এবং সংযুক্ত আরব আমীরশাহী (১৯৬৭), প্রভৃতি দেশগুলি পরে যোগ দেয়।

প্রাথমিকভাবে ওপেক মূলত মুনাফায় তেলসমৃদ্ধ দেশগুলির দরাদরির সুবিধার জন্য কাজ করত, এবং ক্রমশঃ উৎপাদনের ওপরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে। ১৯৭০-এর দশকের গোড়াতে ওপেকের আরব সদস্য দেশগুলি Organisation of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC) সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা জাহির করতে শুরু করে এবং এমন একটি সংকট ডেকে আনে যার মোকাবিলায় তেল কোম্পানিগুলি ব্যর্থ হয় এবং তেলের বাজারে তেল রপ্তানীকারী দেশগুলির কার্টেলের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩.৪ OAPEC গঠন এবং তার কাঠামো

OAPEC গঠনের পিছনে মূল তাগিদটা অনুভূত হয়ে ১৯৬৭ সালের তেল বিক্রীর ওপরে চাপানো নিষেধাজ্ঞার সময় থেকে। ৫ই জুন ১৯৬৭, মিশরের রাষ্ট্রপতি নাসের ইজরায়েলের মিশর এবং সিরিয়া আক্রমণের এবং ইজরায়েলকে পাশ্চাত্য দুনিয়ার সমর্থনের তীব্র নিন্দা করে তৈল-সমৃদ্ধ আরব দেশগুলিকে তেলকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করেন। এর পরের দিনই আরব রাষ্ট্রগুলি সেই সমস্ত পশ্চিমি দেশকে তেল বিক্রির ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে যারা ইজরায়েলকে সামরিক সাহায্য করে থাকত। ৯ই জুন পাশ হওয়া বাগদাদ প্রস্তাব অনুসারে "আরব তেল" এমন যে কোনও বিক্রীর ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় যে দেশ প্রতক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনও আরব জমির ওপরে আক্রমণ করেছে, বা তার সমর্থন করেছে। নিষেধাজ্ঞা কতকটা আরব দুনিয়ার জনমতের চাপে পড়েই জারি করা হয়েছিল, তাই এটা বেশী দিন চলেওনি (১ সেপ্টেম্বর খারতুম প্রস্তাবের মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়)। কিন্তু এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে তেলের রাজনীতিতে আরব দেশগুলি তেলের যোগান-কে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে পারে।

১০৬৭-র নিষেধাজ্ঞার ডাক সেই সমস্ত দেশগুলির তরফেই আসে যারা তেলের রপ্তানী করত না। অর্থাৎ সব আরব সরকারই ইজরায়েলের বিরোধিতা করলেও তেল কে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার খেসারৎ দিতে হয়েছিল শুধু রপ্তানীকারী দেশগুলিকেই। আরব লীগে তেল রপ্তানীকারী দেশের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত ভাবে কম হওয়াতে তাদের ওপরে চাপ সৃষ্টি করাটা সহজ ছিল। তাই তেল

রপ্তানীকারী আরব দেশগুলি তাদের মুনাফা অন্যান্য তেল রপ্তানীকারী দেশের কাছে এবং আর্থিক ও বিদেশনীতির ওপরে নিয়ন্ত্রণ তেল-রপ্তানী-করেনা এমন আরব দেশের কাছে হারিয়ে বেশ রেগেই গিয়েছিল। ওপেকেও তারা ভেনেজুয়েলা এবং ইরানের কাছে কোণঠাসা হয়ে থাকত। কিন্তু এই আরব দেশগুলি ১৯৬৭-তে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করে। দু মাস আরব তেলের উৎপাদন কম হওয়াতে তেলের দাম অনেকটা বেড়ে যায়। এমত পরিস্থিতিতে ১৯৬৮ সালে সৌদি আরব, কুয়েত এবং লিবিয়া আরব তেল রপ্তানীকারী দেশের কার্টেল OAPEC-র সৃষ্টি করে, যাতে তাদের মধ্যে সহযোগিতা বাড়তে পারে।

OAPEC-র প্রাথমিক চরিত্র ছিল অনেকটাই রক্ষণশীল এবং সদস্য সংখ্যা শুধু বৃহৎ তেল রপ্তানীকারী দেশের মধ্যেই সীমিত থাকার ফলে মিশর বা আলজেরিয়ার মত র‍্যাডিকাল মতাবলম্বী সরকারগুলিকে এর বাইরে রাখা সম্ভব হয়েছিল। নতুন সদস্য নিতে হলে প্রথম তিন সদস্যের অনুমোদন আবশ্যিক ছিল। এই সংগঠনটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল তেল বিক্রীর ওপরে নিষেধাজ্ঞার মত হাতিয়ার যাতে জনমতের চাপে ব্যবহার করতে না শুরু করে। ইরাক প্রথম এর রক্ষণশীলতার কারণে অংশ হতে অস্বীকার করে, এবং সংগঠনটিও বেশী র‍্যাডিকাল বলে ইরাককে সদস্য হিসাবে চায়নি। কিন্তু ১৯৭২ সালে তেল রপ্তানি করলেই সদস্য হতে পারবে বলে স্থির হওয়াতে আলজেরিয়া বাহরায়েন, কাতার এবং সংযুক্ত আরব আমীরশাহির (১৮৭০) পাশাপাশি ইরাক এবং সিরিয়া ('১৯৭২) এবং মিশরকেও এর সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ফলত OAPEC ক্রমশ তাঁর রক্ষণশীলতা হারাতে শুরু করে।

১৯৬৯-এ শুরু করে OAPEC কতকটা ওপেকের সঙ্গে একই সাথে বাড়তে শুরু করে, যখন লিবিয়ায় বিপ্লবের পরেই মুয়াম্মার গদ্দামী লিবিয়ার প্রাপ্য রয়্যালটি একধাক্কায় অনেকটাই বাড়িয়ে নেয়, এবং পরের বছরে ইরান-ও একই উদ্দেশ্যে সফল হয়। ওপেকের অন্যান্য সদস্যরাও একে একে তেলের কোম্পানিগুলির সঙ্গে দরাদরিতে লেগে পড়ে যাতে তেলের বাজারে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

OAPEC-র জন্য ১৯৭৩ সাল খুব গুরুত্বপূর্ণ সাব্যস্ত হয়। ঐ বছর অক্টোবরে মিশর এবং সিরিয়া যৌথভাবে ইজরায়েলকে আক্রমণ করে। ১৬ই অক্টোবর মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিক্সন ইজরায়েলকে ২.২ মিলিয়ন ডলার সাহায্য দেবার জন্য মার্কিন কংগ্রেসকে আহ্বান জানান। প্রত্যুত্তরে OAPEC আমেরিকাকে তেল বিক্রীর ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। কুয়েত OAPEC-এর সঙ্গে ওপেকের উপসাগরীয় সদস্যদের বৈঠকের আয়োজন করে। OAPEC স্থির করে তারা প্রতি মাসে তেলের উৎপাদন ৫% কমিয়ে দেবে যতক্ষণ ইজরায়েল ১৯৬৭ সালে জয় করে নেওয়া সমস্ত আরব জমি ফিরিয়ে না দেয়। এই নিষেধাজ্ঞা

পাঁচ মাস বহাল থাকার পরে ১৯৭৪-এর মার্চ মাসে ওয়াশিংটন তেল সম্মেলনের পরে তুলে নেওয়া হয়। তেল রপ্তানীকারী দেশগুলির কাছে এটিই ছিল তাদের উৎপাদন ক্ষমতার প্রথম রাজনৈতিক ব্যবহার। উৎপাদন কমানোর সিদ্ধান্তে তেলের দাম প্রায় চারগুণ বেড়ে যায়— নিষেধাজ্ঞার আগে প্রতি ব্যারেল তেলের দাম ছিল ২.৯০ ডলার, যা ১৯৭৪-এর জানুয়ারি মাসে হয়ে দাঁড়ায় ১১.৬৫ ডলার। নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলেও তেলের দাম আর কমেনি। এই সময়েই একাধিক দেশ তাদের রয়্যালটি বাড়িয়ে নিতে সফল হয়। কার্যত এই সময়েই বিশ্ব তেলের বাজারে তেল কোম্পানীগুলির আধিপত্যের অবসান হয় এবং বপ্তনীকারী দেশগুলির আধিপত্য শুরু হয়।

তেলের মূল্যের এই পরিবর্তনের একটি আনুষঙ্গিক উপাদান ছিল। ১৯৬৭ সালের নিষেধাজ্ঞা পাশ্চাত্যের তেল সংস্থাগুলিকে তেমন বিপাকে ফেলতে পারেনি কারণ মধ্য প্রাচ্যের উৎপাদনের ঘাটতি তারা অন্যত্র পুষিয়ে নিয়েছিল, বিশেষত আমেরিকায়। কিন্তু সুয়েজ খাল দিয়ে তেল পরিবহণ বন্ধ করে দেবার ফলে পুরো আফ্রিকা মহাদেশ পেরিয়ে তেল নিয়ে যেতে বাধ্য হবার ফলে পরিবহণের সময় এবং খরচ দুটিই বেড়ে যায়। ১৯৭৩ সালে বিশ্বজনীন তেলের চাহিদা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল এবং আমেরিকার উৎপাদনও আর বাড়াবার উপায় ছিলনা। ফলে ১৯৭৩-এ যখন নিষেধাজ্ঞা চাপানো হয় শিল্পোন্নত দেশগুলির সামনে সুলভে তেলের যোগানের আর অন্য কোনও বিকল্পও ছিলনা। তাই তেল রপ্তানীকারী দেশগুলির অবস্থান দর কষাকষির জন্য তেলের কোম্পানির থেকে অনেক সুবিধাজনক হয়ে গিয়েছিল ৭০-এর দশকে। এর দশ বছরের মধ্যেই সারা বিশ্বের সমস্ত তেল-রপ্তানীকারী দেশই তাদের তৈল-সম্পদের ওপরে প্রায় সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয় এবং মুনাফার সিংহ ভাগ পেতে শুরু করে।

৩.৫ ১৯৭০-এর পরের তেলের রাজনীতি

১৯৭০-এর দশকে তৈল-জাত রাজস্ব এতটাই বেড়ে যায় যে তার পরে আর কখনোই OAPEC-এর পক্ষে একজোট হয়ে পূর্ববৎ তেল নিষেধাজ্ঞার ডাক দেওয়া আর সম্ভব হয়নি। তেলের দাম এতটাই বেড়ে যায় যে তৈল-সমৃদ্ধ মধ্য প্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলি বহুলাংশে তাদের প্রজাদের দেয় রাজস্বের ওপরে নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠে— ফলে সরকার জনগণের কাছে আরও কম দায়বদ্ধ হতে থাকে এবং দেশের নাগরিকদের মধ্যে সরকারের প্রতি আনুগত্য নিশ্চিত করতে বিপুল সম্পদ খরচ করে পৃষ্ঠপোষকতার নীতি নেওয়া হয়। ৭০-এর দশক থেকে শুরু হয়ে সরকারী ব্যয় অধিকাংশ উপসাগরীয় দেশেই মোট জাতীয় সম্পদ ৩০%

থেকে ৫০% অবধি বেড়ে যায়— সৌদি আরবে তা ১৯৪৮ সালে ৭৪%-এ পৌঁছয়। একমাত্র সংযুক্ত আরব আমীরশাহী ছিল এর ব্যতিক্রম, যেখানে মোট জাতীয় সম্পদের ১২-১৫% ছিল রাষ্ট্রীয় ব্যয়— এবং সেখানেই সরকার কথিত ভাবে সবথেকে কম স্বৈরাচারী। এর পাশাপাশি তৈল-সমৃদ্ধ দেশগুলি তেল ছাড়া অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে – যেমন গৃহনির্মাণ, পরিকাঠামো উন্নয়ন – চাহিদা সৃষ্টি করে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা করছে। তৈল-সমৃদ্ধ দেশগুলির নাগরিকদের বিভিন্ন ধরণের বৈষয়িক সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে, যাতে তারা রাজনৈতিক অধিকার না পেয়ে বিক্ষুব্ধ না হয়ে পড়েন। এত বিবিধ ধরণের সরকারী খরচ রয়েছে বলেই মধ্যপ্রাচ্যের সরকারগুলি আজ বিপুল তৈল-জাত রাজস্বের ওপরে অতীব নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে এবং ১৯৭০-এর দশকে যেমন তেল বিক্রীর ওপরে নিষেধাজ্ঞা চাপানো হয়েছিল, তা আজ OAPEC-এর কোনও সদস্য দেশই সহজে প্রস্তাব করতে সাহস করবে না।

OAPEC-এর তুলনায় ওপেক আজ বেশী প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে কারণ সদস্য দেশগুলিকে উৎপাদনের কোটা নির্দিষ্ট করে দিয়ে আরব দুনিয়ার বাইরেও তেল উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা ওপেকের পক্ষে সম্ভব। ১৯৯০-এর দশকে OAPEC আরও কমজোরি হয়ে পড়ে কারণ OAPEC-বহির্ভূত ইরান-ইরাক যুদ্ধের অবসানের পরে তেলের বাজারে ফিরে আসে এবং OAPEC-সদস্য ইরাকের তেল সরবরাহ দুটি উপসাগরীয় যুদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞায় বিশেষ ব্যাহত হয়। ওপেক এবং OAPEC-এর পিছনে অন্যতম দেশ সৌদি আরব বিশ্বের তেলের বাজারে বিশাল প্রভাবশালী। রিয়াধ দিনে দশ মিলিয়ন ব্যারেল তেল উৎপাদন করতে পারলেও সৌদিরা অতটা উৎপাদন করেনা। কিন্তু কখনও তেলের চাহিদা আকস্মিকভাবে বেড়ে গেলে বা কোনও দেশে উৎপাদন বিঘ্নিত হলে সেই ঘাটতি তারা স্বচ্ছন্দে পুষিয়ে দিয়ে থাকে। প্রধানত এই কারণেই ১৯৯০-এর দশকে তেলের দামে এক প্রকার ভারসাম্য রাখা সম্ভব হয়েছিল।

OAPEC-সদস্য অধিকাংশ উপসাগরীয় রাজ্যে তেলের ভাণ্ডার ফুরিয়ে আসতে থাকায় এবং তুলনামূলকভাবে নতুন ভাণ্ডার কম আবিষ্কার হওয়ায় সংস্থাটি ক্রমশ দুর্বল হয়ে এসেছে। ওপেক এবং OAPEC উভয় সংগঠনই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে দুর্বল হতে থেকেছে। ১৯৯০ সালে ওপেক সদস্য ইরান এবং OAPEC-সদস্য লিবিয়া তেল উৎপাদন কমাতে চাইত যাতে একক পিছু তেলের দাম বাড়ে, কিন্তু সৌদি আরব এর বিরুদ্ধে ছিল। প্রায় দুই দশকের দুর্বলতা কাটিয়ে ক্রমশঃ রাশিয়া সৌদি আরবকে টপকে আবার বিশ্বের বৃহত্তম তেল এবং গ্যাস রপ্তানিকারক হয়ে দাঁড়িয়েছে, ফলে অনেক বেশী তেলের ভাণ্ডার থাকা সত্ত্বেও তেলের বাজারে সৌদি প্রভাব কমতে শুরু করেছে। এমনকি ২০১৭ সালের মধ্যে ইরাকের তেল উৎপাদন স্বাভাবিক হয়ে গেলেও এবং ইরানের বিরুদ্ধে

আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলেও ওপেক এবং OAPEC-বহির্ভূত দেশগুলির প্রাধান্য কমার সম্ভাবনা বিশেষ দেখা যাচ্ছেনা। এই দুটি সংস্থারই সবথেকে বড় বিপদ হয়েছে Shale Oil-এর আবিষ্কার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এর বিপুল ভাণ্ডারের উপস্থিতি। এর পরিণামে তেলের দামে বিশ্ব জুড়ে যে পতন এসেছে তা ১৯৬৭-র পরে আর দেখা যায়নি।

অতএব প্রায় নিশ্চিত হয়েই বলা যায় ১৯৭০-এর দশকে OAPEC-এর যে রমরমা ছিল তা অদূর ভবিষ্যতে আর দেখা যাবেনা।

৩.৬ নমুনা প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

১. বিংশ শতকের প্রথমার্ধে বিশ্ব বাজারে তেল কোম্পানীগুলির অধিপত্য কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা আলোচনা করুন।

২. OAPEC-এর প্রতিষ্ঠার জন্য কেন আরব বিশ্বের তেল রপ্তানিকারী দেশগুলি কাজ করেছিল তা আলোচনা করুন।

৩. আপনি কি ১৯৭০ দশক থেকে বিশ্ব বাজারে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন? ব্যাখ্যা করুন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী

১. ১৯৬৭ এবং ১৯৭৩-র মধ্যবর্তীকালে তেলের দাম অপ্রত্যাশিত ভাবে বৃদ্ধি হয়েছিল কেন?

২. রেড লাইন এগ্রিমেন্ট কি? কেন তার সমাপ্তি ঘটে?

৩. নাসেরের তেল নিষেধাজ্ঞা (Oil blockade)-যুক্তি কি ছিল? কেন সেই নীতি সৌদি-তে নাসেরের পরবর্তীকালেও চালু ছিল?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. টীকা লিখুন— 'OAPEC'

২. সেভেন সিস্টার্স বলতে কাদের বোঝান হয়?

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

1. Nicholas Parra, *Oil Politics : a modern history of Petroleum,* (London: I.B. Tauris, 2004)
2. Oystein Noreng, *Crude Power: Politics and the Oil Market,* (London: I.B. Tauris, 2007)
3. William Engdahl, A Century of War Anglo-American Oil Politics and the New World Order, (London, Pluto, 1992)
4. John M. Blai, *the Control of Oil* (New York, Pantheon Books, 1976)

একক—৪ ❑ পশ্চিম এশিয়ার আঞ্চলিক রাজনীতি এবং আঞ্চলিক সংগঠনসমূহ

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ ভূমিকা

৪.৩ আরব লীগ

৪.৪ প্যালেস্টিনিয়ান লিবারেশন অরগ্যানাইজেশন (PLO)

৪.৫ অরগ্যানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স/ কোঅপারেশন (OIC)

৪.৬ গাল্ফ কোঅপারেশন কাউন্সিল (GCC)

৪.৭ আরব কোঅপারেশন কাউন্সিল (ACC)

৪.৮ নমুনা প্রশ্নাবলী

৪.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্যগুলি হল—

- পশ্চিম এশিয়ায় আঞ্চলিক রাজনীতির জটিলতা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা গঠনে সহায়তা করা।
- আরব লীগের উত্থান ও বিকাশ সম্পর্কে জ্ঞানলাভে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।
- পি. এল. ও-এর বিকাশ ও প্রকৃতি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অবগত করা।
- QIC, GCC এবং ACC-র বিষয়ে সাধারণ ধারণা গঠনে শিক্ষার্থীর সাহায্য করা।

৪.২ ভূমিকা

১৯৪৫-এর পরের যুগে, বিশ্ব রাজনীতি যখন প্রকৃত অর্থে বিশ্বের রাজনীতি হয়ে উঠেছিল, বহুপাক্ষিক কূটনীতি বিভিন্ন দেশের মধ্যে সংকীর্ণ রাজনীতির গণ্ডীর ঊর্ধ্বে উঠে তাঁদের পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের সমস্যাগুলি যৌথভাবে দূর করতে বেশী উপযোগী সাব্যস্ত হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে এক্ষেত্রে বিংশ শতকের আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্যতম এই বৈশিষ্ট্য পশ্চিম এশিয়ার রাজনীতিতে

অনুপস্থিত। পশ্চিম এশিয় দেশগুলি সাধারণত তাঁদের সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের চিরাচরিত নিরাপত্তা নিয়েই মেতে থাকেন যদিও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে যত সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক মিল পাওয়া যায় তা অন্য কোনও অঞ্চলে বিরল। যে যুগে নিরাপত্তা সংক্রান্ত চিন্তার জন্য মানুষ দেশীয় সীমান্তের ঊর্ধ্বে উঠে সমাধান খুঁজে থাকেন, সেখানে রাষ্ট্রীয় চেতনায় আচ্ছন্ন থেকে আঞ্চলিক রাজনীতির আপেক্ষিক অবহেলা খানিকটা বিস্ময়কর। এই রহস্যের সমাধান খুঁজতে একটি অঞ্চল হিসাবে মধ্যপ্রাচ্যের বিবর্তনের প্রক্রিয়াটা বোঝা দরকার।

ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক কারণে একজোট থাকার যে স্বাভাবিক প্রবণতা মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলির মধ্যে গড়ে উঠছিল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে তেল-প্রধান পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠাতে সেই প্রবণতা আরও বেড়ে যায়। ওই অঞ্চলের এবং অঞ্চলের বাইরে থেকে আসা বিশাল সংখ্যক মানুষ জীবিকার খোঁজে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে থাকলে স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্নগুলি নিছকই রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে আর সীমাবদ্ধ থাকে না, তা এক আঞ্চলিক মাত্রা পেয়ে যায়। কিন্তু এই অঞ্চলের বহু রাষ্ট্রীয় সীমানাই বিতর্কিত রয়ে গেছে বলে রাষ্ট্রগুলি সচরাচর তাঁদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কোন দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা-বিষয়ক সহযোগিতার কথা চিন্তা করতে সাহস পায়না।

এই কারণেই আঞ্চলিকতা পশ্চিম এশিয়ায় খুব উপযোগী সাব্যস্ত হয়ে ওঠেনি। আফ্রিকা বাদ দিলে বিশ্বের অন্যান্য যেকোনো জায়গার তুলনায় মধ্য প্রাচ্যে আঞ্চলিক সংগঠন সংখ্যায় কম, এবং যেগুলি আছে সেগুলির প্রভাবও বিশেষ সুদূরপ্রসারী হয়ে ওঠেনি। এর আরেকটা কারণ এই অঞ্চলে প্রায়-সমান ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের সংখ্যা (মিশর, ইরাক, ইরান, সৌদি আরব) আনুপাতিকভাবে অন্যান্য যে কোনও অঞ্চলের থেকে বেশী, এবং এদের মধ্যে কোনও দেশই অন্যের কর্তৃত্ব মেনে নিতে নারাজ, এবং প্রত্যেকেই নিজের কর্তৃত্ব অন্যের ওপরে চাপাতে ব্যর্থ। দ্বিতীয় সমস্যা হল এদের মধ্যে আঞ্চলিক রাজনীতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবহ – যেমন ১৯৫০ এবং '৬০-এর দশকে হয়েছিল মিশর এবং ইরাকের মধ্যে, '৮০-র দশকে ইরাক এবং ইরানের মধ্যে, এবং বর্তমানে মিশর এবং সৌদি আরব এবং ইরান এবং সৌদি আরবের মধ্যে। তাই খানিকটা অদ্ভুতভাবে পশ্চিম এশিয়ার আঞ্চলিক সংগঠনগুলিতে সদস্য সংখ্যা যত কম, সেই সংগঠন তত বেশী কার্যকরী-সাব্যস্ত হয়েছে (যেমন GCC), এবং যত বেশী সদস্য তত কম কার্যকরী (যেমন OIC)।

পরবর্তী অংশে আমরা পশ্চিম এশিয়ার পাঁচটি আঞ্চলিক সংগঠন নিয়ে আলোচনা করব – আরব লীগ, PLO, GCC, OIC এবং ACC।

৪.৩ আরব লীগ

আরব লীগ হল সম্ভবত একমাত্র সংগঠন যেটির মূল উদ্দেশ্য ছিল আরব দেশগুলিকে একটি অখণ্ড রাজনৈতিক বৃত্তে ধরে রাখা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সৃষ্টি হওয়া এই সংগঠনটি আরব রাজনৈতিক অখণ্ডতার স্বপ্ন এবং আরব অর্থনৈতিক বৃত্তটি পুনর্গঠনের প্রচেষ্টার যৌথ ফল। ১৯৪৫ সালে মাত্র ছ'টি দেশ নিয়ে শুরু হওয়া আরব লীগে বর্তমানে ২২টি সদস্য দেশ এবং চারটি পর্যবেক্ষক দেশ যারা আরব দুনিয়ার সব প্রান্ত থেকে আসছে। আরব লীগের ঘোষিত লক্ষ্য হল সদস্য দেশগুলিকে অর্থনৈতিক ভাবে একত্রে আনা, এবং সদস্য দেশগুলির মধ্যেকার সমস্যা পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়া যাতে লীগের বাইরের কারও দরকার না হয়।

আরব লীগের জন্ম হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আরবদের মধ্যে সহযোগিতার ব্যাপারে ব্রিটিশ উৎসাহ পেয়ে এক রাশি উদ্যোগের ফলস্বরূপ যার মধ্যে অন্যতম ছিল ১৯৪৪ সালের আলেকজান্দ্রিয়া প্রোটোকল। প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র সৃষ্টির সমূহ সম্ভাবনা দেখে আরব দেশগুলির উপলব্ধি হয় যে আরব দেশগুলি যতদিন বিভক্ত থাকবে ততদিন (বাইরের) পশ্চিমি দেশগুলি আরব দুনিয়ায় যথেচ্ছাচার চালিয়ে যেতে পারবে। তাই ছয় স্থাপক-সদস্য (মিশর, সিরিয়া, ইরাক, ট্রান্স-জর্ডান, সৌদি আরব, লেবানন) এমন একটি সংগঠন স্থাপন করতে চায় যাতে আরব দুনিয়ার বাইরে সবার সামনে আরবরা ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারে। সদস্য (বা সদস্য নয় এমন) দেশের মধ্যে যে কোনও বিবাদ মেটাতে লীগ সদস্যরা হিংসার আশ্রয় না নিতে অঙ্গীকার করে। স্বাক্ষরকারী দেশগুলি সামরিক ব্যাপারেও সহযোগিতা করতে সম্মত হয়। ১৯৫০ সালে লীগ যৌথ প্রতিরক্ষা এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে একটা চুক্তি সই করেন, যাতে বলা হয় কোন একটা দেশের ওপরে আক্রমণের অর্থ গোটা লীগের ওপরেই আক্রমণ।

লীগের সামনে যে প্রশ্নগুলি ছিল তার মধ্যে সবথেকে পুরানো বিষয়টি ছিল প্যালেস্টাইন, সেটির এখনও মীমাংসা হয়নি। লীগ প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে সৌদি আরব বাদে বাকি সদস্যরা প্যালেস্তিনিয়দের পাশে দাঁড়াতে সদ্য-প্রতিষ্ঠিত ইজরায়েল রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে। ইজরায়েলের কাছে যুদ্ধে পরাস্ত হয়েও লীগ প্যালেস্টাইনের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে গিয়েছিল কারণ হাজার হাজার প্যালেস্তিনিয় ইজরায়েল এবং ইজরায়েলি অধিকৃত এলাকা ছেড়ে পালাতে শুরু করলে আরব দুনিয়ার সবথেকে দীর্ঘমেয়াদি উদ্বাস্তু সমস্যার জন্ম হয়। ১৯৬৪ সালের কায়রো সম্মেলনে আরব লীগ প্যালেস্তিনিয়দের প্রতিনিধিত্বের উদ্দেশ্যে একটি সংগঠন সৃষ্টি করে। সংগঠনটির নাম ছিল প্যালেস্তিনিয় জাতীয় পরিষদ

(Palestinian National Council), যার প্রথম আধিবেশন বসে পূর্ব জেরুসালেম-এ ২৯ মে ১৯৬৪ সালে। ঐ অধিবেশনেই প্রতিষ্ঠা হয় Palestinian Liberation Organisation (বা PLO)-র। পরবর্তী কালে PLO লীগে একটি পুরদস্তুর রাষ্ট্র না হওয়া সত্ত্বেও প্যালেস্তিনিয়দের প্রতিনিধিত্বের অধিকার পেয়েছিল।

লীগের প্রথম দুই দশকে প্যালেস্তিনিয় প্রসঙ্গটি ছিল সবথেকে বেশী আলোচিত, এবং এই সময়ে মিশর ছিল সবথেকে বেশী প্রভাবশালী সদস্য। ১৯৬৭ সালে লীগের দুই সদস্য মিশর এবং ইরাকের বিরুদ্ধে ইজরায়েল যুদ্ধে নামলে লীগ খানিকটা বিপাকে পড়ে। মিশরের সাদাত চাইছিলেন যে লীগের অন্যান্য সদস্যরা ইজরায়েলকে সাহায্য করে এমন সব দেশকে তেল বিক্রি বন্ধ করুক, কিন্তু তেল রপ্তানী করা লীগ সদস্যের মধ্যে অন্যতম সৌদি আরব এতে রাজী ছিলনা। সেই বছরেই লীগ খারতুম প্রস্তাব পাশ করে যাতে লীগ সদস্যেরা স্থির করে প্যালেস্টাইন সমস্যা না মেটা পর্যন্ত "ইজরায়েলের সঙ্গে শান্তি নয়, ইজরায়েলকে স্বীকৃতি নয়, কোনও আলোচনা নয়"। ১৯৪৮ সাল থেকেই লীগ সদস্যরা ইজরায়েলের পণ্য এবং সংস্থা বয়কট করে চলেছে, যদিও ইজরায়েলের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার প্রভাব কতটা তা নিশ্চিত করে বলা খুব শক্ত।

১৯৬৭-তে মিশরের পরাজয়ের পরে, এবং তার পাশাপাশি সৌদি আরব এবং লিবিয়ার উত্থানের ফলে, লীগের চরিত্রটা বদলাতে শুরু করে, এবং লীগ প্যালেস্টাইন সমস্যার বাইরে আরবদের অন্যান্য সমস্যা আলোচনা করতে শুরু করে। ১৯৭৩ সালে আরব লীগের তেল রপ্তানিকারী দেশগুলি ঠিক সেই ধরণের তেল বিক্রির ওপরে নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেয় যেমনটা নাসের চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য যতটা না মিশর এবং সিরিয়ার পাশে দাঁড়ানো তার থেকে বেশী পশ্চিমি কোম্পানিগুলির হাত থেকে তেলের বাজারের নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা। মিশর খারতুম প্রস্তাব লঙ্ঘন করে ইজরায়েলের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করলে সৌদি উদ্যোগে মিশরের সদস্যপদ বিলম্বিত করে দেওয়া হয়। ১৯৮৯ সালে মিশরকে আবার লীগে যখন ফিরিয়ে নেওয়া হয়, ততদিনে লীগ রাজনৈতিক বিষয়ের থেকে অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে বেশী ব্যস্ত থাকত।

অবশ্য এটা ঠিক যে লীগে সৌদি প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হবার আগেও একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল যাতে সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ট হয় – যেমন Joint Arab Economic Action Charter, যেটি ঐ অঞ্চলে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মৌলিক উপাদানগুলি আলোচনা করে। ১৯৬৫ সালে একটি অখণ্ড বাজার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক

রিষয়গুলি আগ্রাধিকার পেতে শুরু করে ১৯৭৩ সাল থেকে, Arab League Educational, Cultural and Scientific Organisation (ALFSCO), Economic and Social Council of the Arab League, এবং Council of Arab Economic Unity-র মত সংস্থার মাধ্যমে। স্কুলের পাঠ্যক্রম স্থির করা, আরব সমাজে মহিলাদের অবস্থার উন্নয়ন, শিশু কল্যাণের প্রতি নজর দেওয়া, ক্রীড়া-সংস্কৃতি গড়ে তোলা, আরব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখা এবং সদস্য দেশগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান নিশ্চিত করা – এই সমস্ত ক্ষেত্রেই লীগ সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। লীগ স্বাক্ষরতা বিষয়ক উদ্যোগ নিয়েছে, এবং আধুনিক বিজ্ঞানের বিজাতীয় ভাষা থেকে সহজবোধ্য আরবী ভাষাতে অনুবাদের ব্যবস্থাও করে চলেছে। এছাড়া লীগ অপরাধ এবং মাদক সমস্যা, এবং পরবর্তীকালে (প্রধানত আরব) শ্রমিকদের সম্পর্কিত সমস্যার দিকেও বিশেষ নজর দিয়ে থাকে।

সময়ের সাথে সাথে আরব লীগ নিজেকে প্রধানত অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিষয়েই সীমাবদ্ধ রেখে রাজনৈতিক বিষয়ে প্রায় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। কোনও প্রস্তাব বলবৎ করার মত কোনও কাঠামো না থাকাতে লীগকে অনেকে নিছকই "মহিমান্বিত বিতর্ক সভা" বলে সমালোচনা করেছেন। লীগের সংবিধান বলে যে কোনও সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত শুধু তাঁদের ওপরেই লাগু হবে যারা সেগুলি মেনে নেবে"— অর্থাৎ রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকারের গুরুত্ব লীগের যৌথভাবে কাজ করার অধিকারকে খর্ব করে রেখেছে। লীগ যে সব ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে সফল হয়েছে, সেগুলি সাধারণত তার মুষ্টিমেয় সদস্যের কৃতিত্ব। যেমন লীগের বৃহত্তম সাফল্য, লেবাননের গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে যে তা'ইফ চুক্তির দ্বারা, সেটি প্রধানত সৌদি উদ্যোগে সম্পন্ন হয়েছিল।

সাম্প্রতিক কালে সুন্নী এবং শিয়া মুসলিমদের মধ্যে বাড়তে থাকা উত্তেজনা আরবদের মধ্যে বিভাজন বাড়ছে, যাতে সিরিয়া এবং ইরাকের পরিস্থিতি আরও ইন্ধন যোগাচ্ছে। আরব লীগ সুন্নী কট্টরপন্থী গোষ্ঠী ISIS-এর তীব্র নিন্দা করেছে, এবং সৌদি আরব, কাতার, জর্ডান, এবং সংযুক্ত আরব আমীরশাহী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও নেমেছে, কিন্তু বিশেষ কেউ ইরাকি সরকারের সঙ্গে হাত মেলাতে রাজী হয়নি কারণ বাগদাদ ইরানি সামরিক পরামর্শদাতাদের সাহায্য নিয়েছে, এবং তেহরান সমর্থিত শিয়া সামরিক বাহিনীকে যুদ্ধে যোগ দিতে দিয়েছে।

৪.৪ প্যালেস্টিনিয়ান লিবারেশন অরগ্যানাইজেশণ (PLO)

১৯৬৪ সালে কায়রোয় অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে প্যালেস্তিনিয় জাতীয় সংসদের প্রতিষ্ঠা হয়। জেরুজালেমে অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম অধিবেশনের শেষের দিকে PLO-র প্রতিষ্ঠা হয় ২রা জুন

১৯৬৪ সালে – মূল উদ্দেশ্য সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে প্যালেস্টাইনের মুক্তিলাভ। তার পরের তিন দশকে বিশ্ব দরবারে PLO প্যালেস্তিনিয়দের প্রতিনিধি এবং তাঁদের সংগ্রামের প্রতিভূ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে। অসলো চুক্তির পরে সবার নজর গিয়ে পড়ে Palestinian Authority (PA)-র ওপরে, ফলে PLO বিশ্বের নজর থেকে অনেকটাই সরে গেছে – লোকে মনে করে PLO আর আগের মত প্রাসঙ্গিক নেই।

প্যালেস্টাইনের মুক্তির উদ্দেশ্যে নিবেদিত PLO মোটের ওপর ধর্মনিরপেক্ষ একাধিক আন্দোলনের সমষ্টি। PLO-র মধ্যে ছোট-বড় অনেক প্রতিবাদী সংগঠন, রাজনৈতিক দল, এবং অন্যান্য সংস্থা রয়েছে যারা প্যালেস্টাইনের ভিতরে এবং বাইরে প্যালেস্তিনিয়দের জন্য কাজ করে চলত। গোড়া থেকেই PLO-কে বলা হত প্যালেস্টাইনের নির্বাসিত সরকার, কারণ সংগঠনটি ঠিক তেমন ভাবেই কল্পনা করা হয়েছিল - এর অন্তর্ভুক্ত ছিল বিভিন্ন দেশে বিভক্ত প্যালেস্তিনিয়দের দ্বারা নির্বাচিত একটি আইনসভা (প্যালেস্টাইনের জাতীয় সংসদ বা PNC), এবং একটি শাসন বিভাগ (Executive Council বা FC) যেটিকে সংসদ নিয়োগ করত।

PLO-র মূল বক্তব্য, যা প্রতিফলিত হয়েছিল প্যালেস্তিনিয় জাতীয় ঘোষণাপত্রে (Palestinian National Charter), হল যে ইহুদী জাতীয়তাবাদীরা প্যালেস্তিনিয়দের অন্যায় ভাবে প্যালেস্টাইন থেকে বিতাড়িত করে, ইহুদীদের জন্য প্যালেস্টাইনের ওপরে এক মিথ্যা ঐতিহাসিক দাবী পেশ করে একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। PLO চায় প্যালেস্তিনিয় উদ্বাস্তুদের ঘরে ফিরতে দেওয়া হোক। PLO বরাবরই প্যালেস্তিনিয়দের আরব বলে উল্লেখ করে এসেছে। এর একটা কারণ অবশ্যই এই যে PLO কার্যত আরব লীগেরই সৃষ্টি; কিন্তু অন্য কারণ হল এতে আরবদের ওপরে প্যালেস্তিনিয়দের জন্য কিছু করার একটা নৈতিক চাপ বজায় থাকবে। তাই বহু দশক ধরে প্যালেস্তিনিয় রাষ্ট্রের মৌলিক পরিচিতি প্রধানত একটি আরব রাষ্ট্র হিসাবেই থেকে গেছে।

PLO-র প্রথম পাঁচ বছর নেতৃত্ব দেন ম্যাণ্ডেট্রি যুগের বর্ষীয়ান নেতা আহমেদ শুকেইরি এবং ইয়াহিয়া হামুদা। ১৯৬৯ সালে, প্যালেস্টাইনের বাইরে বড় হওয়া এক নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসাবে PLO-র চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন হরকত্ আল্-তহ্রির আল্-ফিলিস্তিনিয়ুন বা ফাতাহ্ (প্যালেস্তিনিয় স্বাধীনতা আন্দোলন)-এর প্রতিষ্ঠাতা ইয়াসের আরাফাত, যিনি ওই পদ ২০০৪ সাল থেকে তাঁর মৃত্যু অবধি অধিকার করে ছিলেন। আরাফাতের নেতৃত্বে PLO তাদের সশস্ত্র সংগ্রামের উদ্দেশ্যকে

পরিমার্জন করে দীর্ঘমেয়াদি সংগ্রাম এবং গেরিলা আক্রমণের মধ্যে দিয়ে ইজরায়েলকে নিশ্চিহ্ন করার ব্রত নিয়েছিল।

PLO-র সংগ্রাম সেই সমস্ত আরব সরকারের থেকে প্রচ্ছন্ন মদত পেয়েছিল যাদের দেশে বিশাল সংখ্যক প্যালেস্তিনিয় উদ্বাস্তু থাকত। ১৯৬০-এর দশকের শেষ অবধি মিশর ছিল প্যালেস্তিনিয় প্রতিরোধের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, কিন্তু নাসেরের পরের যুগে PLO এবং আরাফাতের উত্থান হলে পরে প্যালেস্তিনিয়রা নিজেরাই জর্ডান, সিরিয়া, লেবানন এবং মিশর থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম চালাতে শুরু করে। যদিও PLO-র অন্যান্য গোষ্ঠীর চালানো সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ অনেক বেশী নজর কেড়ে নিত (যেমন ম্যুনিখ অলিম্পিক হত্যাকাণ্ড, ১৯৬০ এবং '৭০-এর দশকের একাধিক বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনা, ইত্যাদি), আরাফাতের ফাতাহ গোষ্ঠীর গেরিলা আক্রমণেই ইজরায়েলের সবথেকে বেশী ক্ষতি হতে থাকত।

PLO-র সংগ্রামের ফলে প্যালেস্তিনিয় লক্ষ্য পূরণ না হলেও তাদের সামরিক ক্ষমতা প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে অনেক সময় জটিলতা সৃষ্টি করত যার ফলে প্রতিবেশী দেশগুলি অনেক সময় PLO-র উপরেই চড়াও হত। ১৯৬৭ সালে ইজরায়েলের মিশর এবং সিরিয়া আক্রমণ, এবং গাজা তথা গলান হাইটস দখল প্রধানত ওই এলাকা দুটিতে PLO ঘাঁটি ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে। এই ধরনের জমি হাতছাড়া হবার পরেই আরব রাষ্ট্রগুলি PLO-কে প্রত্যক্ষ সমর্থনের নীতি থেকে সরে আসে। ১৯৭১ সালে ইজরায়েল প্যালেস্তিনিয় গেরিলা হানার আশঙ্কায় জর্ডানের মধ্যে ঢুকে আক্রমণ করলে, আম্মানের সরকার তাঁদের জমি থেকে PLO-র কার্যকলাপের ওপরে কিছু বিধিনিষেধ আনতে চেষ্টা করে। প্রত্যুত্তরে প্যালেস্তিনিয়রা জর্ডানের ওপরে এমন প্রবল আঘাত হানে যে রাজা হুসেন অচিরেই PLO-কে বিতাড়িত করে দেন। পলাতক প্যালেস্তিনিয়রা এর পরে লেবাননে আশ্রয় নিলে লেবাননের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বে দীর্ণ রাজনীতি তাঁদের গ্রাস করে নেয়, এবং শুরু হয় লেবাননের গৃহযুদ্ধ।

১৯৮০-র দশকে PLO প্যালেস্টাইন সংলগ্ন দেশগুলি থেকে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে ব্যর্থ হলে ঘাঁটি বদলে তিউনিস-এ চলে যায়। ইতোমধ্যে PLO-র মধ্যে ফাতাহ-কে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে ইজরায়েল কিছু ইসলামী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে অধিকৃত প্যালেস্টাইনে কাজ করার অনুমতি দেয়। ১৯৮০-র দশকের শেষ দিকে তাই ফাতাহ-র ব্যর্থতায় বীতশ্রদ্ধ প্যালেস্তিনিয়দের একটা বড় অংশ এক

ইসলামী বিকল্প হিসাবে হামাস (হরকত আল-মকাওয়াম্মাত আল-ইসলামিয়া, বা ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন)-এর দিকে ঝুঁকতে শুরু করে।

'১৯৮৭ সালে যখন পশ্চিম তট এবং গাজা-তে ইন্তিফাদা (অভ্যুত্থান) শুরু হয় PLO রীতিমত চমকে যায়, এবং খোদ প্যালেস্টাইনের ঘটনাক্রম PLO নেতৃত্বকে বাধ্য করে ইন্তিফাদার প্রতি তাঁদের সমর্থন জানাতে। দীর্ঘ চার দশক আম্মানের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে থাকার পর পশ্চিম তট (West Bank) এলাকা জর্ডানের থেকে বিচ্ছিন্ন করার ঘোষণা করা হলে আলজিয়ার্স-এ PNC স্বাধীনতার ঘোষণায় স্বাধীন প্যালেস্টাইল সৃষ্টির কথা বলেন প্রধানত প্যালেস্টাইনের রাজনীতিতে নিজেদের প্রাসঙ্গিক রাখার স্বার্থে। নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে আরাফাত ঘোষণা করেন যে তিনি ইজরায়েলের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় প্রস্তুত (অর্থাৎ কার্যত ইজরায়েলের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করে নেন) যদি প্যালেস্তিনিয়দের গাজা এবং পশ্চিম তটে তাদের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে দেওয়া হয়।' তেল আভিভ-ও বুঝতে পেরেছিল যে প্রবাসী PLO-কে সামলানো সম্ভব হলেও ইন্তফাদার কোনও সামরিক সমাধান সম্ভব নয়। অতএব গোপনে আলোচনা শুরু হয়, যার পরিণতি ঘটে ১৯৯৩-র আগস্ট মাসে অসলো চুক্তির মাধ্যমে – এতে প্যালেস্তিনিয়দের গাজা, জেরিকো এবং পশ্চিম তট এলাকায় প্যালেস্তিনিয় কর্তৃপক্ষ (Palestinian Authority বা PA)-র হাতে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হয়। আরাফাতকে PA-র শীর্ষ নেতা নিযুক্ত করা হয়, এবং নির্বাচনের সময়পঞ্জী স্থির করা হয়। অসলো চুক্তির সময় (১৯৯৩) থেকে কূটনীতি এবং আলাপ-আলোচনা PA তথা PLO-র সরকারী নীতি বলে গৃহীত হয়, হামাসের আপত্তি সত্ত্বেও।

অসলো চুক্তি উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ভাবে PA সৃষ্টি করে অধিকৃত প্যালেস্টাইনের প্যালেস্তিনিয়দের থেকে PLO এবং প্রবাসী এবং উদ্বাস্তুদের আলাদা করে দিয়েছিল। যদিও PLO-র সঙ্গে যুক্ত অনেকেই অসলো চুক্তির বিরোধিতা করেছিল, EC এবং PNC, উভয়েই এই চুক্তি মঞ্জুর করে দেয়। এর পর থেকেই PLO-র পতন শুরু হয় কারণ PA হয়ে ওঠে প্যালেস্তিনিয়দের মূল প্রতিনিধি। একমাত্র ২০০৬-০৭-এর সময়ে হামাস যখন PA-র সরকার গড়ার চেষ্টা করছিল, PLO আবার ভেসে ওঠে।

আরব লীগ এবং রাষ্ট্রসংঘ PLO-কে প্যালেস্তিনিয়দের প্রতিনিধি বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৮৭ অবধি (এবং ইজরায়েল ১৯৯১ পর্যন্ত) PLO-কে নিছকই একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বলে দেখত, বিশ্বের অন্যত্র ১৯৭০-সাল থেকে PLO-কে প্যালেস্তিনিয়দের প্রতিনিধি হিসাবে মেনে নেওয়া হয়েছিল। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় ওই স্বীকৃতি মেলে ১৯৭৪-এর নভেম্বরে, এবং ১৯৮৬

সালে এশিয়া গ্রুপে পূর্ণ সদস্য হিসাবেও দাখিল হয় PLO। অসলো চুক্তির পরে PA ইজরায়েল অধিকৃত অঞ্চলের প্যালেস্তিনিয়দের শাসনের অধিকার পেয়েছে, PLO আজও প্যালেস্তিনিয়দের প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে চলেছে। দুটি সংস্থা যে আজ স্বতন্ত্র তার প্রমাণ ২০০৬ সালে হামাস PA-র নির্বাচনে জিতলেও রাষ্ট্রসংঘে প্যালেস্তিনিয়দের প্রতিনিধিত্ব করে ফাতাহ-প্রভাবিত PLO, যারা সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি মাহমুদ আব্বাসের নেতৃত্বে প্যালেস্তিনিয়দের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পাবার দাবী পেশ করেছে।

৪.৫ অরগ্যানাইজেশন অফ ইসলামিক কনফারেন্স/ কো-অপারেশন (OIC)

অরগ্যানাইজেশন অফ ইসলামিক কনফারেন্স (OIC), যার নাম বদলে ২০১২ সালে অরগ্যানাইজেশন অফ ইসলামিক কোঅপারেশন রাখা হয়, ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন যার বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৬৯। এই সংগঠনটির উদ্দেশ্য "মুসলিম দুনিয়ার যৌথ স্বর" হিসাবে কাজ করার, এবং "আন্তর্জাতিক শান্তি এবং সম্প্রীতির মাধ্যমে মুসলিম দুনিয়ার স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করা"। এর সদস্য দেশগুলি আসছে এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপ থেকে, শুধু এমন দেশ থেকেই নয় যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণই ইসলাম ধর্মাবলম্বী, বরং এমন ভারতবর্ষও সদস্য বা পর্যবেক্ষক দেশ হতে চেয়েছিল, কিন্তু মুসলিম দুনিয়ার অধিকাংশ দেশের থেকে বেশী মুসলিম ভারতে বাস করা সত্ত্বেও সেই আবেদন খারিজ করা হয়।

উসমানী সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে খিলাফত ব্যবস্থারও অবসান ঘটলে প্রশ্ন ওঠে ইসলামী জগতের নেতার অনুপস্থিতিতে মুসলিম দুনিয়া চলতে পারবে কিনা। ১৯২০-র দশক থেকেই পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামী কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হতে শুরু করে এই বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে, যদিও প্রথম উল্লেখযোগ্য জমায়েত হয় জেরুসালেম-এ অনুষ্ঠিত তৃতীয় অধিবেশনে (১৯৩১)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে রাজনীতিবিদদের নিয়ে উল্লেখযোগ্য একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালে, কিন্তু তাতেও ব্যাপারটা বিশেষ এগোয়নি। কিন্তু ১৯৬৯ সালের অগাস্ট মাসে জেরুসালেমের পবিত্র আল-আক্সা মসজিদে আগুণ লাগলে বিভিন্ন ইসলামী দেশের রাজা, রাষ্ট্রপ্রধান, এবং শাসকবর্গ প্রথম ইসলামী সম্মেলনের ডাক দেন। মরক্কোর রাবাত-এ ২২-২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯-এ অনুষ্ঠিত ওই শীর্ষ বৈঠকে প্যালেস্তিনিয়দের প্রতি সবার সমর্থন এবং বিশ্বের মুসলিম দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় ব্যাপারে সহযোগিতার অঙ্গীকার করা হয়।

OIC-র পিছনে মূল চালিকাশক্তি ছিল সৌদি আরব, যার রাজনৈতিক বৈধতার মূল উপাদান হল ইসলামের পবিত্রতম দুটি শহর মক্কা এবং মদিনার অভিভাবকত্ব। মিশর এবং সিরিয়ার যৌথ বাহিনী

ইজরায়েলের কাছে পরাস্ত হলে মিশর তার তৈল সমৃদ্ধ প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে তারা ইজরায়েল এবং তার পশ্চিমি মিত্রদের বিরুদ্ধে তৈল অবরোধ চালু না করে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। এর কূটনৈতিক জবাব দিতে গিয়ে সৌদিরা রাবাতের ওই অধিবেশনের আয়োজন করে। ১৯৭০ সালে সৌদি রাজ্য ফয়জল জেদ্দায় মুসলিম দেশগুলির বিদেশমন্ত্রীদের আহ্বান করেন, যারা মুসলিম দুনিয়ার সামনে থাকা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আলোচনার জন্য এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য একটি ফোরাম গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। এর থেকেই জন্ম হয় OIC-র, যার সংবিধান গৃহীত হয় ১৯৭২-এর মার্চ মাসে এবং কার্যকর হয় ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩-এ।

OIC-র ঘোষিত উদ্দেশ্য হল ইসলামী সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মূল্যবোধকে জিইয়ে রাখা; সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখা; সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং বিজ্ঞানচর্চায় সহযোগিতা বাড়ানো; আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা; এবং শিক্ষা, বিশেষত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার করা।

এক বহুস্তরীয় কূটনৈতিক মঞ্চ হিসাবে মুসলিম দুনিয়ার বাইরে OIC-র কোনও প্রভাবই নেই, কারণ সংগঠনটি শুধুই দেশগুলির জন্য উদ্দিষ্ট। জন্মলগ্নে সৌদি আরব যাই ভেবে থাকুক না কেন, রিয়াধ এই মঞ্চটি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে, কারণ সৌদিদের সমান আর্থিক ক্ষমতা সম্পন্ন কিছু দেশ (যেমন ইরাক, ইরান, লিবিয়া) বা মুসলিম দেশগুলিকে নেতৃত্ব দেবার ঐতিহাসিক দাবীদার দেশ (যেমন মিশর, তুরস্ক, অমান, মরক্কো) সৌদি আরবকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে, ঠিক যেমন করেছে পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়ার মত জনবহুল মুসলিম দেশ। সময়ের সাথে সাথে মুসলিম দুনিয়ার দৃষ্টি জেরুসালেমের পরিণতি ছেড়ে অন্যান্য অনেক বিষয়ের ওপরে পড়েছে, যেমন ১৯৯০-এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের পরে মধ্য এশিয়ার মুসলিম-প্রধান প্রজাতন্ত্রগুলির মুসলিম মূলস্রোতে ফিরে আসার প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সাব্যস্ত হয়।

মানবাধিকার জাতীয় প্রসঙ্গগুলি উত্থাপন করে OIC আজ মুসলিম দুনিয়ায় এক নরমপন্থী স্বর বলে পরিচিত। ১৯৯০-র অগাস্ট মাসে OIC-র ৪৫ জন বিদেশমন্ত্রী 'ইসলামে মানবাধিকারকে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রমাণ করা যায় সে বিষয়ে একটা রূপরেখা প্রস্তুত করে। ২০০৮ সালের জুন মাসের মধ্যে OIC তার সংবিধান পরিমার্জন করে কায়রো ঘোষণাপত্রের উল্লেখ ছাড়াই মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার, এবং সুশাসন রাষ্ট্রচালনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে স্বীকৃতি দেয়। ওই পরিমার্জনের ফলে OIC আজ Universal declaration of Human Rights-কেও সমর্থনের অঙ্গীকার করেছে।

সদস্য সংখ্যা বাড়ার ফলে এই মঞ্চটি ক্রমশ: তার আদি আঞ্চলিক রূপ হারিয়ে এমন একটা সংস্থায় পরিণত হয়েছে যাতে পশ্চিম এশিয়ার প্রায় সমস্ত দেশই উপস্থিত রয়েছে, কিন্তু নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় নয়।

৪.৬ গাল্ফ কো-অপারেশন কাউন্সিল (GCC)

আবু ধাবি-তে ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত কোঅপারেশন কাউন্সিল অফ দ্য গাল্ফ স্টেটস্ বা গাল্ফ কোঅপারেশন কাউন্সিল (GCC) হল একটি আঞ্চলিক আন্ত:সরকারী রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যার সদস্য হল পারস্য উপসাগরের সব ক'টি আরব দেশ – অর্থাৎ বাহরেন, কুয়েত, অমান, কাতার, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমীরশাহী। এর মধ্যে ওমান বাদ দিলে প্রত্যেকটি রাজ্যই বিংশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত। কাতার, কুয়েত এবং বাহরেন হল সাংবিধানিক রাজতন্ত্র, সৌদি আরব এবং ওমানে রয়েছে কাগজে-কলমে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র। সংযুক্ত আরব আমীরশাহী হল সাতটি আমীরশাহীর ফেডারেশন। আরও দুটি রাষ্ট্রের (জর্ডান এবং মরক্কো) অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে, এবং প্রস্তাব রয়েছে ইয়েমেনকেও এর আওতায় নিয়ে আসা। এয়েমেন এর অন্তর্ভুক্ত হলে তা হবে GCC-র প্রথম প্রজাতান্ত্রিক সদস্য। ২০১১ সালে GCC কে একটি "উপসাগরীয় ঐক্যে" (Gulf Union)-এ পরিণত করার প্রস্তাব তোলা হয়, যাতে সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে— আপাতভাবে মনে হয় এর উদ্দেশ্য এই অঞ্চলে ইরানের ক্রমশ বাড়তে থাকা প্রভাবকে ঠেকানো।

উপসাগরীয় রাজতন্ত্রগুলিকে একটি বৃহত্তর সংগঠনের আওতায় আনার প্রস্তাবটি আসে ১৯৭০-এর দশকে যতটা কাতার, বাহরেন এবং কুয়েতের থেকে ততটাই সৌদি আরবের থেকেও। এর প্রধান চালিকাশক্তি ছিল, বলাই বাহুল্য, সৌদি আরব। ইরানের ইসলামিক বিপ্লব এবং ইরাক-ইরান যুদ্ধের মত কিছু ঘটনায় উপসাগরীয় ভারসাম্য বিপন্ন হতে পারে এই আশঙ্কায় রিয়াধ থেকে একটা কূটনৈতিক উদ্যোগ নেওয়া হয় যাতে ইরানের বৈপ্লবিক চরিত্রের প্রভাব উপসাগরীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে না পড়তে পারে।

১৯৮০-র দশকের গোড়া থেকেই GCC বিভিন্ন ক্ষেত্রে সদস্যদের জন্য কিছু সর্বজনগ্রাহ্য নিয়ম তৈরির চেষ্টা করে ধর্ম, অর্থ, বাণিজ্য, শুল্ক, পর্যটন, প্রশাসন এবং আইনপ্রণয়নের বিষয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ক্রমশ বাড়তে থাকা তেলের রাজস্বের ওপরে অধিকার রাষ্ট্রের হাতে কুক্ষিগত থাকার ফলে জনগণের

মধ্যে যাতে ক্ষোভ না জন্মায় তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের মানের উন্নতি করা। অলিখিত উদ্দেশ্য ছিল যাতে জনগণের চাপে পড়ে কোনও রাজতন্ত্র এত বেশী সংস্কার করতে শুরু না করে যে বাকি রাষ্ট্রগুলিও সেই একই পথে চলতে বাধ্য হয়। এছাড়াও OCC শিল্প বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিগত উন্নতি, খননশিল্প, কৃষি, জল এবং পশু সম্পদের বিকাশের জন্য কাজ করতে দায়বদ্ধ যাতে তেল বাদে অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলিতে আধুনিকীকরণ সম্ভব হয়।

GCC একটি প্রধান লক্ষ্য হল্য উপসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনীতিগুলির মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা। এই উদ্দেশ্যে প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া হয় ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে যখন সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কৃষি ও শিল্পদ্রব্য, প্রাকৃতিক এবং পশুসম্পদ নিয়ে বাণিজ্যের ওপর থেকে সবরকমের শুল্ক উঠিয়ে দেওয়া হয়। এর আগে GCC দেশগুলির মোট রপ্তানীর ২% এবং আমদানীর ৭% পরস্পরের থেকে আসত। তার পরের বিশ বছরে পারস্পরিক বাণিজ্য দশগুণ বেড়েছে এবং তার মূল্য ২০০৩ সালে ছিল ২০ মিলিয়ন ডলার। ১৯৯৮ সালে GCC একটি শুল্ক সংঘের কথা ভাবতে শুরু করে, যার প্রথম ধাপ ২০০৩ সালেই নেওয়া হয়ে যায়।

GCC চালু হতে দেরী হলেও দেশগুলির মধ্যে অখণ্ড বাজার ২০০৮-এর জানুয়ারী মাসেই কার্যকর হয়ে যায়, যাতে পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। ২০০৯-এর বিশ্ব আর্থিক সংকটের ফলে পুরোদস্তুর অখণ্ড বাজারে পরিণত করার পরিকল্পনা একটু শ্লথ হয়ে যাওয়ায় পরিকল্পনা-মাফিক ২০১৫-র মধ্যে তা সম্পন্ন করা যায়নি। কিন্তু ২০১৫-র জানুয়ারিতেই সদস্য দেশের নাগরিকদের একে অপরের দেশের সরকারী এবং বেসরকারী চাকরী করার অধিকার দেওয়া হয়ে যায়। এছাড়া সামাজিক বীমা প্রকল্প, অবসর ভাতা, স্থাবর সম্পত্তি কেনার অধিকার, পুঁজি বিনিয়োগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি পরিষেবা পাওয়ার অধিকার - এই সব ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রগুলির নাগরিকদের মধ্যে পূর্ণ সমতা স্বীকৃত হয়। বর্তমানে GCC-রাষ্ট্রগুলির দেওয়ানি আইন প্রণয়ন, কর ব্যবস্থা এবং হিসাব-নিকাশে সামঞ্জস্য আনার প্রক্রিয়া চলছে। যৌথ অর্থনৈতিক উদ্যোগ নেওয়াও শুরু হয়ে গেছে। এমনকি রাষ্ট্রগুলি একে অপরের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সংযুক্তিকরণ নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করে দিয়েছে। জলসম্পদ ভাগ করে নেওয়ার প্রকল্প ২০২০ সালের মধ্যে পুরোদস্তুর কার্যকর করার প্রস্তাবও রয়েছে। এছাড়াও সমগ্র আরব উপদ্বীপে একটি অখণ্ড রেল ব্যবস্থা পত্তনের কাজও শুরু হয়েছে যা ২০১৮ সালের মধ্যে ৪০,০০০ কিলোমিটার রেল লাইন পাতার পরিকল্পনা রয়েছে।

ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকা সম্পর্ক সত্ত্বেও কিছু সমস্যা থেকেই গেছে GCC-তে, বিশেষত কাতার এবং সংযুক্ত আরব আমীরশাহীর নিজস্ব কিছু কর্মসূচীর জন্য। খলিজি নামক অখণ্ড মুদ্রার প্রচলনের কথা ছিল বেশ কিছু বছর আগে, যা জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে দেখলে ইউরোপ পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম ভূজাতিক মুদ্রাব্যবস্থা হত। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রিয়াধে স্থিত হবে এই ঘোষণার অব্যবহিত পরেই ২০০৯ সালের মে মাসে সংযুক্ত আরব আমীরশাহী যৌথ মুদ্রা ব্যবস্থার প্রকল্প থেকে সরে যায়। ২০১৪ সালে বাহরেন, কাতার, কুয়েত এবং সৌদি আরব অবশ্য এই অভিন্ন মুদ্রার দিকে আরও এগিয়ে গিয়েছে।

অন্যদিকে পশ্চিম এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কাতারের মুসলিম ব্রাদারহুডকে সমর্থন, প্যালেস্টাইনে হামাসকে এবং লিবিয়ায় উগ্রপন্থীদের সমর্থন প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে, বিশেষত সৌদি আরবকে বিস্তর চটিয়ে দিয়েছে। ২০১৪-র মার্চ মাসের পরে আবু ধাবি, রিয়াধ, মানামা তাঁদের রাষ্ট্রদূত ফিরিয়ে নিয়েছিল দোহা থেকে। স্পষ্টতই আবু ধাবি, রিয়াধ এবং মানামার GCC-র মধ্যেই একটা রাজনৈতিক ব্লক তৈরি করে দোহার বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান নিচ্ছিল, এবং ও সংঘাতে মাস্কাট এবং কুয়েত নিরপেক্ষ থাকাই শ্রেয় মনে করছিল। ইয়েমেন GCC-র সদস্য রাষ্ট্রগুলি (সঙ্গে জর্ডান-কে নিয়ে) ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যে সামরিক অভিযান চালাচ্ছে তাতে বোঝা যাচ্ছে যে GCC এখনও একজোট হয়ে কাজ করতে পারে। কিন্তু রিয়াধ এবং আবু ধাবি সিরিয়ায় মুসলিম ব্রাদারহুডের বিরুদ্ধে, যা দীর্ঘদিন ধরে কাতারের সমর্থন পেয়ে আসছে। যদি সদস্য রাষ্ট্রগুলি তাঁদের নিজস্ব দীর্ঘমেয়াদী ভূ-রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খায় সামঞ্জস্য আনতে ব্যর্থ হয় তাহলে GCC-র অস্তিত্ব বিপন্নও হতে পারে।

৪.৭ আরব কো-অপারেশন কাউন্সিল (ACC)

আরব কোঅপারেশন কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৮৯-র ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তর ইয়েমেন, ইরাক, জর্ডান এবং মিশরের যৌথ উদ্যোগ। ACC তৈরি হয়েছিল কিছুটা GCC থেকে বাদ পড়ার জবাব হিসাবে, এবং কিছুটা GCC দেশগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় সফল হবার উদ্দেশ্য নিয়ে নিজেদের মধ্যে নিবিড় অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য।

এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিল কায়রো, কারণ ইজরায়েলের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের পর থেকেই রিয়াধ মিশরকে আরব রাজনীতিতে কোণঠাসা করে রেখেছিল। তাই ACC তাঁর সদস্যপদ "যে কোন আরব রাষ্ট্রের জন্য" খোলা রেখেছিল, যাতে GCC-র সদস্যরাও চাইলে যোগ দিতে পারে।

১৯৯০ সালে ইরাকের কুয়েত আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই ACC কার্যত উঠে যায়। লোকে মনে করে এর কারণ চার সদস্যের মধ্যে ভূ-রাজনৈতিক বিষয়ে কোনও সামঞ্জস্যই ছিলনা, কারণ দেশ চারটি আরব দুনিয়ার চার প্রান্তে অবস্থিত, এবং আরবী ভাষা এবং সংস্কৃতি ছাড়া তাদের মধ্যে কোনও মিলই বিশেষ ছিলনা। এছাড়া বাগদাদ এবং কায়রোর মধ্যে সমস্যা লেগেই থাকত। তাই মিশর কুয়েত আক্রমণের বিরোধিতা করে রিয়াধের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী পাঠাবার পরে ACC টিকতে পারত এমন মনে করার কোনও কারণ ছিলনা।

৪.৮ নমুনা প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

১. একথা কতদূর সত্য যে, PLO-হল প্যালস্তিনিয়দের প্রতিনিধিত্বের শ্রেষ্ঠ মঞ্চ। আলোচনা করুন।

২. বর্তমান বিশ্বে মুখ্য আরব শক্তি হিসাবে মিশরের স্থানে সৌদি আরব স্থান করে নিয়েছে, এই মতের সাথে কি আপনি সহমত পোষণ করেন? আপনার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন।

৩. প্রয়োগকারী গঠনতন্ত্রের দুর্বলতার আলোকে পশ্চিম এশিয়ার রাজনীতিতে OIC এবং আরব লীগ কতখানি প্রাসঙ্গিক তা আলোচনা করুন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী

১. আরব লীগের বিকাশ আলোচনা করুন।

২. পারস্য উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্রসমূহের সংহতিতে GCC কিভাবে কাজ করছে তা আলোচনা করুন।

৩. প্যালেস্তানীয় রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক থাকার জন্যই কি অসলো শান্তি প্রক্রিয়া শুরু করে PLO? আপনার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. আরব সহযোগিতা পর্ষদ কেন গঠিত হয়েছিল? কেন তা ব্যর্থ হয়?

২. সংগঠন হিসাবে আরব লীগের কি আর প্রাসঙ্গিকতা আছে?

৩. OIC-কে কি আঞ্চলিক সংগঠন হিসাবে বিবেচনা করা যায়?

৪.৯ গ্রন্থপঞ্জী

1. Reinhard Schulze, *A Modern History of the Islamic World,* (London, I.B.Tauris, 2000)
2. Adeed Dawisha, *Arab Nationalism in the Twentieth Century: from Triumph to Despair,* (Princeton: Princeton University Press, 2003)
3. C.E.Toffolo, Peggy Kahn, S.H. Couch, *the Arab League: Global Organisations,* (London: Chelsea House, 2008)
4. Paul Rivlin, *Arab Economies in the twenty-first century,* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).

পর্যায় - ২

মধ্য এশিয়া

একক ১ মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহ : বৈশিষ্ট্য, সমস্যা ও সম্ভাবনা

একক ২ মধ্য এশিয়ার নিরাপত্তা ও ভূ-রণনীতিগত বিষয়

একক ৩ অর্থনৈতিক অবস্থান্তরের সমস্যাসমূহ

একক ৪ মধ্য এশিয়ায় ইসলাম ও গণতন্ত্র

পর্যায় - ২ : মধ্য এশিয়া

একক—১ ❑ মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহ : বৈশিষ্ট্য, সমস্যা ও সম্ভাবনা

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ পরিচিতি

১.৩ মধ্য এশিয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ

১.৪ অঞ্চলের সমস্যাসমূহ

১.৫ সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ

১.৬ উপসংহার

১.৭ সারসংক্ষেপ

১.৮ অনুশীলনী

১.৯ তথ্যসূত্র

১.১ উদ্দেশ্য

এশিয়া মহাদেশের কেন্দ্রীয় অঞ্চল মধ্য এশিয়া নামে পরিচিতি পেয়েছে। মধ্য এশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থানকে এভাবে দেখা হয়—পূর্বে মঙ্গোলিয়া ও চীন; দক্ষিণে ভারত, ভুটান, নেপাল ও আফগানিস্তান; পশ্চিমে ইরান ও ক্যাস্পিয়ান সাগর; এবং উত্তরে উরাল পর্বতশ্রেণী ও রাশিয়া। মধ্য এশিয়া প্রায় দুটি সম অংশে বিভক্ত। যথা—পূর্ব মধ্য এশিয়া (তিব্বত ও ঝিনজিয়ান) ও পশ্চিম মধ্য এশিয়া (কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তান)। তিব্বত ও ঝিনজিয়ান গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের দখলে যায়। পশ্চিম মধ্য এশিয়ার পাঁচটি রাষ্ট্র সার্বভৌম রাষ্ট্রের পরিচিতি পেলেও সুদীর্ঘ সময় ধরে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে এই পাঁচটি রাষ্ট্র অপ্রত্যাশিতভাবে নতুন করে নিজেদের স্বাধীনতা পায়। বর্তমানে এরাই মধ্য এশিয়ার পাঁচটি প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। রাষ্ট্রগুলির বিশদ ধারণা অনুধাবনে উদ্দেশ্যগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল—

(ক) মধ্য এশিয়ার পাঁচটি রাষ্ট্রের পরিচিতি।

(খ) রাষ্ট্রগুলির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অনুধাবন।

(গ) রাষ্ট্রগুলির সম্মুখে তৈরী চ্যালেঞ্জ ও সমস্যাসমূহের বিশ্লেষণ।

(ঘ) রাষ্ট্রগুলির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পর্যালোচনা।

১.২ পরিচিতি

মধ্য এশিয়ার পাঁচটি দেশ প্রায় ৪ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার ভূখণ্ডে বিদ্যমান। এই অঞ্চলের জনসংখ্যা প্রত্যেক বর্গ কি.মি. ১৫ জন গড়ে জনঘনত্ব সহকারে ৫৯ মিলিয়নের অধিক। তবে ১৯৯০ এর দশকের মাঝামাঝি উজবেকিস্তানে সর্বাধিক জনসংখ্যা (২৩ মিলিয়ন অধিবাসী) দেখা যায়। কাজাখস্তানে ১৬.৫ মিলিয়ন এবং তাজিকিস্তান, কিরগিজস্তান, ও তুর্কমেনিস্তানে ১০ মিলিয়নের কম জনসংখ্যা দেখা যায়। এই অঞ্চলের মোট দেশজ উৎপাদনে (GDP) কাজাখস্তান প্রথম, উজবেকিস্তান দ্বিতীয়। ১৯৯৫ সালে অপর তিনটি রাষ্ট্রের মোট জাতীয় উৎপাদন ৫ বিলিয়ন ডলারের কম হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে কাজাখস্তানের মোট দেশজ উৎপাদন ১৬.৭ বিলিয়ন থেকে ২০ বিলিয়নের অধিক ডলারে বর্ধিত হয়েছে। পাশপাশি উজবেকিস্তানের মোট দেশজ উৎপাদন ১০ থেকে ১৩ বিলিয়ন ডলারে বৃদ্ধি হয়েছে। সোভিয়েত শাসনের অবসানের পর এই অঞ্চলের জনগণ কাজাখ, উজবে, কিরজিজ, তাজিক ও তুর্কমেন হিসাবে পরিচিত পেয়েছে।

মধ্য এশিয়ার পাঁচটি রাষ্ট্র নতুনভাবে স্বাধীনতা পেয়ে জাতি গঠনের ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও পরিবেশগত বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। যদিও সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য রাষ্ট্রগুলি নয়া দৃষ্টিভঙ্গী, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি স্থাপন করেছে। তবুও গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় প্রশ্নের উত্তর সামনে আসেনি। যেমন, (ক) রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার অর্থ ও গুরুত্ব কি ছিল? (খ) এদের সাংস্কৃতিক চরিত্র কি ছিল? (গ) এদের অধিবাসী কারা হওয়া উচিত? (ঘ) কারা তাদের সহযোগী ও প্রতিযোগী ছিল? (ঙ) কোন ধরনের যুক্তরাষ্ট্র, সমবায় কিংবা ইউনিয়নে যোগদানের মাধ্যমে এদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা কিংবা নিরাপদ হবে? (চ) এদের চতুষ্পার্শ্বস্থ রাষ্ট্রগুলির অভিপ্রায় ও দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল? (ছ) এদের সামনে তাৎক্ষণিক আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ভীতিগুলি কি ছিল?

১.৩ মধ্য এশিয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ

১৯৯২ সালের পূর্বে জাতি রাষ্ট্র হিসাবে মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির নিজস্ব স্বতন্ত্র কোন ইতিহাস নেই। সোভিয়েতের শাসনাধীনে এদের অর্থনৈতিক নীতি ও উন্নয়ন কৌশল মস্কো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত

হয়েছে। এই সময়ে রাষ্ট্রগুলিতে কৃষিসহ সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে আশানুরূপ উন্নয়নও হয়েছে। তবে এই উন্নয়নের সুফল সোভিয়েত নাগরিকরা পেয়েছে। এই অঞ্চলের স্থানীয় বাসিন্দারা উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা পায়নি। তাই তারা নিজেদের সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। তাছাড়া, এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা বঞ্চিত হয়েছে। সোভিয়েত পরিচালিত বাণিজ্য নীতিতে এই অঞ্চলের উন্নয়ন হয়নি। বিশ্ব ব্যাংকের সমীক্ষা অনুসারে, ১৯৯৫ সালের নিরিখে এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১১.৭ বিলিয়ন ডলার। এবং আমদানির পরিমাণ ছিল ৯.৪ বিলিয়ন ডলার। পাঁচটি দেশের রপ্তানি ও আমদানির চিত্র বিলিয়ন ডলারে এভাবে দেখা যায়। যথাক্রমে, কাজাখস্তান (৫.০ ও ৩.৬), উজবেকিস্তান (৩.৭ ও ২.৯), কিরজিজস্তান (০.৪ ও ০.৫), তুর্কমেনিস্তান (১.৯ ও ১.৪) ও তাজিকিস্তান (০.৭ ও ০.৮)।

মস্কো এই অঞ্চলের জনগণের বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম থাকা সত্ত্বেও সমরূপ পরিচিতি দিয়েছে। পরিণতিতে, এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীগত, আঞ্চলিক ও উপজাতিগত বিরোধ প্রকাশ্যে এসেছে। তাছাড়া, ভূখণ্ডগত বিবাদ দেখা যায় এই অঞ্চলে।

অর্থনৈতিক দিক থেকে মস্কো এই অঞ্চলের প্রতি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূখণ্ডগত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দ্বারা মস্কো সমগ্র ভূখণ্ডকে আঠারটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে ভাগ করে এবং চারটি মধ্য এশিয় প্রজাতন্ত্রীকে (উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও কিরজিজস্তান) একটি অর্থনৈতিক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মস্কো Central Asian Bureau of the Soviet Communist Party, Central Asian Sovnarkhoz (আঞ্চলিক অর্থনৈতিক পরিষদ), State Committee for Cotton Cultivation, Ministry of Construction in Central Asia প্রভৃতি তৈরী করে। এদের মূল উদ্দেশ্য ছিল সুসংহত মধ্য এশিয় অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু ১৯৮০ এর দশকের শেষে কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে এই অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি বেরিয়ে আসতে শুরু করে। যদিও ১৯৯১ সালে সোভিয়েত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাওয়ার প্রাক-মুহূর্ত পর্যন্ত মধ্য এশিয়ার ওপর যার অল্প প্রভাব দেখা যায়। ১৯৯২-৯৩ সালে মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অভিন্ন মুদ্রা চালুর মাধ্যমে অর্থনৈতিক সংযোগ তৈরী করে পুরানো স্মৃতিকে ধারণ করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৯৩ সালে শেষে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা তীব্র হওয়ায় এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

১৯৯০ এর দশকে মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিতে জাতি গঠন গুরুত্ব পেলেও ধীর গতিতে হয়েছে। কারণ রাষ্ট্রগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। উচ্চবিত্তদের বিভিন্ন গোষ্ঠী রাশিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রগুলির সুদৃঢ় অর্থনৈতিক বন্ধন ছিন্ন হলে অর্থনীতিতে ক্ষমতা লাভের প্রত্যাশায় তারা প্রতিযোগিতায়

আসে। এইসব গোষ্ঠী শাসন ক্ষমতায় এসে নিজেদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তারা এক দলীয় কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থাকে তাদের ব্যক্তিগত কর্তৃত্ববাদে রূপান্তরিত করেছে। এবং নিজেদের স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থা ও রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। তারা Commonwealth of Independent States (CIS)-এর ঐচ্ছিক সদস্য হওয়ার মাধ্যমে আবশ্যিক হিসেবে নতুন করে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে। তারা অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংগঠনে (Economic Cooperation Organization) যোগদানের মাধ্যমে ইসলামীয় প্রতিবেশী তুরস্ক, ইরান ও পাকিস্তানের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কের বিস্তার করেছে। তারা ইউরোপীয় সম্প্রদায় (European Community), আমেরিকার সঙ্গে এবং এমনকি জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার ন্যায় অর্থনৈতিক শক্তিধর দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে। ইজরায়েলের সঙ্গে পারস্পরিক সমঝোতাপূর্ণ সম্পর্কের বিকাশ ঘটাতে চেয়েছে। চীন ও ভারতের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক চেয়েছে। তুর্কমেনিস্তান ছাড়া অন্যরা সাংহাই সহযোগিতা সংগঠন (Shanghai Cooperation Organisation)-এর সদস্য হয়েছে। এবং উজবেকিস্তান ছাড়া অন্যরা আঞ্চলিক নিরাপদ পরিবেশের উন্নয়নে CIS Collective Security Treaty Organisation (CSTO)-এর সদস্য হয়েছে। তুর্কমেনিস্তান ছাড়া অন্যরা Central Asian Cooperation Organisation (CACO)-এর সদস্য হয়েছে। তাজিকিস্তানে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের অবসানের পর ইসলামীয় বিরোধী গোষ্ঠীদের তারা নিজেদের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্বীকৃতি দিয়েছে। তারা সীমানাতিক্রান্ত সন্ত্রাসবাদ, ড্রাগ ও সশস্ত্র বিদ্রোহীদের ভীতিকে প্রতিরোধ করার জন্য রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েছে।

মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি নিজেদের রসদের ওপর দাঁড়িয়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক নীতি নিয়েছে। সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে সদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও সোভিয়েতের কেন্দ্রীভূত পরিকল্পিত অর্থনৈতিক মডেল থেকে মুক্ত হবার পর নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনে কিরজিজস্তান অতি দ্রুত উদারিকরণ নীতি নিয়েছে, আবার তুর্কমেনিস্তান পূর্বতন ব্যবস্থার নূন্যতম সংস্কার করেছে। বিশ শতকের শেষে দেখা যায়, মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিতে ব্যাপকভাবে অসমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

বাস্তব বিচারে, মধ্য এশিয় প্রজাতন্ত্রীগুলি বাৎসরিক মোট দেশজ উৎপাদন (G.D.P.) ও মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপাদন (G.N.P.)-উভয় দিক থেকে ক্রমহ্রাসমানের সাক্ষী হয়েছে। কাজাখস্তানে ০.৫ শতাংশ হারে গড় জনঘনত্ব হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক বছরে মাথা পিছু মোট জাতীয় উৎপাদন ৭.৪ শতাংশ হারে এবং মোট দেশজ উৎপাদন (G.D.P.) ১৯৯০-৯৮ সালে ৬.৯ শতাংশ হারে হ্রাস পেয়েছে। উজবেকিস্তানের অর্থনীতি সোভিয়েতের ভেঙ্গে যাওয়ার সময় খুব খারাপ ছিল না। কারণ ঐ দেশ শক্তি

সম্পদ ও কৃষিজ উৎপাদনে স্বনির্ভরশীল ছিল। ১৯৯০ এর দশকে মোট দেশজ উৎপাদনে ১০০ সূচকের মধ্যে ১৯৯৩ ও ১৯৯৭ সালে উজবেকিস্তানে ছিল প্রায় ৮৩, যেখানে কাজাখস্তানে ৬২, কিরজিজস্তানে ৬১, তাজিকিস্তানে ও তুর্কমেনিস্তানে ৪২। ১৯৯০-৯৭ সালে তুর্কমেনিস্তানে প্রত্যেক বছর মোট জাতীয় উৎপাদন ১৪.৬ শতাংশ হারে হ্রাস পেয়েছে। যেখানে ঐ দেশে মোট দেশজ উৎপাদন প্রত্যেক বছর ৯.৬ শতাংশ হারে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু জনসংখ্যা প্রত্যেক বছর ৩.৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ঐ সময়ে তাজিকিস্তানে মাথা পিছু মোট জাতীয় উৎপাদন বাৎসরিক ১৬.১ শতাংশ হারে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু জনসংখ্যা বাৎসরিক ১.৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট দেশজ উৎপাদন বাৎসরিক ১৬.৪ শতাংশ হারে হ্রাস পেয়েছে। ঐ সময়ে কিরগিজস্তানে মোট জাতীয় উৎপাদন (G.N.P.) ও মোট দেশজ উৎপাদন (G.D.P.) বাৎসরিক যথাক্রমে ৯.৭ শতাংশ ও ৭.৩ শতাংশ হারে হ্রাস পেয়েছে। যখন জনসংখ্যা বাৎসরিক ০.৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বস্তুতঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর মধ্য এশিয়ার সর্বত্র মোট দেশজ উৎপাদনে অবক্ষয় দেখা গেছে। কেবল উজবেকিস্তান ও তুর্কিমেনিস্তান ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি কিংবা শেষে নিজেদের প্রাক-সোভিয়েত উত্তর অবস্থার পুনরুদ্ধারে সমর্থ হয়েছে।

রাজনৈতিকভাবে, সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেঙ্গে যাওয়া পর্যন্ত জাতি রাষ্ট্র হিসাবে মধ্য এশিয়ার পাঁচটি রাষ্ট্রের নিজস্ব কোন ইতিহাস নেই। মস্কো থেকে দেশগুলির রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছে। কোন দেশই তার বিরুদ্ধাচরণ করেনি। পরিণাম স্বরূপ, অপ্রত্যাশিতভাবে নতুন করে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পাঁচটি দেশই জাতি গঠনের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। আবার, প্রত্যেকটি দেশের সকল ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। রাষ্ট্রপতি ক্ষমতার অনুশীলনে প্রায়শঃই স্বৈরাচারী হয়েছেন। এবং একইসাথে সংবিধান অমান্য করেছেন। কিংবা সংবিধানকে নিজের মত তৈরী করেছেন। এই পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা, সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে যথাযথভাবে স্বীকৃতি পায়নি।

কতিপয় তাত্ত্বিক মধ্য এশিয়ায় উন্মোচিত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার এই ধরনের ব্যাপক নেতিবাচক মূল্যায়নের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। কিন্তু একথা সত্য যে, Perestroika (১৯৮৯-৯১)-র পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক বহুত্ববাদের নিরিখে মধ্যএশিয়ার প্রজাতন্ত্রীগুলিতে অল্প অগ্রগতি হয়েছে। এবং ঘটনাক্রমে সেই প্রগতি ব্যক্তিগত কর্তৃত্ববাদী শাসনের অনুকূলে গেছে। তবে এও বলা যায় যে, বর্তমানে মধ্য এশিয় প্রজাতন্ত্রীদের নীতি কমিউনিষ্ট কিংবা বিভিন্ন ধরনের মৌলবাদীদের সর্বাত্মকতাবাদের চরমতাকে, সমর্থন করে না। পাশাপাশি মত প্রকাশ, সভা করা সহ মানুষের মৌলিক অধিকার সুরক্ষার মাধ্যমে অবাধ ও স্বচ্ছ প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন ও বহু দলীয় ব্যবস্থার ভিত্তিতে নূন্যতম গণতান্ত্রিক পরিবেশ

স্থাপনের প্রয়াস এই অঞ্চলে দেখা যায়। যা প্রজাতন্ত্রী সমূহের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্রীকরণের অগ্রগতিকে সহায়তা করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, উজবেকিস্তানে রাষ্ট্রপতি কারিমভ (Karimov) ক্ষমতায় এসে কর্তৃত্ববাদী শাসন প্রতিষ্ঠা করলেও বিরোধী আন্দোলন Birlik-এর কর্মসূচীকে গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন—Uzbek-কে রাষ্ট্রীয় ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছেন, তুলা চাষের সম্প্রসারণ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবেশের সুরক্ষা দিয়েছেন। এবং নির্ধারিত সময়ান্তর সংসদীয় নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছেন। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অনেকগুলি রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি দেখা যায়। যথা, People's Democratic Party (PDP), Erik, Wattan Tarrakkiyati, Adalat Social Democratic Party, Birlik, The Fidokorlar National Democratic Party, Millie Tiklinish Democratic Party প্রভৃতি। যদিও বিরোধী দলের কর্মসূচীকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতা মধ্য এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিতে তেমন দৃশ্যমান হয় না।

মধ্য এশিয়ার অর্থনীতিতে কতিপয় রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যাদির ওপর গভীরভাবে নির্ভরশীলতা দেখা যায়। যেমন, তাজিকিস্তানের রপ্তানি দ্রব্যাদির প্রায় অর্দ্ধেকের বেশী হল অ্যালুমিনিয়াম। কিরজিজস্তানের রপ্তানি পণ্যের অর্দ্ধেক হল সোনা। কাজাখস্তান ও তুর্কমেনিস্তানের রপ্তানি পণ্যে তেল ও গ্যাস-এর ব্যাপক প্রাধান্য বজায় রয়েছে। তবে এও উল্লেখ্য, কিরগিজস্তান ও তাজিকিস্তানের মুখ্য রপ্তানি পণ্যসমূহের তালিকা তৈরী করা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিস্থিতিতে মধ্য এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলের ব্যাপক অর্থনৈতিক শূন্যতায় তাজিকিস্তান, কিরজিজস্তান ও উজবেকিস্তানের শ্রমজীবীরা দেশত্যাগ করে অন্যত্র যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০১০ সালে রাষ্ট্রসংঘের World Population Prospects-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মধ্য এশিয়ার জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ ছিল ১৩-১৯ বছর বয়সী কিশেরা বা কিশোরী, কিন্তু ব্যঙ্গোক্তি হল যে মধ্য এশিয়ার দেশগুলি এই সকল তরুণ-তরুণীদের জন্য অধিক কর্মসংস্থান তৈরীতে ব্যর্থ হয়েছে। তাছাড়া, এই অঞ্চলে সীমাতিক্রান্ত বরাবর নিয়ন্ত্রণ রেখার পরীক্ষায় জটিলতা, আঁটসাঁট ভিসা (Visa)-র আবশ্যিকতা প্রভৃতি কারণে বিভিন্নভাবে জনগণের সামনে সমস্যা এসেছে। তাই এই অঞ্চলের শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ পরিবেশ তৈরীর জন্য আবশ্যিকতা হল সীমান্তরেখা বরাবর আঁটসাঁট নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাকে শিথিল করে পারস্পরিক মত বিনিময়কে সহজ করা। যে পরিবেশে তরুণ প্রজন্ম গড়ে উঠবে।

১.৪ অঞ্চলের সমস্যাসমূহ

পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের অপ্রত্যাশিত বিলুপ্তি বিশ শতকের অধিক বিস্ময়কর ভূ-রাজনৈতিক ঘটনাগুলির অন্যতম ছিল। এই ঘটনার সঙ্গে কেবল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালীন অটোম্যান (Ottoman) ও হাব্‌স্‌বার্গ (Habsburg)-এর বিলুপ্তির তুলনা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তিতে মধ্য এশিয়ার

ভূ-রাজনৈতিক মানচিত্রে পরিবর্তন এসেছে। নতুনভাবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারকের উন্মেষ দেখা যায়। যথা—

(ক) রুশ যুক্তরাষ্ট্র ও তার নয়া নেতৃবর্গের রাজনৈতিক পছন্দের ঘটনাগুলির বিকাশ হয়েছে।

(খ) আমেরিকা প্রশাসনের, জর্জ বুশ থেকে বারাক ওবামা পর্যন্ত সকল রাষ্ট্রপ্রধানের কৌশলগতনীতি।

(গ) চীন, ইরান ও তুরস্ক ও ভারতের ভূমিকা।

(ঘ) আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের দৃষ্টিভঙ্গি।

(ঙ) মধ্য এশিয়ার প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়নের দৃষ্টিভঙ্গি।

(চ) জাপান ও কোরিয়ার ন্যায় রাষ্ট্রগুলির ভূমিকা।

মধ্য এশিয়ার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এদের প্রভাব দেখা যায়। এই অঞ্চলের ভূ-কৌশলগত অবস্থান ও উন্নত প্রাকৃতিক সম্পদ ইরান, তুরস্ক, সৌদি আরব, পাকিস্তান, ভারত, জাপান, কোরিয়া ও অন্যান্যদের কাছে লোভনীয় হয়েছে। আবার, পশ্চিমী, বিশেষভাবে আমেরিকা প্রজাতন্ত্রীগুলির ওপর ক্রমবিকাশমান প্রভাব স্থাপনে সক্রিয় হয়েছে। মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির ভৌগোলিক নৈকট্য, ঐতিহাসিক সংযোগ ও রুশ বিক্ষুব্ধদের উপস্থিতিতে মস্কো নিজের স্বার্থে অঞ্চলটিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছে।

মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির কর্ম-কাণ্ডের সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি তিনটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ—জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির প্রেক্ষিত থেকে আলোচনা হতে পারে। এই অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির সামনে অধিক গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ জাতীয় স্তরে দেখা যায়। আড়াই দশক হল প্রজাতন্ত্রীগুলি নতুনভাবে স্বাধীনতা পেয়েছে। কিন্তু তাদের রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া বর্তমানেও সম্পূর্ণ হয়নি। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের সুবিস্তৃত ছাতার ন্যায় সুরক্ষা ও তার বৈধতা বর্তমানে অদৃশ্য হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী ও মৌলবাদীদের বিরোধ সাম্প্রতিক সময়ে এই অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হিসেবে বিকাশ লাভ করেছে। এই অঞ্চলের মৌলবাদী সংগঠনগুলি হল Islamic Movement of Uzbekistan (IMU), the Islamic Renaissance Party, Hezbollah (The Party of Allah) প্রভৃতি। ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি বিরোধী ইসলাম তাজিকিস্তানে ক্ষমতায় এসেছে। উজবেকিস্তানে রাষ্ট্রশক্তির ইসলাম বিরোধী আচরণের কারণে রাষ্ট্র ও ইসলামের মধ্যে সংঘাত দেখা যায়। উজবেকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান Karimov ১৯৯৮ সালের ৫-৭ই মে মস্কো সফরকালে উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান ও রাশিয়ার সমন্বয়ে ইসলামিক বিরোধী Tripartite Union গড়ে তুলেছেন। Karimov ইসলামের চরমতাবাদীদের অবস্থানের

বিরোধীতা করে কাজাখস্তান, কিরজিজস্তান ও তুর্কমেনিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে টেলিফোনে আলোচনা করেছে। পরিণামস্বরূপ, ইসলামের মৌলবাদীরা Karimov-এর বিরুদ্ধে Jihad সংগঠিত করেছে।

আঞ্চলিক স্তরে, মধ্য এশিয়ার নেতৃবর্গের মধ্যে প্রত্যয়ের অভাবে দেশগুলির মধ্যে অল্প সহযোগিতা দেখা যায়। রাষ্ট্রগুলি নিজেদের সমস্যার সমাধানে যৌথভাবে উদ্যোগী হলেও এই অঞ্চলের আঞ্চলিক অসংগতির অধিক সুস্পষ্টতার কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে আন্তঃ গোষ্ঠীগত সম্পর্কের বিষয়টি সামনে এসেছে। রাষ্ট্রগুলিতে মুসলিম ছাড়া অন্যান্য অনেক উপজাতির বসবাস দেখা যায়। যেমন, কাজাখস্তানে কাজাখ (Kazakh)-রা তিনটি উপজাতি কিংবা Juze-র সমন্বয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। তিনটি উপজাতি ছিল Ulu, Orta ও Kishi। Ulu-র দশটি উপজাতি ছিল। Orta চারটি উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। এবং সেই উপজাতিগুলি ৪৩টি উপজাতির সমন্বয়ে তৈরী হয়েছিল। Kishi দুটি মূল উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। তাদের আবার ২৫টির বেশী উপজাতি ছিল।

সমরূপভাবে, তুর্কমেনিস্তানে স্থানীয় সর্দারেরপ্রতি নৃকুল-উপজাতিদের (ethno-tribal) সুদৃঢ় আনুগত্য দেখা যায়। তুর্কমেন সাতটি বৃহৎ উপজাতিতে মূলতঃ বিভক্ত। যথা—Take, Ersari, Yomot, Saryk, Chovdur, Geklen ও Salyr। তাদেরকে তাদের বসবাসগত এলাকার নিরিখে পরিচিতি দেওয়া হয়।

কিরগিজদের ক্ষেত্রে উপজাতি কাঠামো ডান ও বাম শাখায় বিভক্ত ছিল। ডান শাখায় ২১টি উপজাতি রয়েছে এবং বাম শাখায় আটটি রয়েছে। বৃহৎ কিরজিজ উপজাতি যেমন—Sarybagyshese, Bagu ও Salto—সবাই ডান শাখায় রয়েছে। তাছাড়া, সেখানকার বৃহৎ উপজাতি গোষ্ঠীকে Ichkilik বলা হয়, দশটি উপজাতি এবং অন্যান্য সাতটি অ-কিরজিজদের নিয়ে গোষ্ঠী গঠিত হয়েছে।

বর্তমানে মধ্য এশিয়ার পরিস্থিতি জটিল হয়েছে কারণ, উপরিউক্ত গোষ্ঠীগুলি একে অন্যের ভূখণ্ডে বসবাস করছে। এই গোষ্ঠীগুলি ছাড়া রাশিয়ানরাও এই অঞ্চলে বসবাস করেছে। তাই এদের মধ্যে আন্তঃগোষ্ঠী বিরোধ সর্বদাই মাথা চাড়া দিয়েছে। মধ্য এশিয়ায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ সব অঞ্চলে সমভাবে না থাকায় বিরোধ অধিক পরিমাণে দৃশ্যমান হয়েছে।

সোভিয়েত শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার পর এই অঞ্চলে প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য একই সঙ্গে অনেকগুলি বিদেশী শক্তি হাজির হয়েছে। এরা হল আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ভারত প্রভৃতি দেশ। এদের কাছে অঞ্চলটির ভৌগোলিক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হয়। কারণ অঞ্চলটি

"পশ্চিম-পূর্ব" (West-east) এবং "উত্তর-দক্ষিণ" (North-south)-এর মধ্যে সুবিধাজনক যোগাযোগে বাহিরের দ্বার হিসাবে কাজ করে। এছাড়া, এই অঞ্চলের শক্তি সম্পদের ওপর ক্রমবর্ধমান বিশ্বব্যাপী দাবী, এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশকে একত্রীকরণের ক্ষেত্রে কৌশলগতভাবে অঞ্চলটির গুরুত্বপূর্ণতা বিশেষভাবে সামনে এসেছে। তাই অঞ্চলটি বিভিন্ন দেশের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। বিপরীত অর্থে, বিভিন্ন বিদেশী শক্তির মধ্যে প্রভাব প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা অঞ্চলটির সামনে চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়েছে।

মধ্য এশিয়ার পরিবর্তিত পরিস্থিতি নিয়ে তাত্ত্বিকদের ব্যাখ্যা বিশেষভাবে উল্লেখ দাবী রাখে এই আলোচনায়। খ্যাতনামা তাত্ত্বিক Allen Deletroz সতর্কবার্তার মাধ্যমে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে, সোভিয়েত প্রভাবের অবসানেই মধ্য এশিয়ার আঞ্চলিক ধারণায় অসংহতি এসেছে। এবং এই অঞ্চলের দুটি বৃহৎ রাষ্ট্র হিসাবে কাজাখস্তান ও উজবেকিস্তান অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য এশিয়া কর্মসূচীর পরিচালক Marlene Laruelle বিশ্বাস করেন যে, মধ্য এশিয়ার আঞ্চলিক ধারণা স্থিতিশীল নয় এবং পাঁচটি রাষ্ট্র প্রত্যেকে উন্নয়নে কেমনভাবে ভিন্ন ভিন্ন পথ নিয়েছে তার বর্ণনা দিয়েছেন। বিতর্কের বিষয় যে, কাজাখস্তান ও উজবেকিস্তানের অশুভ শক্তিগুলি এই অঞ্চলের উন্নয়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর ভূমিকা নেবে। ফলশ্রুতিতে, এই দুটি দেশ একটি চরম বিশৃঙ্খলার মুখোমুখি হবে, কিরগিজস্তান ও তাজিকিস্তানের ন্যায় অন্যান্য দেশগুলি তাতে আঘাতও পাবে এবং এই আবহ অঞ্চলের সর্বত্র এমনকি রাশিয়া ও চীনেও অনুভূত হবে। যদি এদের কেউ একজন নাগরিক ও ব্যবসায়ীদের জন্য অধিক উন্মুক্ত পরিবেশ সহযোগে আইনের অনুশাসনের ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে এগোয় তাহলে এই সব ইতিবাচক পদক্ষেপগুলি তার ক্ষুদ্র প্রতিবেশীদের বিকাশে নূন্যতম হলেও সহায়ক হবে। সেকারণে এই ভবিষ্যদ্‌বাণী হিসেবে মনে করা যায় যে, আগামী বছরগুলিতে এই অঞ্চলে বর্তমানের সমরূপ কিংবা তার কম সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংহতি দেখা যাবে। আঞ্চলিক সংহতির অভাব জনগণ ও তাদের পণ্য উৎপাদনের পরিবেশে প্রধান প্রতিবন্ধক হবে।

১.৫ সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ

আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের ক্রমবিকাশের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে মধ্য এশিয়ার ওপর, বিশেষভাবে এই অঞ্চলের অধিক দুর্বল রাষ্ট্রসমূহ, তাজিকিস্তান ও কিরজিজস্তানের ওপর। আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের জিহাদিরা মধ্য এশিয়ার দুর্গম এলাকায় সুরক্ষিত হয়ে সহজে বেড়ে উঠবে। সেখানে এই গোষ্ঠীর সদস্যরা প্রশিক্ষণ পাবে এবং সংগ্রামী মানসিকতা অর্জন করবে।

একটা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা রয়েছে যে, চীন, রাশিয়া, পশ্চিমী ও ইসলাম রাষ্ট্রগুলি মধ্য এশিয়ায় একে অন্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হতে পারে। যেমনটি Samuel Huntington প্রায় দু'দশক পূর্বে ভবিষদ্‌বাণী করেছেন। একই সময়ে Francis' Fukuyama এই অর্থে অংশতঃ যথার্থ হবেন যে, গণতন্ত্র একমাত্র মডেল তৈরী করবে, যা এই অঞ্চলকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, পরিবেশগত সম্ভাবনা এই অঞ্চলে দুঃখজনক হিসাবে দৃশ্যমান হবে। কারণ ক্রমাগত অনাবৃষ্টি প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে প্রচ্ছন্নভাবে নেতৃত্ব দেবে। আরব সাগরের ভূগর্ভে আংশিকভাবে অসমান তৈরী হওয়াতে মৃদু কম্পনে প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়েছিল।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাঁচটি প্রজাতন্ত্রীর মধ্যে কতিপয় অর্থনৈতিক ইউনিয়ন গঠিত হওয়া আবশ্যক, যা বর্তমানে সুস্পষ্টভাবে নেই। কিন্তু সংহতি এই অঞ্চলের ভবিষ্যতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রগুলির মধ্যে নিবিড় সংহতি তাদের জন্য অধিক অর্থনৈতিক সুবিধা তৈরীতে সহায়তা করবে। এবং তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নও বিকাশে সাহায্য করবে। নিম্নে উল্লেখ্য বিষয়ে এলাকার ওপর গুরুত্ব আরোপে দেশগুলি সুবিধা পাবে।

(ক) নদীগুলির জলের অসামঞ্জস্য ব্যবহার ও দূষণকে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করে দ্রুত আলোচনায় নিয়ে আসা আবশ্যক।

(খ) মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির সংহতির জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল অর্থনৈতিক জোট ও যৌথ বাজারের প্রতিষ্ঠা করা। এই অঞ্চলের পণ্য বিনিময়ের জন্য রাষ্ট্রগুলির একটি আন্তঃকাঠামো গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া উচিত।

(গ) রাষ্ট্রগুলি একটি সর্বসাধারণের কৃষিজ বাজার তৈরী থেকে অধিক সুবিধা পাবে। এই সমস্ত দেশের কৃষিজ পণ্যের আইনসম্মত বিনিময়ে ঐতিহ্যবাহী অর্থনৈতিক সম্পর্কের সুরক্ষায় কৃষিজ বাজার গুরুত্বপূর্ণ।

(ঘ) রাষ্ট্রগুলির একসাথে জ্বালানী ও শক্তি সম্পদের নিপুণ ব্যবহারের ওপর মনোযোগ দেওয়া উচিত। কারণ এই অঞ্চলের শক্তি সম্পদ ব্যাপকভাবে এলাকার বাইরে চলে যায়। এই সম্পদসমূহের নিপুণ ব্যবহারই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি হবে। খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদের যৌথ ব্যবহার ও রপ্তানীতে সম্ভাবনাগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

(ঙ) একটি সংযুক্ত পরিবহন ব্যবস্থার পত্তন এই অঞ্চলকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করবে। এই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানের সুবিধা অধিক সুফল পাওয়ার ক্ষেত্রে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগের পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের নীতি গ্রহণ করতে হবে।

(চ) মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের ওপর মনোযোগ দেওয়া উচিত। যোগাযোগ উন্নয়ন হল বিশ্ব অর্থনীতিতে এই অঞ্চলের সংহতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ শর্তসমূহের অন্যতম।

(ছ) একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বিকাশ এবং অর্থনৈতিক সমবায়ের পত্তন এই অঞ্চলের বাণিজ্য ও আর্থিক সহযোগিতা সম্প্রসারণে সাহায্য করবে।

(জ) মধ্য এশিয়ার দেশগুলির স্বার্থে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের কর্মদ্যোগের দ্রুত বিকাশে উৎসাহ দেওয়া উচিত। ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ রাজধানীগুলির অবাধ বিনিময়ের ব্যবস্থাকে সংযুক্ত করতে পারে।

প্রাথমিকভাবে, এরূপ সংহতি মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সুসম্পর্কের আবহ তৈরী করবে এবং তাদের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নে নির্ণায়ক হয়ে উঠবে। সবার সমরূপ বাজার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি অন্যান্য অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য জোটে সম অংশীদার হিসাবে যোগদান করতে পারে। এবং বিশ্বে বর্তমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ওপর নিজেদের প্রভাব স্থাপন করবে। এইভাবে এই অঞ্চল ইউরোপ ও এশিয়াতে রাজনৈতিক স্থায়িত্বের প্রহরী হিসাবে আবির্ভূত হবে।

১.৬ উপসংহার

এশিয়া মহাদেশে ক্ষমতা বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হল মধ্য এশিয়া। যেখানে মহামূল্যবান অব্যবহৃত অপর্যাপ্ত সম্পদ রয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর এই অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি অসংখ্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যা কিংবা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে নিজেদের প্রয়োজন ও সামর্থ অনুসারে বিভিন্ন কৌশল তৈরী করেছে। বিশ শতকের পর এই অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্ব-নির্ভরশীলতার ন্যায় তাৎক্ষণিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যে পৌঁছতে বিভিন্ন কৌশল নিয়েছে।

১.৭ সারসংক্ষেপ

যাইহোক, মধ্য এশিয়ার পাঁচটি প্রজতন্ত্রী রাষ্ট্র কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, কিরগিজস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও তাজিকিস্তান বিশ শতকের ৯-এর দশক পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ ছিল। রাষ্ট্রগুলি এই সময়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের পরিচিতও পেয়েছিল। কিন্তু তাদের স্বাধীনভাবে নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা ছিল না। মস্কো এদের নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। এই অর্থে সোভিয়েতের পতনের পর রাষ্ট্রগুলি প্রকৃত স্বাধীনতা পেয়েছে। তবে সোভিয়েতের অধীনতা থেকে মুক্ত হওয়ার পর রাষ্ট্রগুলি বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। আশাব্যঞ্জক যে, আমেরিকা, চীন, রাশিয়া ও ভারতের বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে অঞ্চলের সমঝোতাপূর্ণ নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতা রাষ্ট্রগুলির অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। তাই বলা যয়, মধ্য এশিয়া রাজনৈতিক স্থায়িত্ব ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্প্রসারণে সমর্থ হবে।

১.৮ অনুশীলনী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

১. সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির সমস্যা ও সম্ভাবনার ওপর প্রবন্ধ রচনা করুন।

২. মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি সমালোচনা সহযোগে আলোচনা করুন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী

১. মধ্য এশিয়ার অর্থনীতির ওপর মন্তব্য করুন।

২. মধ্য এশিয়ায় রাশিয়া ও চীনের ভূমিকা উল্লেখ করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. মধ্য এশিয়ার ৫টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

২. মধ্য এশিয়ার দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করতে পারে এমন তিনটি বিষয় উল্লেখ করুন।

১.৯ তথ্যসূত্র

Ram Rahul (1997), *Central Asia : An Outline History*, New Delhi, Concept.

K. Warikoo and Mahavir Shingh (ed.) (2004), *Central Asia : Since Independence*, Delhi, Shipra Publications.

Boris Rumer, Stanislav Zhukov (2003), *Central Asia : The Challenges of Indenendance*, Delhi, Akar Books.

William Shepherd (1923), *Historical Atlas*, New York, Henry Holt and Co.

Encyclopedia Britannica, http://www. britannica.com/EBchecked/topic/102288/ Central Asia.

Peter B. Golden (2011), *Central Asia in World History*, Oxford, Oxford Univrsity Press.

Suchandana Chattrjee (ed.) (2014), *Image of the Region in Eurasian Studies*, New Delhi, K. W. Publisheres Pvt. Ltd.

একক—২ ❑ মধ্য এশিয়ার নিরাপত্তা ও ভূ-রণনীতিগত বিষয়

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ ভূমিকা

২.৩ মধ্য এশিয়ার ভূ-রণনীতিগত বৈশিষ্ট্য

২.৪ মধ্য এশিয় অঞ্চলে বৈদেশিক শক্তিদের প্রভাব

২.৫ উপসংহার

২.৬ সংক্ষিপ্তসার

২.৭ অনুশীলনী

২.৮ তথ্যসূত্র

২.১ উদ্দেশ্য

উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথমে মধ্য এশিয়া ব্রিটেন, রাশিয়া ও চীনের মধ্যে প্রতিযোগিতার অঞ্চল ছিল। তারা একে 'Great Game' হিসাবে আখ্যা দিয়েছে। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং মধ্য এশিয় প্রজাতন্ত্রীগুলির নতুন ভাবে আবির্ভাব, মুসলিম জনসংখ্যার প্রাধান্য বৃদ্ধি, এই অঞ্চলে ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন প্রভৃতি কারণে অঞ্চলটি চীন, রাশিয়া, পশ্চিম এশিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ার কাছে স্বতন্ত্র ভূ-রাজনৈতিক স্বত্বা হিসাবে পরিচিত পেয়েছে। এবং অঞ্চলটি বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের মনোযোগ ও স্বার্থের কেন্দ্র হয়েছে। তারা তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎস হিসাবে অঞ্চলটির বিপুল সম্ভাব্যকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আবার বাণিজ্যিকভাবে উন্নত দেশগুলির কাছে অঞ্চলটি শক্তি ও জ্বালানির ভাণ্ডার হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে মধ্য এশিয় প্রজাতন্ত্রীদের রণনীতি ও নিরাপত্তা বিষয় বিশেষভাবে পর্যালোচনার দাবি রাখে। বিশদ আলোচনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির অনুধাবন আবশ্যক।

(ক) মধ্য এশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব।

(খ) এই অঞ্চলের নিরাপত্তা রূপরেখা।

(গ) বৈদেশিক শক্তিগুলির ভূমিকা।

(ঘ) রাষ্ট্রগুলির রণনীতি।

২.২ ভূমিকা

মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্রীগুলি প্রথমে রুশ সাম্রাজ্য (১৯১৭ সাল পর্যন্ত) এবং পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের (১৯২২-৯১) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়েছে। এই সময়ে রাষ্ট্রগুলি স্বাধীন হয়েও স্বাধীনতা পায়নি। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর তারা স্বাধীনভাবে জাতীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা অর্জন করেছে। কিন্তু এই অঞ্চলে যৌথনীতি নির্ধারণে তাদের ঐক্যমত দেখা যায়নি। পরিণতিতে, সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ মুক্ত এই অঞ্চলে শূন্যতা তৈরী হয়েছে। আমেরিকার ন্যায় বৃহৎ শক্তিধর দেশ এবং রাশিয়া, চীন, ইরান, তুরস্ক, পাকিস্তান ও ভারত প্রমুখ প্রতিবেশী দেশগুলি সেই শূন্যতা দখলের চেষ্টা করেছে। রাষ্ট্রগুলি এই অঞ্চলে প্রতিযোগিতামূলক কৌশল, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক নীতি নিয়েছে। আবার, মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্রীগুলি CIS, ECO, OIC, OSCE, UN প্রভৃতি সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করেছে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এইসব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের স্বাধীনতাকে সুরক্ষা দেবে। এই অঞ্চলের রাজনৈতিক শাসকরা রাশিয়া, আমেরিকা, ইউরোপিয় ইউনিয়ন প্রভৃতির সাহায্যে যৌথ নিরাপত্তার আঞ্চলিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজেদের ভূমিকা স্পষ্ট করেছে।

২.৩ মধ্য এশিয়ার ভূ-রণনীতিগত বৈশিষ্ট্য

মধ্য এশিয়া ইউরোপের সুবিস্তৃত এলাকার কেন্দ্রে অবস্থিত এবং ঐতিহাসিকভাবে ব্যবসায়ী ও বিদেশী আক্রমণকারীদের কছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। বিদেশী শক্তিগুলির রণনীতি রূপায়ণের অভিপ্রায়কে সহজ করেছে এবং জায়গা করে দিয়েছে। ভূ-রণনীতিগত অর্থে, অঞ্চলটি 'বৃহত্তর মধ্য এশিয়া' (Greater Central Asia) হিসাবে সুত্রায়িত হয়েছে। ধারণাটি পাঁচটি মধ্য এশিয় রাষ্ট্র, আফগানিস্তান ও চীনের ঝিনজিয়ান (Xinjiang) অঞ্চলকে নিয়ে তৈরী হয়েছে। বিস্তৃতিতর ভূ-রণনীতিগত নির্মাণে অঞ্চলটি পাকিস্তানের উত্তরাংশ, ইরানের খোরাশন (Khorasan) প্রদেশ, রাশিয়ার টাটারস্তান (Tatarstan) এবং ভারতের উত্তরদিকের অংশগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। বিশ শতকের প্রথম অর্দ্ধে হার্টফোর্ড ম্যাকিনডার (Hartford Mackinder) তাঁর Heartland Theory-তে দক্ষিণে ভলগা (Volga) ও ইয়াংসি (Yangtse) নদী ও হিমালয়ের পর্বত এবং উত্তরে সুমেরু মহাসাগর দ্বারা আবেষ্টিত ইউরেশিয়ার মধ্যমণি-র

ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা করেছেন। এই তত্ত্ব মধ্য এশিয়ার রণনীতিগত গুরুত্ব প্রকাশ করেছে। ১৯৯৭ সালে আমেরিকার পূর্বতন জাতীয় উপদেষ্টা পরামর্শদাতা Zbigniew Brzezinski তাঁর প্রকাশিত The Grand Chessboard : American Primacy and Its Geostrategic Imperatives গ্রন্থে সোভিয়েত উত্তর অঞ্চলটিকে 'Black Hole' আখ্যা দিয়েছেন। এই তত্ত্ব অনুসারে, ইউরোপ-এশিয়া মহাদেশে ক্ষমতার ভাগাভাগিতে সংঘটিত ঘটনা আমেরিকার বিশ্বব্যাপী প্রভুত্বে নির্ণায়ক হবে। তাছাড়া, তিনি উজবেকিস্তানকে মধ্য এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসাবে দেখেছেন। দেশটি রাশিয়ার চাপের কাছে সবচেয়ে কম নিরাপদ এবং দেশটির স্বাধীনতা অন্যান্য মধ্য এশিয় রাষ্ট্রগুলির কাছে সমালোচিত হবে।

মধ্য এশিয়ার ভূ-রণনীতিগত গুরুত্ব অনুধাবনে দুটি উপাদানের ভূমিকা দেখা যায়। যথা—(ক) মধ্য এশিয়া হাইড্রোকার্বনের সঞ্চিত ভাণ্ডার আবিষ্কারের কারণে গুরুত্ব পেয়েছে। এবং (খ) অঞ্চলটি গ্যাস ও তেল পাইপ লাইনের গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন কেন্দ্র এবং চীন, রাশিয়া, ইউরোপ, ইন্দো-ইউরোপীয় অঞ্চল ও ভারত মহাসাগরের সংযোগের বিস্তীর্ণ অঞ্চল হয়েছে। তাছাড়া, আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়াকে সংযুক্ত করেছে, যা ব্যাপক ভূ-রাজনৈতিক তাৎপর্যের রণনীতিগত সেতু। সে কারণে মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়া ভৌগোলিক ও রণনীতিগতভাবে সংযুক্ত হয়েছে। তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তান আফগানিস্তানের সীমান্ত বরাবর অবস্থিত। আফগানিস্তান ভারতীয় উপমহাদেশ ও সম্পদে সমৃদ্ধ মধ্য এশিয়ার মধ্যে সংযোগকারী সেতু হয়েছে এবং ইরান ও মধ্য প্রাচ্যকে সংযুক্ত করেছে। তাই আফগানিস্তানে সুস্থিতি ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ভূ-রণনীতিগতভাবে আবশ্যক। নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক ইস্যু বিদেশী শক্তিগুলির সঙ্গে মধ্য এশিয় রাষ্ট্রগুলির সংযুক্তিকরণে দুটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়েছে।

মধ্য এশিয় রাষ্ট্রগুলি বৃহৎ শক্তিগুলি-আমেরিকা, রাশিয়া ও চীন সমর্থিত বহুপাক্ষিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে যোগ দিয়েছে। বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির উদ্দেশ্য হল নিজেদের রাজনৈতিক সামরিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীর প্রসারের মাধ্যমে মধ্য এশিয় রাষ্ট্রগুলির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রতিষ্ঠা করা। বিপরীত দিকে, মধ্য এশিয় রাষ্ট্রগুলির লক্ষ্য হল বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির পরস্পর বিরোধী মানসিকতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের ক্ষমতায় ভারসাম্য বজায় রাখা। তাছাড়া, রাষ্ট্রগুলি নিজেদের নিরাপত্তা ও সুস্থিতি সুরক্ষার ভাল উপায় হিসাবে এরূপ বহুপাক্ষিক ব্যবস্থাগুলিকে বিবেচনা করে। পাঁচটি রাষ্ট্র সেই নীতিগুলিকে অনুসরণ করেছে, যেগুলি বহু-পার্শ্বযুক্ত কিংবা বহু দিককে নির্দেশ করে। রাষ্ট্রগুলি নিজেদের স্বার্থের উন্নতিকরণের ভাল উপায় হিসাবে বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে ভারসাম্যের সংরক্ষণকে বিবেচনা করেছে। কতিপয় তাত্ত্বিক মনে করেন, পাঁচটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের জাতীয় নিরাপত্তার থেকে শাসন প্রণালীর নিরাপত্তায় মনোযোগ দেওয়া উচিত।

২.৪ মধ্য এশিয় অঞ্চলে বৈদেশিক শক্তিদের প্রভাব

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলি NATO (North Atlantic Treaty Organization)-র শান্তি কর্মসূচীর জন্য অংশীদারিত্ব (Partnership for Peace Programme)-র মাধ্যমে অর্থনৈতিক চুক্তি ও নিরাপত্তা সহযোগিতার সাহায্যে তাদের প্রভাবে মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে আসতে সক্রিয় হয়েছে। মধ্য এশিয়ার সঙ্গে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি ও রাশিয়ার সীমান্ত ইস্যু সমাধার পর চীন এই অঞ্চলে নিজের রণনীতিগত উপস্থিতি বোঝাতে অনুরূপ পথ নিয়েছে। ১৯৯০-এর দশকের প্রথমে তুরস্ক, ইরান ও পাকিস্তানের ন্যায় আঞ্চলিক শক্তিগুলি এই অঞ্চলের তুমুল কলহে যোগ দিয়েছে। বরিস ইয়েলৎসিন-এর শাসনকালের অবসান এবং ভ্লাদিমির পুতিনের শাসনে আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ রাশিয়ার আবির্ভাবে, মস্কো মধ্য এশিয়ায় নতুনভাবে প্রভাব স্থাপনের জন্য নীতি তৈরি করেছে।

গুরুত্বপূর্ণ রণনীতিগত ঘটনা মধ্য এশিয়ায় সংঘটিত হয়েছে ২০০১ সালে ৯/১১-য় সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণে আমেরিকার প্রতিক্রিয়ায়। আমেরিকা Operation Enduring Freedom (OEF) গ্রহণ করে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে আমেরিকা ও ন্যাটো (NATO) মধ্য এশিয়ার কাছাকাছি আসে। উজবেকিস্তান ও কিরজিজস্তান OEF বাহিনীকে তাদের সাময়িক ভিত্তি ব্যবহারের সম্মতি দেয়। অন্যান্য দেশগুলি ঐ বাহিনীকে নিজেদের আকাশ পথ ব্যবহার ও অন্যান্য সমর্থন ব্যক্ত করে। রাশিয়া, চীন, ভারত ও মধ্য এশীয় দেশগুলি আমেরিকার উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদের উন্মেষে, এই সকল দেশ মধ্য এশিয়ায় আমেরিকার কর্মসুচীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তুলে ধরতে পারেনি।

ভারত অনেক পরে বিশেষভাবে ১৯৯০-এর দশকে অর্থনৈতিক সংস্কারের পদক্ষেপ গ্রহণের পর। মধ্য এশিয়ার অঞ্চল নিয়ে আগ্রহী হয়েছে। ৯-এর দশকের পূর্বে ভারত সরকার প্রায়শঃই নিজের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। তাছাড়া, রাজনৈতিক অস্থিরতাও ভারতকে মধ্য এশিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগে নেওয়া থেকে দূরে রেখেছিল। তা সত্ত্বেও, ভারত নিজের বিদেশ নীতি তৈরীতে রণনীতিগত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিসাবে মধ্য এশিয়ার তাৎপর্যকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বাৎসরিক প্রতিবেদন বিভিন্ন কারণে নিউ দিল্লীর কাছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিসাবে মধ্য এশিয়াকে স্বীকৃতি দিয়েছে। যথা—ভৌগোলিক নৈকট্য, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান, এবং বড়ার মৌলবাদী ও সন্ত্রাসবাদীদের সর্বজনীন চ্যালেঞ্জ। আবার প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং মধ্য এশিয়ার সঙ্গে

গঠনমূলক চুক্তিতে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেনও। মধ্য এশিয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা চুক্তির জন্য ক্রমবর্ধমান দাবী ভারতে দেখা যায়।

এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণভাবে উল্লেখ্য যে, ভারতীয় অর্থনীতির ক্রমবিকাশের ধারাকে বজায় রাখতে শক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য মধ্য এশিয় দেশগুলির সঙ্গে সুসম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যিক হিসাবে বিবেচিত হয়। তাই এই অঞ্চলে হাইড্রোকার্বন ও অন্যান্য সম্পদের ব্যাপক মজুত ভাণ্ডারের আবিষ্কারে ভারত অর্থনৈতিক বিকাশের প্রয়োজনে আর্থিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক তৈরী করেছে। ভারতের কাছে অঞ্চলটির গুরুত্ব বেড়েছে। তাছাড়া, সন্ত্রাসবাদ, ড্রাগের বেআইনী ব্যবসার বিরুদ্ধে ন্যায় সমরূপ যুক্তি উভয় পক্ষকে পুনরায় একে অন্যের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। মধ্য এশিয়ার রণনীতিগত ক্ষেত্রে রাশিয়া, আমেরিকা, চীন ও অন্যান্য পশ্চিমী দেশগুলির মধ্যে ভীষণ ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় ভারত মনসংযোগ করেনি। কিন্তু অঞ্চলটির প্রতি নমনীয় ক্ষমতার দৃষ্টিভঙ্গি (Soft power approach) অনুসরণের ওপর জোর দিয়েছে।

সাংহাই ফোরাম (The Shanghai Forum) এর প্রভাব

সাংহাই ফোরাম (The Shanghai Forum) সাংহাই ফাইভ (Shanghai Five) নামেও পরিচিত। এই ফোরাম রাশিয়া, চীন, কাজাখস্তান, কিরজিজস্তান ও তাজিকিস্তান নিয়ে তৈরী হয়েছে। এই ফোরামের মূল উদ্দেশ্য হল পাঁচটি রাষ্ট্রের সীমান্ত সমস্যার সমাধান করা ও সামরিক চরিত্রের উপায়সমূহ প্রস্তাব করা। বিশেষভাবে, ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাসে সাংহাই সম্মেলনে রাষ্ট্রসমূহের নেতৃবর্গ সীমান্ত এলাকায় সামরিক ক্ষেত্রে অভিন্ন মত গড়ে তুলতে ঐক্যমতে পৌঁছান এবং চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এবং পুনরায় ১৯৯৭ সালের এপ্রিল মাসে তারা মিলিত হয়ে সীমান্ত এলাকায় সশস্ত্র বাহিনীর পারস্পরিক সংখ্যা কমানোর চুক্তিতে সহমত হন। ১৯৯৯ সালের ৩০শে নভেম্বর থেকে ২রা ডিসেম্বর পাঁচটি রাষ্ট্রের আইন বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের নেতৃবর্গ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ, বেআইনি বাণিজ্য ও অস্ত্রশস্ত্র এবং অবিধিসম্মতভাবে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াত প্রমুখের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিজেদের পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর আলোচনা করে। ফোরামের সদস্যসংখ্যা ক্রমবৃদ্ধির সাথে গুরুত্বও বেড়েছে। ২০০০ সালে দুশানবে (Dushanbe) সম্মেলনে উজবেকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান কারিমভ (Karimov) সংগঠনের কাজে পর্যবেক্ষকের মর্যাদা নিয়ে অংশগ্রহণ করে। ২০০১ সালের ৩রা জানুয়ারী পাকিস্তানের সরকার সাংহাই ফোরামে যোগদানের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন করে। ঐ বছর জুন মাসের সম্মেলনে উজবেকিস্তান ফোরামের সদস্যপদ গ্রহণ করে। এবং ফোরাম নিজের নতুন নামকরণ করে নেয় Shanghai

Organization of Cooperation (SOC)। রাশিয়া ও চীন এই অঞ্চলের আঞ্চলিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভিন্ন মত পোষণ করে। চীন এশিয়া মহাদেশে নিজের অবস্থান প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। তবে চীন ও রাশিয়া সন্ত্রাসবাদ ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে যৌথ কর্মসূচী পরিচালনায় ঐক্যমত পোষণ করে।

আমেরিকার ভূমিকা (Role of the US)

পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার পর মধ্য এশিয়ার নতুনভাবে স্বাধীনতা প্রাপ্ত জাতিগুলিকে সহায়তার জন্য ১৯৬২ সালে আমেরিকার আইনসভা কংগ্রেস (US Congress) স্বাধীনতা সমর্থন আইন (Freedom Support Act or FSA) পাশ করে।

১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসে রাশিয়া ও CIS-র জন্য U.S. Department of State-এ বিশেষ সমন্বয়কারী জেমস্ কলিন্স (James Collins) মধ্য এশিয়ায় আমেরিকার লক্ষ্যগুলিকে সুনির্দিষ্ট করেন।

(ক) মধ্য এশিয়ার প্রত্যেক রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, সার্বভৌমিকতা, ও নিরাপত্তাকে সমর্থন করা।

(খ) রাষ্ট্রগুলির প্রত্যেকটি নাগরিককে সমসুযোগ প্রদান এবং তাদের পৌর অধিকার সুরক্ষার ভিত্তিতে বাজার অর্থনীতি ও গণতান্ত্রিক শাসন স্থাপনে সহায়তা করা।

(গ) রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনগুলির বিশ্বজনীন সমাজে রাষ্ট্রগুলির সংহতিতে সমর্থন করা এবং নিরাপত্তা ও সহযোগিতার প্রশ্নে ইউরো-আটলান্টিক কথপোকথনে (Euro-Atlantic dialogue) তাদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা।

(ঘ) মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি এবং তাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি-উভয়ের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায়, আঞ্চলিক সহযোগিতার নতুন দিক স্থাপনে, এবং আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতার মাধ্যমে স্থানীয় সমস্যার সমাধানে সহায়তা করা।

(ঙ) মধ্য এশিয়া কিংবা এই অঞ্চলের বাহিরে গণ-বিধ্বংসী অস্ত্রগুলি কিংবা তার উপাদানগুলিকে আইনগতভাবে বিনষ্ট করা।

(চ) সন্ত্রাসবাদ, ড্রাগ ও পরিবেশ সুরক্ষার ন্যায় অন্যান্য আন্তর্জাতিক সমস্যার আলোচনায় সহযোগিতা করা।

(ছ) আমেরিকার বাণিজ্যিক স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এবং

(জ) সম্পদের আন্তর্জাতিক উৎসের ক্রমবিস্তৃতি ও বিভিন্ন পথ সন্ধানে সচেষ্ট হওয়া।

আমেরিকা এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ অপহরণের চেষ্টা করে এবং প্রভাব স্থাপনের জন্য অন্য যে কোন ক্ষমতাকে বাধা দানে উদ্যোগী হয়। আমেরিকার লক্ষ্য ছিল যে, এই অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অন্য কোন শক্তি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা না করতে পারে। এই অঞ্চলে আমেরিকার কিছু সামরিক রাজনৈতিক স্বার্থ আছে। আমেরিকা এই অঞ্চলের সামরিক কাজের এলাকাগুলিতে পারমাণবিক পরীক্ষা গবেষণার ওপর তদারকি চায়। আমেরিকা 'Silk Road Strategy Act' কে পরিমার্জিত রূপ দিয়েছে। এই আইনের মাধ্যমে আমেরিকা মধ্য এশিয়ায় অর্থনৈতিক সাহায্য, পরিবহনের উন্নতি ও যোগাযোগের সংযোগ এবং সীমান্ত নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব নিয়েছে। এই আইন মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও পৌরসমাজ তৈরীর ক্ষেত্র সহায়ক হয়েছে। আমেরিকা সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়ার দুর্বলতার সুযোগে মধ্য এশিয়া ও সর্বত্র নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ানো। আমেরিকার অপর গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল ইউরো-আটলান্টিক প্রতিষ্ঠানগুলি ও পাশ্চাত্যে নিজেদের শক্তি বাড়ানোর ক্ষেত্রে মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিকে সংযুক্ত করা। আমেরিকা ন্যাটো (NATO), ইউরোপিয় ইউনিয়ন (EU), এবং ইউরোপে নিরাপত্তা ও সহযোগিতার জন্য সংগঠন (Organization for Security and Cooperation in Europe or OSCE)-এর সঙ্গে মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির সংযোগে উৎসাহী হয়েছে। ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্রীগুলি ন্যাটোর (NATO) শান্তির জন্য কর্মসূচীতে যোগ দিয়েছে, যার মাধ্যমে ঐ সংগঠনের সামরিক বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ দায়িত্ব আমেরিকা ও মধ্য এশিয়া উভয়েই বহন করেছে।

মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির সামনে নিজেদের সশস্ত্র বাহিনীকে আধুনিক করা এবং মাদক দ্রব্য, ধর্মীয় মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও গণ বিধ্বংসী অস্ত্র হ্রাসে বিরুদ্ধ শক্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ন্যাটোর সংযুক্তি ভাল সুযোগ তৈরী করেছে। এছাড়া, ন্যাটোর সঙ্গে মধ্য এশিয়ার সংযুক্তি রাশিয়ার সঙ্গে তাদের সম্পর্কের বিকল্প হয়েছে। ৯/১১ ঘটনার পর আমেরিকা তালিবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য মধ্য এশিয়ায় সামরিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেয়। বস্তুত, এই অঞ্চলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাশক্তি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা এবং সম্ভাব্য প্রতিযোগী ও বৃহৎশক্তি হিসাবে চীনকে বাধা দেওয়া ছিল আমেরিকার প্রকৃত লক্ষ্য। চীনের ক্রমবর্ধমান শক্তির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আমেরিকা ইউরোপ থেকে এশিয়া-য় নিজের সামরিক স্বার্থে যে কৌশল গ্রহণ করে তা "Joint Vision 2020", Asia 2025" নামে আখ্যা পেয়েছে। আবার এই অঞ্চলে আমেরিকা ইরান ও চীনের সঙ্গে নিজের সাধারণ স্বার্থের অংশীদারও হয়েছে।

আমেরিকা রাশিয়াকে ছাড়াই দক্ষিণ কিংবা পশ্চিমে গিয়ে সম্পদ ও পরিবহন ব্যবস্থা তৈরীতে মনোযোগী হয়েছে। বাকু (Azerbaijan) থেকে ত্বিলিশি (Tbilisi) থেকে সিহন (Ceyhan) তেল পাইপ লাইনের নির্মাণে বিভিন্ন বাধা এসেছে। ২০০৬ সালের মে মাসে পাইপ লাইনের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। BTC (Baku to Tbilisi to Ceyhan) পাইপ লাইন ইউরোপে যাওয়ার বিকল্প পথ নির্মাণের মাধ্যমে মধ্য এশিয়ার তেল ও গ্যাস পাইপ লাইনের ওপর রাশিয়ার শক্তিশালী প্রভাব হ্রাস করে আমেরিকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়তা করেছে। আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ২০০৯ সালের ১৩ই জুলাই স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে নাবুকো (Nabucco) গ্যাস পাইপ লাইনের জন্য প্রস্তাবকে সমর্থন করেছে। আমেরিকার সহকারী রাষ্ট্রদূত রিচার্ড বাউচার (Richard Boucher) ২০০৭ সালের জুন মাসে কাজাখস্তানে উল্লেখ করেন, রাশিয়ার মধ্যস্থতা ছাড়াই ইউরোপিয় ক্রেতাদের কাছে বাণিজ্যিক লেনদেনে এটা অধিক সুবিধাজনক হবে। তিনি তুর্কমেনিস্তান ভ্রমণ কালে সেখানকার গ্যাস রপ্তানির সম্ভাবনাগুলি খতিয়ে দেখেন।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভূমিকা (Role of EU)

ইউরোপীয় ইউনিয়ন মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্রীগুলির স্থায়িত্ব ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন ও অর্থনৈতিক সংস্কারে সাহায্য করা কথা ঘোষণা করেছে এবং তাদের পরিবেশগত সমস্যার উন্মোচন করেছে।

১৯৯৮ থেকে ২০০০ সালের ডিসেম্বরের নাইস (Nice)-এ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সম্মেলন পর্যন্ত মধ্য এশিয়ায় নতুন ভূ-রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রভাব প্রতিষ্ঠায় নিম্নলিখিত উপাদানগুলির ভূমিকা দেখা যায়

এক, ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ক্রমশ দ্রুত হয়েছে।

দুই, ইউরোর প্রচলন।

তিন, ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রে কিংবা সংঘের ইউরোপীয় ইউনিয়নে রূপান্তরের উদ্দেশ্যে প্রথম পদক্ষেপ।

চার, পূর্বে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সম্প্রসারণ।

পাঁচ, ইউরোপীয় ইউনিয়নের স্বতন্ত্র বিদেশ ও প্রতিরক্ষা নীতি তৈরী।

ছয়, মধ্য এশিয়াসহ ইউরোপের ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়ন স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তাকে ক্রমাগত গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেছে। ইউনিয়ন গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল 'ইউরোপীয় যৌথ বিদেশ

ও নিরাপত্তা নীতি' (European Common Foreign and Security Policy or ECFSP) প্রকল্প। এই প্রকল্পের মূল উদ্যোক্তা হল জার্মানি। জার্মানি এই প্রকল্পের মাধ্যমে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে আমেরিকার আধিপত্যের বিরোধী শক্তি হিসাবে তুলে ধরতে চেয়েছে এবং মধ্য প্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা, পূর্ব ইউরোপ, মধ্য এশিয়াসহ অন্যান্য এলাকায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের স্থায়ী প্রভাব নিয়ে এসেছে। ১৯৯২ সালে পিটারবার্গ সম্মেলন (Peterberg Summit)-এ ইউনিয়নের দেশগুলিতে সমরূপ নীতি তৈরীর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১৯৯৬ এর জুনে ন্যাটো (NATO) জোটের ইউরোপীয় স্তম্ভকে গুরুত্ব বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৯৯ সালের জুনে কলোগনি (Cologne)-তে একটিমাত্র কৌশল গ্রহণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সম্মেলনে বিদেশনীতি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূতদের পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে হেলসিঙ্কিতে ইউনিয়নের সম্মেলনে রাষ্ট্রের নেতৃবর্গ 'দ্রুত প্রতিক্রিয়া শক্তি' (Quick-response force) তৈরীর সিদ্ধান্ত নেয়। এবং ২০০০ সালের মার্চে ব্রাসেলস্ (Brussels) সম্মেলনে এই সমস্ত শক্তিগুলির রাজনৈতিক ও সামরিক কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের আদর্শরূপ গড়ে তোলা হয়।

সম্মেলনে European Super Army তৈরীর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বলা হয় যে, সংগঠনটি ক্ষমতার একটি নতুন ভূ-রাজনৈতিক কেন্দ্র হবে। সম্মেলনে বিদেশনীতি ও নিরাপত্তা বিষয়ে সুসংহত ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গীর বাস্তবতাকে তাত্ত্বিক দিক থেকে কার্যকরী পরিকল্পনায় নিয়ে যাওয়া হয়। ইউনিয়নের নেতৃবর্গ সুসংহত সেনাবাহিনী তৈরী করা এবং সবার জন্য সমরূপ বিদেশ ও প্রতিরক্ষানীতি গড়ে তোলার ব্যাপারে নিজেদের অভিপ্রায় সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে।

ইউরোপের রাজনীতিবিদরা কূটনীতি ও নিরাপত্তার ইস্যুগুলিকে বিবেচনা করে মধ্য এশিয়া নিয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ২০০০ সালে ইউরোপ মধ্য এশিয়ার যে সকল বিষয়কে ভীতিপ্রদ হিসাবে দেখেছে, সেগুলি হল—মাদকদ্রব্য ব্যবসা, আইন বিরুদ্ধ এক দেশ থেকে আর এক দেশে যাতায়াত, সামাজিক অসন্তোষের বিকাশ, গণতন্ত্রের অবক্ষয়, বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রে প্রকাশ্যে একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারণ এবং মৌলবাদী, সন্ত্রাসবাদী ইসলামের উন্মেষ।

২০০১ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন মধ্য এশিয়ার প্রতি নিজের অবস্থান সুস্পষ্ট করেছে। বস্তুতঃ ঐ বছর এপ্রিল মাসে উজবেক নেতা কারিমভ (Karimov)-এর বার্লিন সফর এবং পরের মাসে জার্মান বিদেশমন্ত্রী ও মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহের নেতৃবর্গের মধ্যে আলোচনার পর উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে। মধ্য এশিয়ার প্রতি ইউরোপের নীতি নির্ধারণে আফগানিস্তান সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

শক্তিশালী ইউরোপীয় ক্ষমতাসমূহের নেতৃবর্গ জর্জ ডব্লিউ বুশ (George W. Bush) ও তাঁর সামরিক নীতিকে সমর্থন করেছে এবং ঐক্যমত হয়েছে।

২০০৭ সালের জুন মাসে ইউরোপীয় ইউনিয়ন পরবর্তী ছয় বছরের (২০০৭-১৩) জন্য 'নতুন মধ্য এশিয় কৌশল' (New Central Asia Strategy) সামনে নিয়ে এসেছে, যা উভয়ের মধ্যে রাজনৈতিক আলোচনা, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার ওপর জোর দিয়েছে। ইউনিয়নের কর্মসূচী মধ্য এশিয়ার সুশাসন ও গণতান্ত্রিক প্রথাগুলিকেও সমর্থন করেছে। ইউরোপীয় কমিশন মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির শক্তি সম্পদকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নকে পরামর্শও দিয়েছে। কমিশন অদূর ভবিষ্যতে মধ্য এশিয়ার পাঁচটি রাষ্ট্রে কার্যালয় খোলার পরিকল্পনা নিয়েছে। বস্তুতঃ এই ভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন মধ্য এশিয় অঞ্চলে নিজের প্রভাব স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে।

রাশিয়ার ভূমিকা

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবমুক্ত মধ্য এশিয় অঞ্চলকে রাষ্ট্রপ্রধান বরিস ইয়েলৎসিন (Boris Yeltsin) তাঁর সহকর্মী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য সদস্যরা রাশিয়ার সহযোগিতা ও সমর্থন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখেন। ১৯৯৩ সালে রাশিয়া মধ্য এশিয়াকে বাদ দিয়ে নতুন মুদ্রা রুবেল জোন (ruble zone) চালু করে। রাশিয়ার বিশ্লেষকরা নিন্দা করে মধ্য এশিয়াকে "Asian yoke"-র মর্যাদা দেয়। রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন (Vladimir Putin) তাঁর পূর্বতন রাষ্ট্রপ্রধান ইয়েলৎসিনের নীতি থেকে সরে আসেন। রাশিয়া মধ্য এশিয়ার কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্র নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ফিরে আসে। নিরাপত্তার প্রশ্নে রাশিয়া চীনের সঙ্গে যৌথ ভাবে মধ্য এশিয়ার মুখ্য সুরক্ষাকারী হয়েছে। ২০০০ সালের মার্চ মাসে বিদেশ মন্ত্রীদের আলোচনা সভায় রাশিয়া, কাজাখস্তান, কিরজিজস্তান, ও তাজিকিস্তান CIS (Commonwealth of Independent States)-এর কাঠামোর মধ্যে সন্ত্রাসবাদ বিরুদ্ধ কেন্দ্র গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করে। রাষ্ট্রপতি পুতিনের নেতৃত্বে রাশিয়া চীনের নেতৃত্বাধীন SCO (Shanghai Cooperation Organisation)-এ যোগ দিয়েছে। এবং নিরাপত্তা কাঠামো-যৌথ নিরাপত্তা চুক্তি সংগঠন (Collective Security Treaty Organisation)-এর বিকাশ ঘটিয়েছে। সংগঠনের উদ্দেশ্য হল রাশিয়ার নিরাপত্তা, শক্তি ও পরিবহন প্রক্রিয়া স্বার্থকে সুরক্ষিত করা। যৌথ দ্রুত প্রতিক্রিয়া শক্তি (Collective Rapid Reaction Force) CIS (Commonwealth of Independent States)-এর উত্তরাংশ সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে রাশিয়ার প্রস্তাবকে বহন করে। সমরূপভাবে, রাশিয়ার বিমান বাহিনী

নিয়মিত আকাশপথে মধ্য এশিয়ার ওপর আধিপত্য আরোপে সচেষ্ট হয়েছে। রাশিয়া মধ্য এশিয়াকে সামরিক সাহায্য দেওয়ার মাধ্যমে নিজের অর্থনৈতিক স্বার্থকে সুরক্ষা দেওয়া এবং ঐ অঞ্চলের শক্তি সম্পদে নিজের প্রভাব প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে বলে বিবেচনা করেছিল।

চীনের ভূমিকা

মধ্য এশিয়ায় চীন বাণিজ্য, শক্তি সম্পদের লেনদেন, পরিবহন পরিকাঠামো এবং নিরাপত্তা ও অর্থনীতিতে সাংহাই সহযোগিতা সংগঠনের (Shanghai Cooperation Organisation) ক্রমাগত বিস্তারের মাধ্যমে নিজের উপস্থিতি জাহির করেছে। চীনের বিশ্লেষকরা মনে করেন, মধ্য এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ কিছু আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ঘটনা চীনের উপস্থিতিকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ আভ্যন্তরীণ ঘটনাগুলি হল— তাজিক (Tajiks) ও উজবেক (Uzbeks)-দের মধ্যে সংঘাত এবং এই অঞ্চলে রাশিয়ার আধিপত্যের অবসান, উজবেকিস্তান ও কিরজিজস্তান, এবং উজবেকিস্তান ও কাজাখস্তান-এর মধ্যে সীমান্ত সমস্যা, প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর সংঘাত; তাজিকিস্তানের সমস্যা ঃ গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা, মাদক দ্রব্য ব্যবসা, সরকারের বিরুদ্ধে মৌলবাদীদের বিপদ্‌জনক উপস্থিতি; এবং মৌলবাদীদের পুনরায় অভ্যুত্থান ও রাজনীতিতে অন্তর্ভুক্তি। বাহ্যিক উপাদানগুলি ছিল স্থায়িত্বের প্রতিনিয়ত বিপদ হিসাবে তালিবানদের ভূমিকা এবং এই অঞ্চলে রাশিয়া ও আমেরিকার মুখোমুখি সংঘাত।

উপরিউক্ত আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদানগুলির আলোকে চীন মধ্য এশিয়ায় নিম্নোক্ত নীতিসমূহের ওপর জোর দিয়েছে।

এক, কট্টর তুর্কি (Pan-Turkic) ও মৌলবাদীদের (Fundamentalist) প্রভাব সীমাবদ্ধ করা।

দুই, রাজনৈতিক উপস্থিতিতে সীমাবদ্ধতা এবং যথা সম্ভব অর্থনৈতিক উপস্থিতির ক্রম প্রসারের নিরিখে দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক চুক্তির বিস্তার ঘটানো।

তিন, অঞ্চলে বিদ্যমান রাজনৈতিক শাসন প্রণালী সমূহের স্থায়িত্ব এবং তাদের মধ্যে মতানৈক্য নিশ্চিতকরণের ভিত্তিতে রাজনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখা।

চীনের প্রেক্ষিত থেকে বলা যায়, চীন নিজের নিরাপত্তা স্বার্থ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বস্তুতঃ চীন নিজের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মধ্য এশিয়াকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসাবে বিবেচনা করেছে। সেগুলি হল— এক, সম্পদ জটিলতা - এক্ষেত্রে নতুন কিছু তৈরীর উদ্যোগ পাশাপাশি সম্ভাব্য সুযোগগুলিও বিবেচ্য হয়েছে। দুই,

নির্মাণ কার্য উপাদানগুলির উৎপাদনের উদ্যোগ। তিন, Katmet, Zhezkazgantsvetmet, Balkhashmed, Ust'-Kamenogorsk Lead and Zinc Plant সহ খনি ও প্রক্রিয়া আকরিক ধাতুসমূহের উদ্যোগগুলি। চার, সম্ভাব্য যে, মধ্য এশিয়া চীনের উদ্বৃত্ত শ্রম সম্পদের বিনিয়োগের ব্যবস্থা করবে এবং চীনের জনগণের উল্লেখযোগ্য অংশ স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্য নিয়ে মধ্য এশিয়ায় যাবে। পাঁচ, চীনের আপেক্ষিকভাবে স্বল্প মূল্যের পণ্যসমূহের বিনিময়ের ক্ষেত্রে কাজখাস্তানের বৃহৎ উপভোক্তা বাজারকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে।। চীন কেবল অর্থনৈতিক দিক নয়, নিজে ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থকেও মধ্য এশিয়ায় বিবেচনা করেছে।

এই অঞ্চলে চীন নিজের স্বার্থে রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতার নীতি নিয়েছে। যদিও চীনের বহু তাত্ত্বিকদের অভিমত, এই অঞ্চলে রাশিয়ার উপস্থিতি চীনের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর। তবে চীন ও রাশিয়ার ঐক্যবদ্ধতা এই অঞ্চলে আমেরিকার মনোভাবের বিরোধীতার দ্বারা চালিত হয়েছে। রাশিয়া ও চীন নিজেদের সম স্বার্থের ভিত্তিতে এই অঞ্চলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, চীনের যেমন রাশিয়ার অস্ত্র, প্রযুক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রয়োজন, আবার রাশিয়ার তেমনি চীনকে পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষায় প্রয়োজন। বস্তুত, মধ্য এশিয়ায় চীন-রাশিয়ার পারস্পরিক সহযোগিতা আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের মনোভাবকে সামনে রেখে তৈরী হয়েছে। চীন উত্তর ও পশ্চিমি শত্রু শিবির থেকে নিজেকে সুরক্ষার জন্য রাশিয়ার সঙ্গে প্রতিরক্ষা বিষয়ক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। চীন এই অঞ্চলে নিজের অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রভাব বৃদ্ধির বাধা হিসাবে আমেরিকাকে দেখেছে। পাশাপাশি চীনের পরিকল্পনা ছিল পাশ্চাত্যের হাত থেকে মধ্য এশিয়াকে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দেওয়া। মধ্য এশিয়ার মুসলিম জাতিসমূহ মনে করে, চীনের এই নীতি তাদের পৃথক মুসলিম আন্দোলনের পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ। চীনের নিরাপত্তা নীতি - এই অঞ্চলের পৃথকত্ববাদ, মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদকে প্রতিরোধ করবে। সাংহাই সহযোগিতা সংগঠনের মাধ্যমে চীন মধ্য এশিয় সেনাদের সঙ্গে যৌথভাবে এই অঞ্চলের সীমানা সুরক্ষায় প্রয়াসী হয়েছে। তাই চীন এই অঞ্চলের বিদ্যমান রাজনৈতিক শাসন প্রণালীকে সমর্থন করে। যার মাধ্যমে এই অঞ্চলে আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে চীন নিজেকে উপস্থাপন করে।

চীন রাশিয়ার সঙ্গে যৌথভাবে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ণের জন্য শক্তি সম্পদকে সুরক্ষিত করে। চীন কাজাখস্তানের (Kazakhsthan) আতাসু থেকে ঝিনজিয়ান (Xinjiang) ৯৮৮ কিলোমিটার দীর্ঘ পাইপলাইন তৈরী করেছে বাৎসরিক ১০ মিলিয়ন টন পরিবহনের জন্য। এছাড়া, চীন তুর্কমেনিস্তানের (Turkmenistan) সঙ্গে চুক্তি করেছে। এই চুক্তি অনুযায়ী তুর্কমেনিস্তান চীনকে ৩০ বিলিয়ন কিউবিক

মিটার প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করবে। এই চুক্তি চীনকে তুর্কমেনিস্তানের প্রাকৃতিক গ্যাস প্রবেশের অনুমোদন দিয়েছে। চীনের জাতীয় পেট্রোলিয়াম সংস্থা তুর্কমেনিস্তানের প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনে প্রবেশের জন্য উৎপাদন অংশীদার চুক্তি (Production Sharing Agreement (PSA)) করেছে। কাজাখস্তান (Kazakhstan), তুর্কমেনিস্তান (Turkmenistan) ও উজবেকিস্তানের (Uzbekistan) শক্তি সম্পদে চীনের ভূমিকা মধ্য এশিয়ায় Gazprom-এর আধিপত্য ভেঙে দিয়েছে। চীন-কাজাখস্তান-এর পাইপলাইন কাঠামো ক্যাসপিয়ান সাগর হয়ে ইরানের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। তুর্কমেনিস্তান থেকে চীনা পাইপলাইনও সীমান্ত অতিক্রম করে ইরান পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। চীন কিরজিজস্তান ও তাজিকিস্তানের সম্ভাব্য উন্নত হাইড্রোপাওয়ার (hydropower) শোষণ প্রক্রিয়ায় নিজেকে নিযুক্ত করেছে এবং কাজাখস্তানের সাহায্যে বৈদ্যুতিক পাওয়ার স্টেশন (electric power station) তৈরী করেছে ও পরবর্তী সময়ে পাওয়ার গ্রিড সমূহের (Power Grid) মাধ্যমে বিদ্যুৎ পাঠিয়েছে। এক্ষেত্রে চীন কাজাখস্তানকে জল দেওয়ার ক্ষেত্রে দুটি নদীর ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। এছাড়াও চীন সাংহাই সহযোগিতা সংগঠনের (SCO) ছত্রছায়ায় মধ্য এশিয়ার দেশ সমূহকে ৯০০ মিলিয়ন ডলার ($ 900 million) ঋণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। যার দ্বারা এই অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহ চীনের পণ্যাদি ও পরিষেবাসমূহ ক্রয় করতে পারে। বস্তুত, এই সব কিছুর মাধ্যমে চীন এই অঞ্চলে নিজের প্রভাব স্থাপনে সচেষ্ট হয়েছে। ভারতের সঙ্গে প্রতিযোগিতার কারণে চীন মধ্য এশিয়ায় নিজের উপস্থিতির বিস্তার করেছে। পাকিস্তানের সমর্থনে চীন আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ায় ভারতের উপস্থিতির বিরোধীতা করেছে। ২০০০ সালের ডিসেম্বরে তালিবান নিয়ন্ত্রিত আফগানিস্তানের ওপর আরোপিত শাস্তি হিসাবে প্রস্তাব ১৩৩৩ (Resolution 1333)-এ নিরাপত্তা পরিষদের ভোটে চীন নিরপেক্ষ অবস্থান নেয়।

ইরানের ভূমিকা

তেহেরান মধ্য এশিয়ায় শক্তিশালী প্রভাব অনুসন্ধান করেছে। তবে আঞ্চলিক প্রক্রিয়ায় তেহেরানের অন্তর্ভুক্তি রাশিয়ার তুলনায় স্বল্প পরিসরে সীমাবদ্ধ। এবং সাম্প্রতিক সময়ে কেবল আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানে বিস্তৃত। ইরানের আঞ্চলিক নীতির অন্যতম উপাদান হল মধ্য এশিয়ায় ইসলামের ভূমিকাকে শক্তিশালী করা। অবশ্য ইসলামের প্রভাব রাষ্ট্রীয় স্তরে সীমাবদ্ধ থাকবে। ইরান সন্ত্রাসবাদীদের অস্ত্র, অর্থ, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে সাহায্য করে।

ইরানের বিদেশমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, ক্যাসপিয়ান সাগরভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্পের বিকাশে এমনকি শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় বাহিরের বিদেশী শক্তিগুলি যথা ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আমেরিকা প্রমুখের

অংশগ্রহণের বিরোধিতা করবে না। ইরানের এই অবস্থান মধ্য এশিয়ায় অন্য যে কোন শক্তির প্রভাব স্থাপনে আমেরিকার বাধা দানের রণকৌশল উদ্দেশ্যকে সাহায্য করেছে। কিন্তু আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লুউ বুশ-এর প্রশাসন ইরানের ওপর বিভিন্ন বিধি নিষেধ আরোপ করলে ইরান নিজের বিদেশ নীতিতে পরিবর্তন নিয়ে আসে। ইরান আঞ্চলিক নীতিতে এই অঞ্চলে শক্তিশূন্যবস্থা বজায় রাখা এবং বাহিরের শক্তিগুলিকে বর্জন করার কৌশল গ্রহণ করে। ২০০১ সালের মার্চ মাসে মস্কো সফরের সময় রাষ্ট্রপতি মহম্মদ খাতামি (Mohammad Khatami) সতর্ক করে বলেন যে, Any foreign presence in the Central Asian region can upset the balance of peace and stability there। এই কারণে ইরান মধ্য এশিয়ায় আমেরিকা ও রাশিয়া-উভয়ের স্বার্থকে কিভাবে দুর্বল করা যায় তার অনুসন্ধান করেছে। বিশেষভাবে, তেহেরান রাশিয়ার আধিপত্যে মধ্য এশিয়ায় আঞ্চলিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরীর বিরোধীতা করেছে। একই সাথে, ইরান এই অঞ্চলে আমেরিকার প্রভাব প্রতিরোধে সচেষ্ট হয়েছে। রাষ্ট্রপতি খাতামির মস্কো সফরের সময় উভয় দেশের সামরিক ও সামরিক প্রযুক্তি বিষয়ে পারস্পরিক মত বিনিময় সম্পর্ক ও সহযোগিতার নীতির ওপর চুক্তি হয়েছে।

ভারতের ভূমিকা

মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের বহু দিক নীতির (Multi-directional Policies) অংশ হিসাবে দক্ষিণের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করেছে। তাই মধ্য এশিয়ার সরকারসমূহ নিউ দিল্লীর সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক উন্নতিতে উদ্যোগী হয়েছে। অনুরূপভাবে, ভারতও মধ্য এশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ, তেল, গ্যাস, জ্বালানি প্রভৃতিকে মাথায় রেখে অঞ্চলটির অবস্থানকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছে। নিউ দিল্লী মনে করে নিজেদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে মধ্য এশিয়ার তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি অপর্যাপ্ত পরিমাণে নেওয়া প্রয়োজন। আবার মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক প্রশাসকরা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক মডেলের প্রতি গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপনের মাধ্যমে ব্যক্ত করে যে, এই আদর্শ ইসলামিক মৌলবাদের বিরোধী হবে। এই কারণে তারা নিউ দিল্লীর সঙ্গে উন্নত সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

পাকিস্তানের ভূমিকা

ইসলামাবাদ ভারতের চুতস্পার্শ্বস্থ মুসলিম রাষ্ট্রগুলির গোষ্ঠী তৈরী করতে মধ্য এশিয়ায় নিজের অবস্থার শক্তি বৃদ্ধি চেয়েছে। ১৯৯৫ সালের নভেম্বরে পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী সর্দার আসিফ আহমেদ আলি (Sardar Asif Ahmad Ali) ঘোষণা করেন যে, তাঁর দেশ মধ্য এশিয় রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বহুমুখী

সম্পর্কের বিকাশ ঘটাবে। এই কারণে পাকিস্তান ও উজবেকিস্তান আঞ্চলিক নিরাপত্তা (যথাক্রমে, আফগান ও তাজিক সমস্যা)-র জন্য দায়িত্ব নেবে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো (Benazir Bhutto) উজবেক রাষ্ট্রপ্রধান কারিমভ (Karimov)-এর সঙ্গে আফগান সমস্যার সমাধান নিয়ে আলোচনা করেন এবং উজবেক নেতাকে বোঝাতে সচেষ্ট হন যে, উভয়েই আফগানিস্তানে তালিবানের পূর্ণ আধিপত্যকে সুরক্ষা দেবে। যদিও পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা তার সামর্থ্যের অবক্ষয় প্রকাশ করে।

সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল পারভেজ মুশারফ (Pervez Musharraf) ক্ষমতায় আসীন হলে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তান নিজের আন্তর্জাতিক সমস্যার মোকাবিলায় আমেরিকার সমর্থনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। তাছাড়া, ইসলামাবাদ কাশ্মীর প্রদেশে ভারতের সঙ্গে সংঘাতে ওয়াশিংটনের সাহায্য আবশ্যিক বলে মনে করে।

পাকিস্তানের সঙ্গে মধ্য এশিয় রাষ্ট্রগুলির সুসম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। কারণ মধ্য এশিয়ার মৌলবাদীরা পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। পাকিস্তানের জামাত-ই-ইসলাম (Jamaat-e-Islami)-র ন্যায় ধর্মীয় সংগঠনগুলি উজবেকিস্তানে বিরোধী মৌলবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে। উজবেকিস্তানের বিদ্রোহীরা পাকিস্তানের মাটিতে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। অধিকন্তু, পাকিস্তানের নেতৃবর্গরা Commonwealth of Independent States (CIS)-এর মুসলিম দেশগুলিতে মৌলিবাদী শাসনপ্রণালীর প্রতিষ্ঠা চেয়েছে। এবং ইসলামাবাদ মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলিম রাষ্ট্রগুলির আঞ্চলিক সামরিক-রাজনৈতিক ইউনিয়নের কেন্দ্র হয়েছে। সেই কারণে পাকিস্তান মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিতে মৌলবাদীদের অস্ত্রের যোগান দিয়েছে এবং বিদ্রোহীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে।

২.৫ উপসংহার

মধ্য এশিয়ার পাঁচটি দেশ যথা, কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, কিরগিজস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও তাজিকিস্তানকে প্রায়শই এই অঞ্চলে মুখ্য ভূমিকা পালনকারী আমেরিকা, চীন ও রাশিয়ার মধ্যে প্রতিযোগিতায় নীরব পর্যবেক্ষক হিসাবে দেখা হয়েছে। সমরূপ এও বলা যায় যে, এক শতক পূর্বে এই অঞ্চলটিকে নিয়ে গ্রেট ব্রিটেন ও পূর্বতন রাশিয়ার (Tsarist Russia)-র মধ্যে প্রতিযেগিতা হত। সাধারণভাবে এই প্রতিযোগিতাকে Conflict of great game আখ্যা দেওয়া হত। এই সময় মধ্য এশিয়ায় কৌশলগত ও নিরাপত্তা ইস্যু ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বর্তমানে মধ্য এশিয়ার সকল রাষ্ট্রই নিজেদের

অপর্যাপ্ত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সুরক্ষা দিয়ে বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে এই অঞ্চলে উপস্থিত বৈদেশিক শক্তি সমূহের কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে।

২.৬ সংক্ষিপ্তসার

ঐতিহাসিকভাবে, মধ্য এশিয়া ব্যবসায়ী ও আক্রমণকারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। মধ্য এশিয়া বৈদেশিক শক্তিদের কৌশলগত অভিপ্রায় বাস্তবায়নকে সহজ করে দিয়েছে একদিকে, অন্যদিকে প্রতিবন্ধকও হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেঙ্গে যাওয়ার পর, এই অঞ্চলে হাইড্রোকার্বন আবিষ্কার হওয়ায়, অঞ্চলটি অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। তাছাড়া, মধ্য এশিয়া প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেল পাইপলাইনের পরিবহন কেন্দ্র এবং চীন, রাশিয়া, ইউরোপ ও ইন্দো-ইউরোপ জাতিসমূহের বসবাসকারী অঞ্চল, Trans-Caspian region ও ভারত মহাসাগরের যোগসূত্রকারী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে।

২.৭ অনুশীলনী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

ক. মধ্য এশিয়ার নিরাপত্তা ও কৌশলগত ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করুন।

খ. মধ্য এশিয়ার ভূ-কৌশলগত বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।

গ. সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেঙ্গে যাওয়ার পর মধ্য এশিয়ায় বৈদেশিক শক্তিসমূহের ভূমিকা আলোচনা করুন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী

ক. মধ্য এশিয়ার কৌশলগত কাজে চীনের অন্তর্ভুক্তির ওপর সংক্ষিপ্ত ধারণা দিন।

খ. সাম্প্রতিককালে মধ্য এশিয়ার প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১। মধ্য এশিয়ার ভূ-রণনীতিগত তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

২। টীকা লিখুন — সাংহাই ফোরাম।

K. Warikoo and Mahavir Singh (ed.) (2004), *Central Asia :* Since Independence, Delhi, Shipra Publications.

Boris Rumer, Stanislav Zhukov (2003), *Central Asia: The Challenges of Independence*, Delhi, Akar Books.

Suchandana Chatterjee (ed.) (2014), Image of the Region in Eurasian Studies, New Delhi, K. W. Publishers Pvt. Ltd.

Nirmala Joshi (ed.) (2010), *Reconnecting India-Central Asia: Emerging Security and Economic Dimensions,* Washington DC, Central Asia Caucasus Institute and the Silk Road Studies.

Alexander Cooley (2014), *Great Game, Local Rules: The New Great Power Contest in Central Asia,* Oxford, Oxford University Press.

Boris Rumer (ed.) (2003), *Central Asia in Transition* : Dilemmas of Political and Economic Development, Aakar Books, Delhi.

একক—৩ ❑ অর্থনৈতিক অবস্থান্তরের সমস্যাসমূহ

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ ভূমিকা

৩.৩ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের সমস্যা/চ্যালেঞ্জসমূহ

৩.৪ মধ্য এশিয়ার তৈরী রণনীতি

৩.৫ সিদ্ধান্ত

৩.৬ সংক্ষিপ্তসার

৩.৭ অনুশীলনী

৩.৮ তথ্যসূত্র

৩.১ উদ্দেশ্য

পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের স্বাধীনতাকে নতুনভাবে বরণ করে নিতে তৈরী ছিল না। সেকারণে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার কোন তাৎক্ষণিক সমাধানসূত্র তাদের সামনে ছিল না। এই প্রেক্ষাপটে আলোচনার উদ্দেশ্যসমূহ হল—

(ক) মধ্য এশিয়ার অর্থনীতির প্রকৃতি অনুধাবন।

(খ) রাষ্ট্রসমূহের সামনে আগত সমস্যাসমূহের চিহ্নিতকরণ।

(গ) রাষ্ট্রসমূহের তৈরী কৌশলসমূহ আলোচনা।

৩.২ ভূমিকা

১৯৯০-এর দশকের শেষ থেকে মধ্য এশিয়া বিশ্বের দ্রুততম বিকাশশীল অঞ্চল সমূহের অন্যতম হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে অঞ্চলটির ভৌগোলিক অবস্থানকে বিবেচনা করা হয়। অঞ্চলটি ক্ষুদ্র সম্পূর্ণভাবে বা প্রায় সম্পূর্ণভাবে স্থলবেষ্টিত অর্থনীতি দ্বারা গড়ে উঠেছে। বাণিজ্যের জন্য সমুদ্রকে

প্রবেশপথ করা হয় না। এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা আন্তর্জাতিক পণ্যমূল্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। তেল, গ্যাস, তুলো ও সোনার ন্যায় উচ্চমূল্যের পণ্যসমূহ এই অঞ্চলে বিদ্যমান।

শক্তি সম্পদ

মধ্য এশিয়ার অর্থনীতি মূলতঃ বিশ্বের অন্যান্য দেশে শক্তি সম্পদের রপ্তানির ওপর বিকাশ লাভ করেছে। শক্তি সম্পদ এই অঞ্চলের রাজস্ব আয়ের অন্যতম উৎস। এক্ষেত্রে বলা যায়, কাজাখস্তান ৬৫ বছর তেল সঞ্চয় ও ৩০০ বছর কয়লা সঞ্চয় ধারণ করতে পারে। উৎপাদনের বর্তমান মূল্য হারে, তুর্কমেনিস্তান ২০০ বছরের অধিক সময় সঞ্চিত গ্যাস ধারণ করে প্রাকৃতিক গ্যাসের নেতৃস্থানীয় উৎপাদক হবে। কিরগিজস্তান ও তাজিকিস্তানে প্রচুর জল সম্পদ রয়েছে, যার অধিকাংশ সম্ভাব্য সম্পদ হল হাইড্রো ইলেক্ট্রিসিটি (hydroelectricity)।

কৃষি

মধ্য এশিয়া বিশ্বে বৃহত্তর চাষের উপযুক্ত এলাকাসমূহের অন্যতম। ২০০৮ সালে ২৫.৬ টন গম উৎপন্ন হয়েছে এই অঞ্চলে, যা বিশ্বে উৎপাদিত গমের ৪ শতাংশ হয়েছে। কাজাখস্তান গম, চাল প্রভৃতি দানাশস্যের গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদক হয়েছে। যেমন তুলো তুর্কমেনিস্তান ও উজবেকিস্তানের মুখ্য রপ্তানী পণ্য হয়েছে। এই সকল দেশ ১৯৯০ এর দশকের প্রথমার্ধ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কার্পাস রপ্তানি থেকে অধিক মুনাফা পেয়েছে। তাজিকিস্তান কার্পাস উৎপাদন ও রপ্তানীর ক্ষেত্রে শক্তিশালী সম্ভাব্য দেশ হয়েছে।

অন্যান্য পণ্যসমূহ

কাজাখস্তানে তাৎপর্যপূর্ণভাবে খনিজ, লোহা ও স্টীল সংরক্ষিত আছে। কিরজিজস্তান বিপুল পরিমাণে সোনা রপ্তানী করে। কুমতোর স্বর্ণখনি (Kumtor goldmine) বিশ্বে অষ্টম বৃহত্তর স্বর্ণখনি। তাজিকিস্তানে অ্যালুমিনিয়াম রপ্তানী দেখা যায়।

৩.৩ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের সমস্যা/ চ্যালেঞ্জসমূহ

কৌশলগতভাবে, মধ্য এশিয়ার অবস্থান ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে যোগসূত্রকারী হয়েছে। এবং এই অঞ্চলকে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও বিকাশের জন্য ব্যাপক সম্ভাব্য হিসাবে দেখা হয়। মধ্য এশিয়ার অর্থনীতিতে সোভিয়েত পরিচালিত অর্থনৈতিক নীতিসমূহের বৈধতা পেয়েছে। বাজার অভিমুখী

সংস্কারসমূহ, বাণিজ্য উন্মুক্ততা ও বেসরকারী ক্ষেত্রে উন্নয়নের নীতিকে এই অঞ্চলে গ্রহণ করা হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্রীসমূহ ধীরগতিসম্পন্ন ও নেতিবাচক বিকাশ ও দারিদ্রের ব্যাপ্তি উন্মেষের সময় পর্বের সাক্ষী হয়েছে। এই অবস্থায় মধ্য এশিয়া অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। যথা, উৎপাদন ও বাজার সম্পর্কে ভাঙ্গন, পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক সমর্থনের অবসান, অপরিণত বেসরকারী ক্ষেত্র, পুঁজিপতি বাজারের অভাব, বাজার অর্থনীতির জন্য পর্যাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ঘাটতি এবং আন্তঃকাঠামোতে শূন্যতা।

১৯৯১-৯৪ সালে মোট দেশীয় উৎপন্নদ্রব্য (Gross Domestic Product or GDP) তাজিকিস্তানে ৪৯ শতাংশ, কিরগিজস্তানে ৪৮ শতাংশ, কাজাখস্তানে ৪৩ শতাংশ, তুর্কমেনিস্তানে ২৯ শতাংশ ও উজবেকিস্তানে ১৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। কিরজিজস্তান ও তাজিকিস্তান স্পষ্টতঃ নূন্যতম উন্নত রাষ্ট্রগুলির তালিকাভুক্ত হয়েছে। কাজাখস্তানও এই তালিকার খুব দূরে নেই। কেবল তুর্কমেনিস্তান ও উজবেকিস্তানের সামনে গড় আয় বৃদ্ধির রাষ্ট্রসমূহের তালিকাভুক্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

অর্থনীতির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের চিত্র দেখা যায়। বিশেষভাবে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনে দেখা যায় যে, এই সময়ে কিরজিজস্তানে ৫৯ শতাংশ, তাজিকিস্তানে ৫২ শতাংশ, কাজাখস্তানে ৪৭ শতাংশ, এবং তুর্কমেনিস্তানে ৩৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। উজবেকিস্তানে কেবল ২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। তবে কৃষিজ উৎপাদনে তুলনামূলক অল্প পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। এই বিভাগের উৎপাদনে কেবল অর্দ্ধেকের কাছাকাছি অবক্ষয় দেখা যায়। এক্ষেত্রে সরকারের সামরিক কর্মসূচী ও বিরুদ্ধ মনোভাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। অপরদিকে, তুর্কমেনিস্তানে কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদনে বিকাশ হয়েছে। বিষয়টিকে নিম্নের প্রতিবেদনের সাহায্যে তুলে ধরা হল—

Macroeconomic Indicators for Central Asia (Percent)

Indicator	Country	1992	1993	1994	1995*	1991-1994
Gross domestic	Kazakhastan	–13.0	–12.9	–25.8	–15.8	–43
Product	Uzbekistan	–11.2	–2.4	–4.0	–4.0	–17
	Turkmenistan	–11.0	–6.0	–15.0	–6.0	–29
	Kyrgyzstan	–16.4	–16.4	–26.0	–13.8	–48
	Tajikistan	–31.0	–17.3	–12.0	...	–49

Industrial	Kazakhastan	–13.8	–14.8	–28.5	–16.4	–47
Production	Uzbekistan	–6.7	–3.6	–1.0	–17.4	–2
	Turkmenistan	–14.9	–4.0	–25.0	–18.0	–34
	Kyrgyzstan	–26.4	–25.3	–24.5	–19.5	–59
	Tajikistan	–24.2	–7.9	–30.8	–25.1	–52
Agricultural	Kazakhastan	1.0	–5.0	–17.0	...	–20
Production	Uzbekistan	–6.0	1.0	–1.0	...	–6
	Turkmenistan	–9.0	16.0	2.0	...	7
	Kyrgyzstan	–5.0	–10.0	–15.0	...	–27
	Tajikistan	–27.0	–4.0	–25.0	...	–47

Sources : "Ekhonomika Stran Sodruzhestva Nezavisimykh Gosudrstv V 1994,". Statisticheskii combated SNG, *Interfax-Statisticheskoe obozrenie,* 1995, no. 5-6 (10 February), pp. 2-3, "Ekonomika Stran Sodruzhestva Nezavisimykh Gosudarstv V ianvare-mae 1995g.," Delovoi Mir, 17-23 July 1995, p. 25; সমীক্ষাটিকে Stanislav Zhukov তাঁর *Economic Development in the States of Central Asia* প্রবন্ধে প্রস্তুত করে দেখিয়েছেন।

*Data for January-May 1995 in proportion to the same period of the period of the preceding year.

এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রসমূহ আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান তৈরীতে উদ্যোগী হয়েছে। এই উদ্যোগের প্রথম ধাপে কাজাখস্তান, কিরজিজস্তান ও উজবেকিস্তান ১৯৯৪ সালের ৩০ শে এপ্রিল নিজেদের মধ্যে সমরূপ অর্থনৈতিক ক্ষেত্র তৈরী করে। তাজিকিস্তান ১৯৯৮ সালের ২৬শে মার্চ ঐ গোষ্ঠীতে যোগ দেয়। বর্তমানে মধ্য এশিয় রাষ্ট্রসমূহের সমরূপ অর্থনৈতিক ক্ষেত্র (Uniform economic space) মধ্য এশিয় অর্থনৈতিক সম্প্রদায় (Central Asian Economic Community) হিসাবে বিদ্যমান।

অপর উন্নয়নমূলক তথ্য যে, সকল মধ্য এশিয় রাষ্ট্রসমূহ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) সদস্য হয়েছে এবং তারা চীনের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য এলাকা (free trade zone) চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। বেজিং

মধ্য এশিয় রাষ্ট্রসমূহের প্রথম বাণিজ্যের অংশীদার। মধ্য এশিয়ায় অনেক রাজনৈতিক দলই চীনের কর্তৃত্বমূলক, জাতীয়তাবাদী অর্থনৈতিক মডেলের ওপর নিজেদের আস্থা জ্ঞাপন করেছে। রাষ্ট্রসমূহ চীনের ভয় সহ্য করেছে। এই অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক কাজে রাশিয়ার প্রভাব বিভিন্ন কারণে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। একই সময়ে, এই অঞ্চলে ভারতের প্রভাবও খুব সীমিত। United Arab Emirates (UAE), কোরিয়া ও দক্ষিণ এশিয় পূর্ব রাষ্ট্রসমূহ মধ্য এশিয় রাষ্ট্রসমূহের মুখ্য অংশীদার হয়েছে। এই অঞ্চলে আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রভাবও নিয়ন্ত্রিত।

শেষ তিন দশকে পাঁচটি মধ্য এশিয় রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক শূন্যতা বারংবার প্রসার লাভ করেছে। ১৯৯০ সালে কিরজিজস্তান ও তাজিকিস্তানে মাথাপিছু GDP-র হার ৩৫.৬ শতাংশ এবং ঐবছরে কাজাখস্তানে মাথাপিছু GDP-র হার ৪১.৮ শতাংশ ছিল। ২০১১ সালে কিরজিজস্তানে মাথাপিছু GDP-র হার হয়েছে ১৮.৩ শতাংশ। এক্ষেত্রে বলা হয়, যে সামনের বছরসমূহে এই প্রবণতা পরিবর্তনের কোন আভাস পাওয়া যায় না। এছাড়া, দেখা যায় মধ্য এশিয় অর্থনীতি গভীরভাবে একটি কিংবা দুটি রপ্তানী বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। তবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক শূন্যতা দেখা যায় তাজিকিস্তান, কিরজিজস্তান ও উজবেকিস্তান থেকে শ্রমিকদের অধিক সংখ্যক নিজেদের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার ঘটনার ওপর। একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০০৮ সালে তাজিকিস্তানের GDP-র ৪৯ শতাংশ, কিরজিজস্তানে ২৭ শতাংশ ও উজবেকিস্তানে ১৩ শতাংশ প্রেরিত অর্থে গড়ে উঠেছে। এই প্রবণতা পরবর্তী সময়েও বিদ্যমান। ফলস্বরূপ, শক্তি সম্পদ কেন্দ্রিক অর্থনীতি ও অধিক নিরাপত্তাহীন অর্থনীতির মধ্যে বৈষম্য সামনের বছরগুলোতে আরও প্রসারিত হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যের ন্যায় জন পরিষেবা ও শ্রমিকদের দেশান্তরের ঘটনায় এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

৩.৪ মধ্য এশিয়ার তৈরী রণনীতি

মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহের সামনে উপরিউক্ত প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও শেষ দু'দশকে রাষ্ট্রগুলি ঐ সকল বাধা অতিক্রমের চেষ্টা করেছে। প্রমাণ স্বরূপ বলা যায়, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের উচ্চ পণ্যমূল্যে বিশ্ববাজারে রাষ্ট্রগুলির ক্রমবর্ধমান দাবী, দেশের অভ্যন্তরে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি, ব্যাপক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার বিকাশ ও আন্তঃকাঠামোর উন্নতি, পরিণতিতে অর্থনীতির বিকাশ হয়েছে। এই অঞ্চলের তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস, চাকরির ক্ষেত্র ও কলকারখানায় যন্ত্রের সাহায্যে পণ্যদ্রব্য উৎপাদনমূলক কিছু কাজ তুলে ধরেছে। ফলস্বরূপ, নতুন কর্মসংস্থান তৈরী হয়েছে ও দারিদ্রের হ্রাস হয়েছে।

মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহে শিল্পজাত পণ্য ও খনিজের উৎপাদনের ফলে অর্থনীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন হয়েছে। ১৯৯৭ ও ২০০৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ে কাজাখস্তান ও তুর্কমেনিস্তানে GDP-র হার বিকাশে শিল্পের ভূমিকা দেখা যায়। অ-তৈল উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে তাজিকিস্তানে GDP-তে শিল্পের উৎপাদন উর্দ্ধগামী হলেও কিরজিজস্তান ও উজবেকিস্তানে নিম্নগামী। ২০০৩ সালে কাজাখস্তানে শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদনে ব্যাপ্তি দেখা গেলেও কিরজিজস্তানে বিপরীত চিত্র সামনে এসেছে। অপর তিনটি দেশের চিত্র এদের মাঝামাঝি স্থান নিয়েছে।

মধ্য এশিয়ায় শিল্পের পুনরায় বিকাশ, দেশগুলির উৎপন্ন দ্রব্যাদির রপ্তানির সঙ্গে পরিপূরকভাবে সম্পর্কযুক্ত। দেশগুলির রপ্তানি দ্রব্যের পরিমাণ প্রত্যেক বছর ১০ শতাংশ বেড়েছে। তৈল ও অ-তৈল দ্রব্যাদি দেশজ পণ্যের রপ্তানির বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। যখন তেল রপ্তানিতে দেশগুলির ১১ শতাংশ লক্ষ্যে পৌঁছেছে, তখন অ-তৈল পণ্যের রপ্তানিতে ৭.৮ শতাংশ পৌঁছেছে। তবে দেশগুলির মধ্যে পণ্য উৎপাদনের কাঠামো ও উৎপন্ন পণ্যের রপ্তানি পণ্য হয়েছে টেক্স্টাইল ও পরিচ্ছদ (garments)। কাজাখস্তান থেকে লোহা ও স্টীল বেশী রপ্তানি হয়েছে। তবে কেমিক্যাল ও প্লাসটিক এবং মেশিনারী ও পরিবহন উপকরণ রপ্তানির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আজারবাইজানের রপ্তানির তালিকায় লোহা ও স্টীল, কেমিক্যাল ও মেশিনারীর সংমিশ্রণ দেখা যায়।

১৯৯০-এর দশকে শেষে এই অঞ্চলের অ-তৈল রপ্তানি দেশগুলি, বিশেষভাবে কিরজিজস্তান ও উজবেকিস্তানে কৃষিতে উন্নতি দেখা যায়। এইসব দেশে কৃষি কাঠামোর সংস্কারে কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি কার্পাস ও গমের বিশ্ববাজার মূল্য বর্ধিত হয়েছে। কিরজিজস্তান যৌথ খামারগুলির বেসরকারীকরণে মনোযোগী হয় এবং নিয়ন্ত্রণ ও পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ ব্যাপকভাবে প্রত্যাহার করে নেয়। সেচ ব্যবস্থায় সরকারী আধিপত্য সরিয়ে নেওয়া হয় এবং সরকারী বিনিয়োগ বাড়ানো হয়েছে। উজবেকিস্তানে সীমিত কৃষি সংস্কার হয়েছে। খাদ্য সুরক্ষা শক্তিশালী করতে ১৯৯০ এর দশকের প্রথমে রাষ্ট্রপতির নির্দেশ আরোপের মাধ্যমে কৃষকদের ক্ষুদ্র এলাকাবিশিষ্ট বাগানগুলিতে শস্য ও শাকসব্জী তৈরির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ১৯৯০ এর শেষে কৃষজ সমবায়গুলির বেসরকারীকরণ হয়। কৃষকরা রাষ্ট্রের নির্দেশ অনুসারে শর্তসাপেক্ষে জমি চাষের অনুমতি পায়। কৃষজ পণ্যের ক্রয়বিক্রয়, মূল্য নির্ধারণ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে হয়।

যাইহোক, মধ্য এশিয়ার ভবিষ্যৎ বিকাশে ভয়ানক প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়, যা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। যথা, সমাজে একটা অপরিণত উৎপাদন ক্ষেত্র দেখা যায়। সম্পদকে ভবিষ্যত

প্রয়োজনের কথা মাথায় না রেখে, কৃষকদের চাহিদা পূরণে এলোমেলোভাবে ব্যবহার করা হয়। জাতীয় সম্পদের অবক্ষয়ে জনগণ অধিক গরীব হতে থাকে। মধ্য এশিয় সরকারগুলি এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে এই সমস্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে উঠে এসেছে।

প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও মধ্য এশিয়ার দেশগুলি নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সর্বোতভাবে উদ্যোগী হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ২০০০-২০০২ সালে, তুর্কমেনিস্তান বিশ্বে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধশালী দেশগুলির একটি হয়েছে। ২০০০ সালে মোট দেশজ উৎপাদনের (gross domestic production) বিকাশ ছিল ১১৮.৬ শতাংশ এবং ২০০১ সালে ১২০.৪ শতাংশ হয়েছে। ২০০০-২০০২ সালে প্রাকৃতিক সম্পদ গ্যাস, তেল ও শক্তির পর্যাপ্ত উৎপাদন হয়েছে। তাছাড়া, কৃষি, বস্ত্র শিল্প, ও পরিবহন যোগাযোগ উন্নয়নের সূচক লক্ষ্যণীয়ভাবে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। মধ্য এশিয়ায় তুর্কমেনিস্তান একমাত্র দেশ, সেখানে ১০ বছরের অধিক সময় ধরে অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। অ-সরকারি ক্ষেত্রের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাও বেড়েছে। পাশাপাশি পরিবেশ সুরক্ষা কর্মসূচীও নেওয়া হয়েছে।

কাজাখস্তানে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ধীরগতিতে হয়েছে। এই দেশের মোট জনসংখ্যার ৪৪ শতাংশ গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করে এবং কৃষি মোট দেশজ উৎপাদনে (GDP) কেবল ৯ শতাংশ অবদান রাখে। শস্য উৎপাদন ১৯৯২ থেকে ১৯৯৮ সালে প্রত্যেক বছর ২০ শতাংশ নিম্নগামী হয়েছে। ১৯৯৮ থেকে ২০০২ সালে শস্য উৎপাদন গড়ে ৪৬ শতাংশ ঊর্দ্ধগামী হয়েছে। গবাদি পশুর সংখ্যা ১৯৯২ সালে ৯ মিলিয়ন থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৯৮ সালে ৩.৯ মিলিয়ন হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারের অভিমুখ দেখা যায় না কিংবা দেখা গেলেও খুব সামান্য, অনুন্নত ব্যাঙ্কিং ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা ও রপ্তানি বাজারের সমর্থনসূচক প্রতিষ্ঠানসমূহের অভাব, উপযুক্ত আঞ্চলিক শক্তি বাজারের ঘাটতি, ভৌগোলিক শর্তাদির জন্য পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন না হওয়া, ব্যয়বহুল ও সেকেলের পরিবহন ব্যবস্থা, বাজার অর্থনীতির জন আইনানুগ ও ধারাবাহিক ব্যবস্থার অভাব এবং সমরূপ বিষয়াদির বিদ্যমানতা দেখা যায়। বিদ্যমান আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের ভাঙন মধ্য এশিয়ার সর্বত্র বর্তমানে সাধারণ বিষয় হয়েছে। যা এই অঞ্চলের দেশগুলির অর্থনীতির তাৎপর্যপূর্ণ অবক্ষয়ের কারণ হয়েছে। এমনকি উৎপাদনে বিকাশ না হওয়ায় বিশ্ব বাজারের সঙ্গে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি।

দারিদ্র্য মধ্য এশিয় দেশগুলির সাধারণ সমস্যা হয়েছে। ধনী ও গরীবের মধ্যে আয় বৈষম্য সমাজের সামাজিক স্তরবিন্যাসের দ্বারা চিত্রিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কাজাখস্তানে পরিবর্তিত সময় শুরু হওয়ার পূর্বে গরিবদের ১০ শতাংশের চারগুণ আয় ধনীদের ১০ শতাংশের ছিল। ১৯৯৮ সালে সেই

পার্থক্য ১০ গুণে দাঁড়িয়েছে। ধনীদের ১০ শতাংশ জাতীয় আয়ের ২৭ শতাংশ পায়, যখন গরিব জনগণের ১০ শতাংশ জাতীয় আয়ের কেবল ২.৩ শতাংশ অর্জন করে।

দারিদ্র্যের মুখ্য প্রভাবসমূহের একটি হল পরিবেশগত অবনমন। গ্রাম ও শহর— উভয় এলাকাতেই পরিবেশগত অবনতি দেখা যায়। নিম্নমানের জীবন ধারণ ও দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে মধ্য এশিয় দেশগুলির সরকার পরিবেশের গুণগতমান পরিবর্তন করতে পারেনি।

কিরজিজস্তানে অর্থনীতির অস্থিরতার কারণে মোট দেশজ উৎপাদন তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাস পেয়েছে। রাষ্ট্রের বিনিয়োগমূলক ক্ষেত্রে অবক্ষয় দেখা যায়। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায় যে, বছরের পর বছর ধরে অর্থনীতির সরকারী ও বেসরকারী মালিকানার অনুপাত তাৎপর্যপূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯৯৯ থেকে ২০০৩ সালে অর্থনীতিতে সরকারের অংশীদার ১৭.৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ১৪.৯ শতাংশ হয়েছে। এবং বিপরীতপক্ষে, বেসরকারী মালিকানার অংশীদার ৮২.৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮৫.১ শতাংশ হয়েছে। ঘটনা হল, কিরজিজস্তানে কৃষিজ উৎপাদন অস্থির আবহাওয়া শর্তাদির ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। তাই উৎপাদনও আনুমানিক হয়ে থাকে।

তাজিকিস্তানের চিত্র চারটি দেশের থেকে পৃথক। দারিদ্র্যের সমস্যা রাষ্ট্রের বৈদেশিক ঋণে ভয়নাক আকার নিয়েছে। পরিণতিতে, দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে ব্যাঘাত এসেছে, সামাজিক ক্ষেত্রের আর্থনৈতিক দিক হ্রাস পেয়েছে, এবং বিনিয়োগে ঘাটতি এসেছে। তাজিকিস্তান ৮৭৩.৭ মিলিয়ন আমেরিকান ডলারের কাছাকাছি বৈদেশিক ঋণে নিজেকে সংযুক্ত করেছে। এই ঋণ দেশের উৎপাদনের (GNP) ৪২ শতাংশ তৈরি করেছে। উজবেকিস্তানে কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি দেখা যায়। কার্পাস উৎপাদনে বিশ্বে নিজের চতুর্থ স্থানটি ক্রমশ হারিয়েছে।

মধ্য এশিয়া সম্পূর্ণভাবে বা প্রায় সম্পূর্ণভাবে স্থলবেষ্টিত অঞ্চল। এই অঞ্চলের চারপাশে কতিপয় বিশ্বের দ্রুত বিকাশশীল অর্থনীতির দেশ যথা, রাশিয়া, চীন ও ভারত রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে, মধ্য এশিয়ার নীতি প্রণেতারা কতিপয় কাজের প্রাথমিক পদক্ষেপ নিয়েছে। মধ্য এশিয়া ও চীনের মধ্যে গ্যাস পাইপলাইন সংযোগের কাজ শুরু হয়েছে ২০০৩ সালে। এই পাইপলাইনের সাহায্যে তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান ও চীন সংযুক্ত হয়েছে। সোভিয়েত শাসনের অবসানের পর বহুজাতিক সংস্থা ও আঞ্চলিক সংগঠনগুলো এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহযোগিতা করেছে। যাদের মাধ্যমে এই অঞ্চলের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়েছে ও বিদেশী বিনিয়োগ এসেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এশিয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (Asian Development Bank) কিরজিজস্তানের সঙ্গে

চীন ও অন্যান্য মধ্য এশিয় দেশগুলির পরিবহন যোগাযোগ স্থাপনে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। এছাড়া ইউরোপিয় ইউনিয়নের পরিবহন সংযোগ ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে ১৯৯৩ সালে।

বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (FDI) মধ্য এশিয়ায় প্রযুক্তি, নীতি অঙ্কন ও রূপায়ণে বিশেষজ্ঞসহ পরিচালক পারদর্শিতার আমদানির মাধ্যমে শ্রম উৎপাদন ও রপ্তানিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। গুরুত্বপূর্ণভাবে এও উল্লেখ্য যে, মধ্য এশিয়ায় বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বছরের পর বছর ধরে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে উঠে এসেছে। এই বিনিয়োগ রাশিয়া, চীনসহ অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে হয়েছে। অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ প্রাথমিকভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর হয়েছে। তবে কেবল প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর হয়নি, কাজাখস্তানে নির্মাণ, আর্থিক পরিষেবা, ধাতু উৎপাদন ও ধাতু শোধন প্রক্রিয়া ও কৃষিজ ব্যবসার ন্যায় অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ দেখা যায়।

যাইহোক, ১৯৯১ সালে মধ্য এশিয়ার দেশগুলি নতুন ভাবে পরিচিতি পাওয়ার সময় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আঘাত পেয়েছে। যথা-সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেঙ্গে যাওয়ার ঘটনা, কেন্দ্রীভাবে পরিকল্পিত নির্দেশমূলক অর্থনৈতিক কাঠামোর অবলুপ্তি ও উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি। পরিণতিস্বরূপ, ১৯৯০ এর দশকের মধ্য এশিয়ার দেশগুলি তাৎপর্যপূর্ণভাবে অর্থনৈতিক নিম্নগামীতার অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং তাদের প্রতিযোগীদের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। ১৯৯২-২০০০ সালের মধ্যে মোট জাতীয় উৎপাদনের নিরিখে প্রায় ৩০ শতাংশ জনগণ কর্মহীন হয়েছে। তবে ২০০০-২০০৮ সালে মধ্য এশিয়ায় মোট জাতীয় উৎপাদন নাটকীয়ভাবে গড়ে ৮৫৯ আমেরিকান ডলার থেকে ১৪১০ আমেরিকান ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে। এই চিত্রের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কিভাবে এই অঞ্চল নিজেদেরকে আঘাত থেকে পুনরুদ্ধার করেছে। তাছাড়া এও দেখা যায় যে, এই অঞ্চলে শ্রম সম্পদের তাৎপর্যপূর্ণভাবে পুনঃবণ্টন। উৎপাদন থেকে চাকরির ক্ষেত্রে একদিকে এবং অন্যদিকে, কৃষিক্ষেত্রে শ্রম সম্পদের পূনঃবণ্টন দেখা যায়।

৩.৫ সিদ্ধান্ত

চূড়ান্ত বিচারে, মধ্য এশিয়া রণনীতিগতভাবে পূর্ব এশিয়া ও ইউরোপ এবং দক্ষিণ এশিয়া ও রাশিয়ার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। মধ্য এশিয়ায় বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। তবুও এই অঞ্চল নিজের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে অনুসন্ধান করেছে। বাজার অর্থনীতিতে নিজেদের পরিবর্তনের সময় থেকে এই অঞ্চলের দেশগুলি অর্থনীতিতে বিকেন্দ্রীকরণের দিকে স্পষ্টতঃই এগিয়েছে। বাজার

অর্থনীতিমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহ তৈরী করেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যোগাযোগ বর্ধিত করেছে এবং উৎপাদন ও বাণিজ্যের সম্প্রসারণ করেছে। বৃহদাকার জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, উচ্চ পণ্য মূল্য ও শক্তিশালী বিদেশী অন্তর্বাহ-এর কারণে এই অঞ্চলে ২০০১-২০০৭ সালের মধ্যে প্রায় দ্বিগুণ হারে বিকাশ হয়েছে। পরবর্তী সময়ে বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের উন্মেষে এই অঞ্চলের গড় বিকাশ ২০০৮-২০০৯ সালে ৫.৭ শতাংশ থেকে ১.২ শতাংশে নেমে আসে। আবার, তুর্কমেনিস্তান ও উজবেকিস্তান আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সীমিত যোগাযোগ, দীর্ঘমেয়াদী শক্তি সম্পদের চুক্তি, ও সমর্থনসূচক সরকারী নীতির কারণে সম্পদ রপ্তানী করতে পারেনি। তবে পরবর্তী সময়ে শক্তি সম্পদের জন্য বিশ্ববাজারের দাবী বারংবার বর্ধিত হয়েছে। যা এই সমস্ত দেশের অর্থনীতি গড়ে উঠতে সহায়ক হয়েছে। কিরজিজস্তান ও তাজিকিস্তান-এর ন্যায় অ-শক্তি সম্পদ রপ্তানি দেশগুলিতে রাশিয়া থেকে অর্থ আসা কমে যাওয়ায় এবং রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য হ্রাস পাওয়ায় জীবন যাত্রার মান নিম্নগামী হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যৎবাণী করেন যে, মধ্য এশিয়ার সংস্কার, অর্থনৈতিক সম্ভাবনার সহায়ক ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এই অঞ্চলের অধিক দ্রুত উন্নয়ণ নিয়ে আসতে পারে আগামী দিনগুলিতে।

৩.৬ সংক্ষিপ্তসার

মধ্য এশিয়ার পাঁচটি দেশই বর্তমানেও বাজার অর্থনীতিতে উত্তরণের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে মধ্য এশিয়া রাশিয়া, চীন, ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাছে ব্যবসা বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ স্থান হয়ে উঠবে। যা এই অঞ্চলের আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করবে।

৩.৭ অনুশীলনী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

১. সোভিয়েত-উত্তর সময়কালীন মধ্য এশিয়ায় অর্থনৈতিক উত্তরণের প্রক্রিয়া আলোচনা করুন।

২. মধ্য এশিয়ার সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রসমূহের রণনীতির ব্যাখ্যা দিন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী

১. ১৯৯০ এর দশকের শেষে উজবেকিস্তান ও কিরজিজস্তানে চালু হওয়া কৃষিজ সংস্কারের ওপর মন্তব্য লিখুন।

২. মধ্য এশিয়ার প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক শূন্যতা ধারণা বলতে কি বোঝায়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. মধ্য এশিয়ার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের পরিচয় দিন।

২. টীকা লিখুন—মধ্য এশিয়ার শিল্প।

৩.৮ তথ্যসূত্র

K. Warikoo and Mahavir Shingh (ed.) (2004). *Central Asia : Since Independence*, Delhi, shipra Publication.

Boris Rumer, Stanislav Zhukov (2003), *Central Asia: The Challenges of Independence*, Delhi, Akar Books.

Boris Rumer(ed.)(2003), *Central Asia in Transition : Dilemmas of Political and Economic Development*, Delhi, Aakar Books.

Pavline Jones Luong (2003), *The Transformation of Central Asia : States and Societies form Soviet Rule ot Independence*, London, Cornell University Press.

Boris Rumer(ed.)(2003), *Central Asia : A Gathering Storm?*, Delhi, Aakar Books.

একক—৪ ❑ মধ্য এশিয়ায় ইসলাম ও গণতন্ত্র

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ ভূমিকা

৪.৩ ইসলামে রাজনীতির ভূমিকা

৪.৪ মধ্য এশিয়ায় ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে ভারসাম্য

৪.৫ সিদ্ধান্ত

৪.৬ সংক্ষিপ্তসার

৪.৭ অনুশীলনী

৪.৮ তথ্যসূত্র

৪.১ উদ্দেশ্য

সাম্প্রতিক কালে মুসলিম সমাজগুলিতে গণতন্ত্রের ওপর বিতর্ক গুরুত্ব পেয়েছে। প্রখ্যাত তাত্ত্বিক ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা (Francis Fukuyama) উল্লেখ করেন, ইসলামের মৌলবাদীরা সাম্প্রতিক সময়ে প্রভাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিম সমাজগুলিকে বিশেষভাবে আধুনিকতা ও গণতন্ত্রের প্রতিরোধশক্তি হিসেবে তৈরি করেছে। ইন্দোনেশিয়ার ইসলামীয় বুদ্ধিজীবী মহম্মদ সিদ্দিক আল-জয়ি (Mohammad Shiddiq Al-Jawi) মন্তব্য করেন যে, মুসলিম সমাজ ইসলামীয় বিশ্বাসের প্রেক্ষিত থেকে গণতন্ত্রের মূল্যায়ন করবে এবং গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকে ইসলামে প্রদর্শিত স্বাধীনতার সঙ্গে তীক্ষ্ণ সংঘাতে দেখবে। এই প্রেক্ষাপটে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ক. মধ্য এশিয়ায় গণতন্ত্রের মর্যাদা অনুসন্ধান করা।

খ. এই অঞ্চলে ইসলামের স্বরূপ আলোচনা করা।

গ. ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক অনুধাবন করা।

৪.২ ভূমিকা

২০০১ সালের ৯/১১ ঘটনার পর মুসলিম রাজনীতির ওপর বিশ্বের মনোযোগ অধিক কেন্দ্রীভূত হয়েছে। নিউ ইয়র্কের ঘটনার পর ইসলাম ও মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে একগুচ্ছ প্রশ্ন উঠেছে। তৎকালীন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লিউ. বুশ বিশ্ব বাণিজ্য সেন্টারের উপর আক্রমণকে মানুষের স্বাধীনতার ওপর আক্রমণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এই ঘটনা সশস্ত্র অসহিষ্ণু ইসলাম ও উদারনৈতিক সমাজের মূল্যবোধসমূহের, এবং গণতন্ত্র ও কর্তৃত্বমূলক শাসন প্রণালীর মধ্যেকার সংঘর্ষকে প্রকাশ করেছে। ইসলামের সঙ্গে গণতন্ত্রের সহাবস্থান বিষয়ে কিছু মৌলিক প্রশ্ন জনসমক্ষে উঠে এসেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, জয়া হাসান (Zoya Hassan) প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন 'মুসলিম সমাজের প্রথা থেকে স্বতন্ত্র গণতন্ত্র' (Is democracy the exception rather than the norm in Muslim Societies?) বিষয়ে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন। এশিয়ার অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে বলেন যে, গণতন্ত্র বিভিন্ন প্রবিবেশে বাস্তবে কাজ করতে পারে। হাসানের অভিমত অনুসারে, হিন্দুদের সহিত ব্যাপক মুসলিম জনসংখ্যার সহবস্থানে ভারতের গণতন্ত্রের সাফল্য দেখা যাবে তখনই, যখন মুসলিমরা অধিক উৎসাহী অংশগ্রাহীর ভূমিকা সহযোগে কাজ করবে। এক্ষেত্রে বহুত্ববাদ ও সাম্যতার ওপর জোর দেওয়া হয়।

এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উল্লেখ্য যে, প্রতিযোগিতামূলক ও দল-ভিত্তিক নির্বাচনসমূহ মুসলিম বিশ্বের রাজনীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য নয়। পরিণতিস্বরূপ, প্রভাবশালী অভিমত উল্লেখ করে যে, মুসলিম সমাজের ধর্ম হিসেবে ইসলামের সামাজিক রাজনৈতিক ধারণা প্রাতিষ্ঠানিক ঘাটতির জন্য দায়ী। এই অভাব সরকারের রূপ হিসেবে গণতন্ত্রের জন্য অভিমত প্রকাশ থেকে এই সমাজগুলিকে বিরত রাখে। এই ধারণা ৯/১১ ঘটনা পরবর্তী সময়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে অধিক সুস্পষ্ট হয়েছে।

৪.৩ ইসলামে রাজনীতির ভূমিকা

ইসলাম ও গণতন্ত্রের ভারসাম্য অনুধাবনে, ইসলামে রাজনীতির ভূমিকা দেখা হয়। রাজনীতি একটি উদ্দেশ্যবোধক শব্দ, যা বহুজনের কাছে বহু বিষয় উল্লেখ করে। রাজনীতির সাধারণ অর্থ হল মানব জাতির সবার কল্যাণের জন্য সামর্থ্য। ধর্ম হিসেবে ইসলাম যখন জনগণের জীবনধারণের ওপর জোর দেয়, তখন রাজনীতি জনগণের জীবনধারণের মৌলিক ভিত্তির ওপর বিকাশ লাভ করে। যদিও একজন এই অভিমত রাখতে পারেন যে, ধর্মীয় অনুশাসনকে ব্যক্তির জীবননির্বাহের প্রেক্ষিতে দেখা হয়, সম্প্রদায়

ও রাষ্ট্রের শাসন প্রণালীর নিরিখে দেখা উচিত নয়। তবে এরূপ যুক্তি গ্রহণ যোগ্য নয়, কারণ, ইসলাম ইসলামীয় সম্প্রদায়ের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য। কোরানের (Quran) মূল কাঠামোয়, রাজনীতির ইসলামীয় অর্থ জনস্বার্থের নীতির ভিত্তিতে তৈরি সংগঠনকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা। আরবীয় সাহিত্যে ইসলাম বলতে জীবন ধারণের উপায়কে বোঝায়। ধর্মগুরু মহম্মদের ব্যাখ্যায় আল্লার (ALLAH) আইনি অনুশাসন অনুসারে, ইসলামীয় রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হল 'খারাপ' (Evil) -কে দূর করা এবং 'ভাল' কে প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামীয় রাষ্ট্র কিংবা প্রজাতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তি কোরান হওয়া উচিত এবং সে কারণে উপজাতীয়বাদ কিংবা জাতীয়তাবাদের যে কোনরূপ সুদৃঢ়ভাবে নিন্দিত এবং প্রতিরোধ হবে। এইভাবে ইসলামকে রাজনীতি ও জাতিস্বত্বার আধুনিক অনুধাবনের সঙ্গে সহবস্থানের নিরিখে দেখা হয়।

ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানের পর উদারনীতিবাদের সাফল্যের প্রেক্ষিতে বহু তাত্ত্বিক সামনে আসেন। কমিউনিজমের উর্দ্ধে উদারনৈতিক পুঁজিবাদী সামাজের স্পষ্টতঃ বিজয়ে সমাজবাদী নীতির ভিত্তিতে শাসিত সমাজগুলিতে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শূন্যতা তৈরি হয়েছে। পশ্চিমী উদারনৈতিক পুঁজিবাদী মডেল পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের অবক্ষয়ে তৈরি হওয়া শূন্যতা পূরণ করে। তবে মুসলিম বিশ্ব নাগরিকদের সংঘাতের (Clash of Civilisations) তত্ত্বের বিকাশে নেতৃত্ব দিতে পারে এরূপ তত্ত্বের বৈধতাকে কোন তাত্ত্বিক গ্রহণ করতে পারেনি। পশ্চিমের বহু তাত্ত্বিক গণতন্ত্রের প্রতিবন্ধক হিসাবে ইসলামকে ভর্ৎসনা করেছে। ইসলামিক রাষ্ট্রের স্থাপন সংক্রান্ত যে কোন আলোচনা পশ্চিমে সর্বাত্মক ব্যবস্থার পত্তন হিসাবে বিবেচ্য হয়েছিল। মুসলিমরা এরূপ ব্যাখ্যাকে ভিত্তিহীন হিসাবে সম্পূর্ণরূপে নিন্দা করেছিল। এই পটভূমিতে মধ্য এশিয়ার ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

পশ্চিমী মতাদর্শের সম্প্রসারণে ইসলামীয় বিশ্ব গণতন্ত্রের নতুনধরনের ধারণাকে সামনে আনে, যার মূল উৎস কোরান (Quran)। গণতন্ত্রের পশ্চিমী অর্থ অত্যাবশ্যকভাবে উল্লেখ করে, সরকার 'জনগণের' (of the people) 'জনগণের দ্বারা' (by the people) ও 'জনগণের জন্য' (for the people)। ইসলামীয় আন্দোলন সরকারের এই ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে, কারণ সমাজের ইসলামীয় নির্দেশের মৌলিক ভিত্তির বিরুদ্ধ মত পশ্চিমী ধারণা অনুসারে, সরকার জনগণের অধীনস্ত ও বশীভূত হয়। এই অর্থে, জনগণ যদি চায় তাহলে সরকারকে অপসারণ করার অধিকার ভোগ করে। গণতন্ত্রের পশ্চিমী ধারণা ঈশ্বরের ইচ্ছার পূর্বে জনগণের ইচ্ছাকে বসায়। ইসলামে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রাথমিক স্থানের মর্যাদা

পায়। ইসলাম প্রত্যেকের সৃষ্টিকর্তা ও সুরক্ষাকারী। ইসলাম অনুসারে, মানবজাতি তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কেবল ঈশ্বর নির্দেশিত পথে পূরণ করতে পারে। ধর্মগুরু ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করে এবং সেকারণে তিনি জনগণের উর্দ্ধে। তবে এও বলা যায় না যে, ইসলাম গণতন্ত্র ও আইনের অনুশাসনের বিরুদ্ধ।

আরবীয় শব্দ 'ইসলাম' ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পনকে উল্লেখ করে। যদিও সেক্ষেত্রে ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে ইসলামের মতানৈক্য দেখা যায়। পশ্চিমে ইসলাম ও পাশ্চাত্য মূল্যবোধের মধ্যে মজ্জাগত দ্বন্দ্ব নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। এই বিতর্কে অধিক স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, ইসলাম গণতন্ত্রের সহজাত শত্রু হয়েছে। *The clash of Civilization and the Remaking of world order* গ্রন্থে স্যামুয়েল পি. হানটিংটন (Samuel P. Huntington) লিখলেন যে, "মুসলিমরা একমত যে তাদের সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান" (Muslims agree that a basic difference exists between their culture and western culture)। তাঁর অভিমত, এই 'মৌল পার্থক্য' (basic difference) পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে তাদের হিংসাত্মক সংঘাতে নেতৃত্ব দেবে। তাঁর আরও অভিমত, "পশ্চিমের জন্য সমস্যা অনুভূতি ইসলামীয় মৌলবাদ নয়। বিষয়টা হল ইসলাম" (The underlying problem for the west is not Islamic fundamentalism. It is Islam.)

মধ্য এশিয়ায় ১৯৮০ এর দশকের শেষে মিখাইল গর্বাচভের (Mikhail Gorbachev) গ্লাসনস্ট নীতিতে (Policy of glasnost) ইসলাম পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল, যা সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীনস্ত সময়কালীন সমস্যা থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথকভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। তবে, গ্লাসনস্ট (glasnost) ধর্মীয় বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের অনুমোদক নীতি হয়েছে। পরিণতিতে, ধর্মের প্রতি সোভিয়েত সরকারের মনোভাবে পরিবর্তন এসেছে। মধ্য এশিয়ার মুসলিমরা সুস্পষ্টভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতার দাবী জানায়। এই অঞ্চলে ইসলামীয় প্রতিবাদের প্রথম বহিঃপ্রকাশ হয়েছে ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে, যখন রাজধানী তাসখন্দে উজেবক ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ সামনে এসেছে। বিক্ষোভ চলাকালীন কিছুজন সবুজ ব্যানার তুলে ধরেছে এবং কোরান পাঠ করেছে। মুসলিমদের দ্বারা দ্বিতীয় বিক্ষোভ তাসখণ্ডে মুসলিমদের মধ্যে এশিয়ার ধর্মীয় বোর্ডের প্রধান মুফতি (Mufti)-র পদত্যাগ দাবীতে হয়েছে। এবং কাজাখস্তানে Shamsidim Babakhanov ইসলামের নিয়ম নীতির সামগ্রিক লঙ্ঘনে অভিযুক্ত হয়েছিল। Babakhanov-এর পদত্যাগে তাঁর পরিবারের প্রায় চার দশকের বংশগত শাসনের অবসান হয়েছিল।

৪.৪ মধ্য এশিয়ায় ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে ভারসাম্য

মধ্য এশিয়ার গণতান্ত্রিক পরিবেশের প্রেক্ষিতে বলা যায়, এই অঞ্চল বিশ্বের অধিক দমনাত্মক অঞ্চলগুলির একটি। তবে অঞ্চলটি গণতন্ত্রীকরণের প্রতি নিজের মনোযোগ স্পষ্ট করেছে। এরই পাশাপাশি বলা যায়, মধ্য এশিয়ার দেশগুলি বহু দিক থেকে পরস্পরের পৃথক। তাই সব দেশে গণতন্ত্রের পরিবেশ সমানভাবে নেই, যা গণতন্ত্রের সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। ২০০৭ সালে ইউরোপিয় ইউনিয়ন (EU) মধ্য এশিয়ায় গণতন্ত্র, মানবাধিকার, আইনের শাসন ও সুশাসন রূপায়ণের কৌশল নেয়। এই প্রেক্ষিতে, ইউরোপিয় ইউনিয়ন (EU) বিভিন্ন প্রকার যথা সুশাসন, সংসদীয় সংস্কার, রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য সামর্থ্য তৈরি ইত্যাদির ওপর জোর দেয়। কিন্তু এই পর্যন্ত, পরিণতি হতাশাব্যঞ্জক হয়েছে। এই অঞ্চলে গণতন্ত্র রূপায়ণে UNDP-ন্যায় সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিলেও বাস্তব পরিস্থিতির উন্নয়ন হয়নি। যাইহোক, ২০১০ সালে কিরজিজস্তানে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অনুসরণের প্রতি ঝোঁক দেখা যায়, যা এই অঞ্চলকে মধ্য এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল থেকে পৃথক করেছে। এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, মধ্য এশিয়ার গণতান্ত্রিক পরিবেশের সাধারণ মূল্যায়নে প্রত্যেক দেশের পৃথক পৃথক অনুধাবন আবশ্যক।

কাজাখস্তানে তেল ও গ্যাস রপ্তানির কারণে অর্থনৈতিক বিকাশ হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত গণতন্ত্র খুবই সীমিত আকারে গড়ে উঠেছে। দেশটিতে দীর্ঘদিন কর্তৃত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা বিরাজ করেছে। ২০১০ সালের এপ্রিল মাসে জনগণের প্রতিবাদে সেই শাসন ব্যবস্থার অবসান হয়। এই সময় প্রত্যাশা করা হয়েছিল যে, মুক্ত পৌর সমাজ গণতান্ত্রিক পরিবেশ স্থাপনে আবির্ভূত হয়েছে। তবে ঐ বছরের জুন মাসে দেশের দক্ষিণে জাতিগোষ্ঠী সমূহের মধ্যে সংঘতে গণতান্ত্রিক পরিবেশের বিকাশ ব্যাহত হয়েছে এবং রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা রাষ্ট্রের ভঙ্গুরতাকে জোরালো করেছে। তৎসত্ত্বেও সংবিধানের বিভিন্ন অংশ সংশোধন হয়েছে এবং কাগজে কলমে কাজাখস্তানে সংসদীয় গণতন্ত্র স্থাপিত হয়েছে।

তাজিকিস্তানে ১৯৯৭ সালে গৃহযুদ্ধের অবসানের পর রাষ্ট্রপতি Emomali Rahmon ক্ষমতায় এসে কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেন। দেশের সংসদে প্রকৃত বিরোধী দল, the Islamic Renaissance Party গড়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও ইসলামের বিকাশে দেশে অস্থিরতার উন্মেষ হয়েছে এবং সরকার বিরোধীদের প্রতি অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছে। তাছাড়া, দেশে ব্যাপক দুর্নীতি ও বিভিন্ন নিরাপত্তা ভীতিসমূহ দেখা যায়। দুর্নীতির উচ্চতর বিকাশ দেশের ভিত্তিকে দুর্বল করেছে।

ঘটনাক্রমে, তাজিকিস্তান ও কিরজিজস্তান হল এই অঞ্চলের দুটি দরিদ্র দেশ এবং তারা দীর্ঘমেয়াদী গণতন্ত্রকে সীমিত স্থান দিয়েছে। কাজাখস্তান আনুষ্ঠানিকভাবে অধিক উন্মুক্ত সমাজ অভিমুখে সীমিত পদক্ষেপ অনুসরণ করেছে। আমেরিকা (US), ইউরোপিয় ইউনিয়ন (EU) ও ভারতের ন্যায় বিদেশী শক্তিগুলো এই অঞ্চলের গণতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। বিতর্কের বিষয় হল যে, মধ্য এশিয়ার নেতৃবর্গ গণতন্ত্রকে নিজেদের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভীতি হিসাবে দেখেছে। গণতন্ত্রের ধারণা উচ্চবিত্তদের স্বার্থের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তারা গণতন্ত্রকে তাদের পদমর্যাদার সামনে চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখেছে। এই কারণে মধ্য এশিয়ার নেতৃবর্গ গণতন্ত্রের ওপর গুরুত্ব আরোপ থেকে রাষ্ট্রপতি নির্ভরশীলতার ওপর জোর দিয়েছে। তাই বলা যায়, ২০১১ সালের ইসলামীয় কনফারেন্সের সংগঠনের সভাপতি হিসেবে কিরজিজস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান Nursultan Nazarbayev-এর দায়িত্বে তাঁর দেশের ভাবমূর্তি অধিক সম্প্রসারিত হয়েছে। কাজাখস্তানের গণতান্ত্রিক সম্ভাবনা উজবেকিস্তান ও তুর্মমেনিস্তানের তুলনায় অধিক উজ্জ্বল, উজবেকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানের নাগরিকদের স্বাধীনতার মান বিশ্বের নয়টি 'নিকৃষ্টতমের নিকৃষ্টতম' (worst of worst)-এর মধ্যে বিবেচিত হয়। উজবেকিস্তান গোড়া থেকেই রাষ্ট্রপতি Islam Karimov-এর নেতৃত্বে পুলিশ রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। উজবেকিস্তানের সঙ্গে তার প্রতিবেশী সকল দেশের সম্ভাবনাপূর্ণ সমস্যা তৈরি হয়েছে। এবং ২০০৫ সালে আঁধিযান (Andijan) ঘটনার পর নেতিবাচক ভাবমূর্তি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। আঁধিযানের ঘটনায় প্রতিবাদকারীদের শতাধিক নিহত হয়েছে। তুর্কমেনিস্তানে রাষ্ট্রপতি Gurbanguly Berdymukhamedov তাঁর নিজস্ব ক্ষমতা ভিত্তি তৈরি করেছে। ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে রাষ্ট্রপতি Saparmurat Niyazov-এর হঠাৎ মৃত্যুর পর তাঁকে অনুসরণ করে Berdymukhamedov তুর্কমেনিস্তানে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়েছে। এক্ষেত্রে পূর্বতন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে পরবর্তী রাষ্ট্রপতির ভাবনায় কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। দেশটিতে কোন স্বাধীন পৌরসমাজ কিংবা রাজনৈতিক বিরোধীদের বিদ্যমানতার অভাব সত্ত্বেও এক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক উন্নয়ন দেখা যায় যে, Berdymukhamedov ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধী প্রার্থীদের স্বীকৃতি দিয়েছে। তা স্বত্ত্বেও তুর্কমেনিস্তান বিশ্বে অধিক বিচ্ছিন্ন ও দমনমূলক দেশসমূহের অন্যতম হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

কিরজিজস্তানের শাসনব্যবস্থায় ২০০৫ সালের পর ২০১০ সালে দ্বিতীয়বার পরিবর্তন দেখা যায়। রাষ্ট্রপতি Askar Akayev Kurmanbek Bakiyev দ্বারা অপসারিত হয়েছে। এই ঘটনাকে প্রকৃত গণ বিদ্রোহের থেকে আকস্মিক অভ্যুত্থান হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এই আলোচনার প্রেক্ষিতে, গবেষকদের অভিমত যে, মধ্য এশিয়ার দারিদ্র, নতুন প্রজন্মের সামনে সুযোগের অভাব, ও আন্তঃরাষ্ট্র অস্থিরতাসহ নিরাপত্তার আধুনিক ধারণার ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তাছাড়া, মধ্য এশিয়ার জনগণের সামনে ব্যাপকতম ভয় হল তাদের নিজস্ব শাসনব্যবস্থা, যা জনগণকে দমন করে এবং রাষ্ট্র ও নাগরিকদের নিরাপত্তার উর্দ্ধে শাসন প্রণালীর নিরাপত্তাকে স্থান দেয়।

৪.৫ সিদ্ধান্ত

মধ্য এশিয়ার পাঁচটি দেশের শাসনব্যবস্থায় গণতন্ত্রের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান সমূহের বিকাশ হয়েছে, কিন্তু গণতন্ত্রের অনুশীলন যথাযথভাবে হয়নি। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, আইনানুগ ব্যবস্থা কালো ও সাদাতে শক্তিশালী কিন্তু বাস্তবে কিঞ্চিৎভাবে রূপায়িত হয়েছে। এই সকল রাষ্ট্রে বাস্তবে গণতন্ত্রের ছদ্ম রূপ দেখা যায়। পরিণতিস্বরূপ, পার্লামেন্ট ও বিচার বিভাগ কাগজে কলমে ক্ষমতার মূল বিভাগ হিসাবে বিদ্যমান। এবং নাগরিকদের রাষ্ট্রগঠনের অনুভূতি দান করে। উচ্চবিত্তরা তাদের নিজস্ব সামাজিক রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতেও রাজনীতিতে ইসলামকে সক্রিয় রাখতে প্রায়শঃই গুরুত্বপূ ভূমিকা নিয়েছে।

৪.৬ সংক্ষিপ্তসার

সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, মধ্য এশিয়ায় গণতন্ত্রীকরণের জন্য ভবিষ্যৎ রূপরেখা সুস্পষ্ট নয় এবং অস্থিরতার কারণে এই অঞ্চলের নিরাপত্তার বিপদ ক্রমবর্ধমান। সমাজ ব্যবস্থায় গণতন্ত্রীকরণের বিস্তার, মানুষের অধিকারের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন ও নাগরিকদের সঙ্গে নাগরিকদের সংযোগ বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে বাইরের শক্তিসমূহের অনুপ্রবেশকে প্রাসঙ্গিক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তবে মধ্য এশিয়াকে গণতন্ত্রের জন্য অনুর্বর মাটি হিসেবে দেখা যাবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের গঠনমূলক ভূমিকা নেওয়া উচিত।

৪.৭ অনুশীলনী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

১. মধ্য এশিয়ার রাজনীতিতে ইসলামের ভূমিকা আলোচনা করুন।

২. মধ্য এশিয়ার ইসলাম ও রাজনীতির মধ্যে সংযোগকে আপনি কিভাবে বিচার করবেন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী

১. ইসলামের সামাজিক-রাজনৈতিক ভাবসত্তার ওপর মন্তব্য করুন।

২. "Democracy is the exception rather then norm in Muslim Societies"—ধারণাটি ব্যাখ্যা দিন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. 'ইসলাম' শব্দের অর্থ লিখুন?

২. মধ্যএশিয়ার গণতন্ত্রের প্রকৃতি উল্লেখ করুন।

৪.৮ তথ্যসূত্র

Zoya Hassan (ed.) 2007. *Democracy in Muslim Societies* : The Asian Experience, Los Angels, Sage Paublications.

Surya Narayan Yadav. 2010. *Post-Soviet Dynamics of Central Asia*. New Delhi, Inanada Prakashan.

পর্যায় - ৩

এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চল

একক ১ এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের ধারণা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে তার তাৎপর্য

একক ২ নির্বাচিত কিছু এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের রাষ্ট্রে কর্তৃত্ববাদ, সামরিক-অসামরিক সম্পর্ক ও তাদের গণতান্ত্রিকরণের সম্ভাবনা ঃ ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স ও উত্তর কোরিয়া

একক ৩ এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের আর্থ-রাজনীতি

একক ৪ এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলে নৃকুলগত (Ethnic) সমস্যাসমূহ

পর্যায় - ৩ : এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চল

একক—১ ❑ এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের ধারণা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে তার তাৎপর্য

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ ভূমিকা

১.৩ এশিয়া প্রশান্ত ধারণাগত পরিচিতি

১.৪ এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের মৌলিক বৈশিষ্ট্য

১.৪.১ এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ

১.৪.২ এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

১.৪.৩ এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা

১.৫ আন্তর্জাতিক সম্পর্কে এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

১.৬ সারংসক্ষেপ

১.৭ নমুনা প্রশ্নমালা

১.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্যগুলি হল—

- এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চল সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা গঠনে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা।
- এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের বিশেষত্ব সম্পর্কে জ্ঞানলাভে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা।
- এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলির চরিত্র বিশ্লেষণে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা।
- এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা সমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা গঠনে সহায়তা করা।
- আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনুধাবনে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা।

১.২ ভূমিকা

এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চল বর্তমানে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই গুরুত্বের অন্যতম কারণ এই অঞ্চলের ব্যাপ্তি ও তার নিজস্বতা। এই অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সহযোগিতা ও বিরোধ পৃথিবীর অন্য অংশের উপর প্রভাব ফেলে। এই অঞ্চল পৃথিবী মোট ভূভাগের ২২% দখল করে আছে, সমগ্র বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৬১% মানুষ এই অঞ্চলের বাসিন্দা। এই তথ্য সহজেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় এই অঞ্চলের প্রতি গুরুত্বের ইঙ্গিত বহন করে। এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে নানাক্ষেত্রে বৈচিত্র বিদ্যমান—ভূ-প্রকৃতি, জনবিন্যাস, মতাদর্শ, শাসনব্যবস্থা, অর্থনীতি, জাতীয়তা, ধর্ম, সংস্কৃতি, উন্নয়ন-অনুন্নয়ন, ঐতিহ্য সমস্ত ক্ষেত্রেই বৈচিত্র্যের ছাপ স্পষ্ট। এই কারণেই এই অঞ্চলে একদিকে নানা বিতর্ক বিদ্যমান আবার তাদের মধ্যে সহযোগিতার প্রচেষ্টাও লক্ষ্যণীয়। এই সমস্ত কিছুই বিশ্বের আগ্রহ তৈরী করে।

১.৩ এশিয়া প্রশান্ত ধারণাগত পরিচিতি

এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চল পশ্চিম প্রশান্ত সাগরে অবস্থিত। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ছাড়া প্রশান্ত সাগরের ওসানিয়া অঞ্চল এর অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তীতে রাশিয়া, দুই আমেরিকার পূর্ব উপকূলবর্তী এলাকা এতে যোগ করা হয়। তার প্রাতিষ্ঠানিক প্রমাণ হল এ্যাপেক (APEC) যেখানে কানাডা, পেরু, চিলি, মেক্সিকো, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সকলেই সদস্য। এর থেকে একটি ধারণার সৃষ্টি হয় যে 'এশিয়া প্রশান্ত' এর মতন অঞ্চল এবং এইরকম অন্যান্য অঞ্চল নিতান্তই কার্যপ্রধান ধারণা যদিও বা তার ভৌগোলিক তাৎপর্য একেবারে খারিজ করা যায় না। একইভাবে পূর্ব এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া, মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়া প্রায় কার্য প্রধান ধারণা। কার্য প্রধান ধারণাগুলি কোন কোন রাষ্ট্রের সুবিধে ও স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সৃষ্ট। ফলে তারা ভৌগোলিক অনুশাসন মানেনা বরঞ্চ কার্যবাহী সুবিধা ও সুযোগই তাদের মূল লক্ষ্য। সেই যুক্তিতে এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চল পূর্ব এশিয়াকে বৃহত্তর প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়াস বলা যেতে পারে। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য এশিয়া প্রশান্ত ধারণাটি উপযুক্ত। মনে রাখতে হবে যে কোনভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না; অথচ, এশিয়ায় তার যথেষ্ট স্বার্থ আছে, আগ্রহও বটে। ফলে এশিয়া প্রশান্ত ধারণাটির মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার স্থায়ী উপায় তৈরী করেছে। একইভাবে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড এশিয়া প্রশান্ত ধারণাটির সমর্থন করে; ধরে নিতে হবে তাদেরও কিছু স্বার্থ আছে। জাপানের এই ধারণাটিকে সমর্থনের পিছনে মার্কিনী সান্নিধ্যই অনুমান করা যায়। অবশ্য জাপান বহুপাক্ষিকতার সমর্থক বলে মনে করা হয়, কারণ তারা শুধুই মার্কিন-নির্ভর হয়ে থাকতে চায় না। সেক্ষেত্রে এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের ধারণাটি সেই বহুপাক্ষিকতার প্রতিচ্ছবি।

মার্কিন-এশিয়া সম্পর্কে প্রেক্ষিতে মনে রাখতে হবে যে অন্যান্য ধারণাগত নির্মাণও আছে। এশিয়া প্রশান্ত কখনই সম্পূর্ণ এশিয়া নয়, কারণ তাতে কেবল প্রশান্ত তীরবর্তী অঞ্চলই বোঝায় যেমন পূর্ব উল্লেখিত উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব, এশিয়া, ওসানিয়া ও দুই আমেরিকার পশ্চিম উপকূলবর্তী অংশ। এখানে পূর্ব এশিয়ার ধারণাটি ৮০ দশকে প্রতিষ্ঠা। প্রায় মালয়েশিয়ার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মহাম্মদ এশিয়া অর্থনীতি উন্নতি করতে পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক গোষ্ঠী (EAEG) ধারণাটির প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবের পিছনে মার্কিনী প্রভাব থেকে মুক্তি পাবার একটি উপায় তৈরী হচ্ছিল। যদিও বা এই ধারণাটি বাস্তবায়িত হয়নি, কিন্তু ১৯৯০-এর অর্থনৈতিক সংকটের প্রতিক্রিয়ায় এই ধারণাটি পূর্ণউজ্জীবিত করার চেষ্টা করা হয়। আসিয়ান প্লাস থ্রি (Ashian Plus 3) যথা জাপান, চীন ও দক্ষিণ কোরিয়া ও আসিয়ান মিলে পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক আত্মবিশ্বাস পূর্ণ স্থাপন করার চেষ্টা করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৫ সালে পূর্ব এশিয়া শিখর সম্মেলনের উদ্ভব হয় তার উদ্‌ঘাটনি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কুয়ালালামপুরে। পূর্ব এশিয়া শিখর সম্মেলন পূর্ব এশিয়ার আত্মপরিচিতির প্রতিচ্ছবি। ফলে এ্যাপেক ব্যাতিরেকে পূর্ব এশিয়া শিখর সম্মেলন বা আসিয়ানার মতন প্রতিষ্ঠানগুলি পূর্ব এশিয় আত্মপরিচয়ের সাক্ষর বহন করে। এর থেকে স্পষ্ট যে আঞ্চলিক সংগঠনগুলি আঞ্চলিক পরিচিতি গঠনে বরিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে পূর্ব এশিয়া প্রশান্ত উপকূল প্রান্তে ও এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চল এই ধারণাগুলিকে আরও পুষ্ট করে।

ধারণাগত বিশ্লেষণের পরে অঞ্চলের বিন্যাস বুঝে নেওয়া দরকার। এশিয়া প্রশান্তর মধ্যে প্রশান্ত এলাকার কিছু ক্ষমতাধর ও প্রভাবশীল রাষ্ট্র যেমন মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও নিউজিল্যান্ড এদিকে পূর্ব এশিয়া, উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বিভক্ত। উত্তর-পূর্ব এশিয়া বলতে চীন ও হংকং তাইওয়ান, জাপান ও উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া, রাশিয়ার পূর্ব উপকূলপর্তী অঞ্চল ও মঙ্গোলিয়া রাষ্ট্রগুলি বোঝায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্রুনাই, কাম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া, মায়ানমার, ফিলিপিন্স, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর ও ভিয়েতনাম অন্তর্ভূক্ত। তারা এখন আসিয়ান রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত। পূর্ব তিমোর আসিয়ানের প্রতিবেশি হলেও আসিয়ানভুক্ত নয়। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত দ্বীপগুলি এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের সরিক। এই ছোট ছোট দ্বীপরাষ্ট্রগুলি অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্যাসিফিক ফোরাম (Pacific Forum) তৈরী করেছে। অ্যাপেকের সদস্যপদ ধরে বলতে গেলে প্যাসিফিক প্রান্তীয় কিছু রাষ্ট্র যেমন মেক্সিকো, চিলি, পেরু এশিয়া প্রশান্তের অংশ বলে দাবি করে। এমনকি বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়া, বিশেষ করে ভারত মহাসাগরে ভারতের মধ্যমণি অবস্থান মাথায় রেখে তাকে এশিয়া প্রশান্ত এলাকার একটি উদীয়মান নায়ক বলে মানা হচ্ছে।

১.৪ এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের মৌলিক বৈশিষ্ট্য

এশিয়া প্রশান্ত আনুমানিক ২.৮ বিলিয়ান হেক্টর এলাকা নিয়ে পৃথিবীর ২২ শতাংশ দখল করে আছে। এইখানে বিভিন্ন আবহাওয়া লক্ষণীয়—শীত, নাতিশীতোষ্ণ ও গ্রীষ্ম। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এই অঞ্চল বৈচিত্রময়—পাকিস্তানের পবর্তমালা ও মালভূমি, উচ্চ এশিয়া ও দক্ষিণ প্যাসিফিকের দ্বীপপুঞ্জগুলি, এছাড়া আছে বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে গ্রীষ্মমণ্ডল এলাকায় মরু অঞ্চল। এশিয়া প্রশান্তের বনভূমি আনুমানিক ৮২০ মিলিয়ান হেক্টর, বিশ্বের ১৬ শতাংশ বনভূমি। মানবিক ও সামাজিক বিন্যাসও ততধিক বৈচিত্র্যময়। ২০১১-র হিসাব অনুসারে এই অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা আনুমানিক ৪.৪ বিলিয়ান তথা বিশ্বের জনসংখ্যার ৬১ শতাংশ। অর্থনৈতিক দিক থেকে এই অঞ্চল উন্নয়নমুখি এবং উন্নয়নের হার ৫ শতাংশ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। তার প্রভাব এশিয়া প্রশান্তের বড় ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলির জনসংখ্যার ওপর পড়বে। শুধু তাই নয় দেশগুলির প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে। এত বৈচিত্র সত্ত্বেও এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের কিছু রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মূল্যবোধগত সাদৃশ্য আছে যা আলোচনা করা উচিত।

১.৪.১ এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলি

এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায় যথা—সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক বা সম্পূর্ণ কর্তৃত্ববাদী এবং অনেক রাষ্ট্র এই দুটির অর্ন্তবর্তী অবস্থানে আছে। বৃহৎ শক্তিগুলির যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ভারত উদারনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত। ওদিকে চীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হলেও এমন মতাদর্শের অপেক্ষা জাতীয়তাবাদ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর জোর দিচ্ছে। উদারনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেও অনেক রাষ্ট্র সংসদীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যেমন কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রপতি শাসিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় অনেক রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিকরণ হয়েছে। ৮০-এর দশকে উত্তরপূর্ব এশিয়ায় দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানের গণতান্ত্রিকরণ ঘটেছে তেমনি ৯০-এর দশকের শেষে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইন্দোনেশিয়ার গণতান্ত্রিকরণ ঘটেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন পরে রাশিয়া গণতান্ত্রিক হলেও তার কর্তৃত্ববাদী চরিত্র এখনও লক্ষণীয়। বিশেষ করে রাষ্ট্রপতি পুতিনের নেতৃত্বে কর্তৃত্ববাদ আরও বৃদ্ধি পেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে উত্তর কোরিয়া এখনও কর্তৃত্ববাদ অনুসরণ করে। সত্যি বলতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি যেমন ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া ও লাওস প্রভৃতি রাষ্ট্রে উদারনৈতিক সংস্কৃতি এখনও অধরা। বিশেষ করে একদলীয় অনুশাসিত বা জোট নিয়ন্ত্রিত দেশগুলিতে যেমন সিঙ্গাপুর বা মালয়েশিয়ায় উদারবাদী সাংস্কৃতি এখনও মজবুত নয়। অন্যদিকে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলি আপেক্ষিকভাবে গণতান্ত্রিক দেখালেও আদতে

তারা তা নয়। অনেক রাষ্ট্রে রাজনীতির সঙ্গে উপজাতিক বিষয় জড়িয়ে গেলে তা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অন্য ধরনের জটিলতার সৃষ্টি করে যা সলোমন আইল্যান্ডস বা ফিজিতে লক্ষণীয়। ফলে গণতান্ত্রিক নীতি ও গণতান্ত্রিকরণ মানেই তা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সাদরে গৃহীত হল, তা সবক্ষেত্রে বলা যায় না।

১.৪.২ এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের অর্থনীতিগুলি বিভিন্ন পথ অনুসরণ করলেও অন্য একটি বড় অংশ সমাজতান্ত্রিক এবং আরও কিছু অর্থনীতি আছে যাদের সংস্করণ ঘটেছে এবং তারা এখন বাজারি সমাজতান্ত্রিক কাঠামো অনুসরণ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান বড় পুঁজিবাদী রাষ্ট্র তাছাড়াও এই অঞ্চলের নব্য শিল্পপুষ্ট রাষ্ট্রগুলি এশিয়ান টাইগার্স বলে পরিচিত। তারা কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়। জাপানের শিল্প বিকাশের দ্বারা অনুপ্রাণিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই মুহূর্তে বলশালী অর্থনৈতিক ক্ষমতা হলেও অনেকে মনে করেন চীন শীঘ্রই তাকে ছাপিয়ে যেতে পারে। মার্কিন ও জাপানী অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য হল এই যে জাপানী অর্থনীতির ভিত হল শিল্প, কিন্তু মার্কিনী অর্থনীতিতে শিল্প ছাড়া কৃষিকর্মেরও একটা বড় ভূমিকা আছে। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের থেকে জাপানী অর্থনীতি অনেক বেশি রক্ষণশীল। বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্রে। যদিও বা নব শিল্পপুষ্ট অর্থনীতিগুলি জাপানে অর্থনৈতিক বিকাশের দ্বারা অনুপ্রাণিত এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের অনেক মাঝারি পাল্লার অর্থনীতি মার্কিনী অর্থনৈতিক কল্প গ্রহণ করেছে যেমন কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড। ভারত সাম্প্রতিক কালে উদারিকরণ আরম্ভ করলেও তা রাষ্ট্র নজরদারিতে ঘটছে এবং এই সংস্করণের নিজস্ব কিছু অসুবিধাও আছে। এখনও তার যথার্থ বিকাশ হয়নি। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক জগতে চীন ও রাশিয়া তাদের অর্থনৈতিক সংস্করণ অব্যাহত রেখেছে। চীনে সরকারি ক্ষেত্রের পাশাপাশি বেসরকারি ক্ষেত্রও আসছে, সরকারি ক্ষেত্রের উপস্থিতি ধীরে ধীরে হ্রাসমান হবে বলে অনুমান করা যায়। চীনে কৃষিকর্ম অনেকটা সক্রিয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও চীন শুধু এশিয় অর্থনৈতিক শক্তিই নয়, বর্তমানে তার উন্নতির হার দেখে মনে হয় সে সর্বশক্তিমান অর্থনীতিতে পরিণত হবে। এর মূল কৃতিত্ব মূলত গণপ্রজাতন্ত্র চীনের সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্দেশিত সংস্কার প্রক্রিয়াকেই দিতে হবে। তাদের বাজারি (সমাজতন্ত্র ঘেষা) সংস্কার সফল হলেও সম্পদের চাপ, পরিবেশ রক্ষার মানদন্ড ও বার্ধক্যের সমস্যা উন্নয়নে পথে বাধার সৃষ্টি করেছে। রাশিয়ার অর্থনীতি সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর অর্থনৈতিক পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। তারা কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির থেকে বিশ্ববাজারী অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা চালায়। ২০১৩ তে বিশ্বব্যাঙ্ক ও রাশিয়ার অর্থনৈতিক সংস্কারের স্বীকৃতি দিলেও আভ্যন্তরীণ সমস্যা ও প্রশাসনিক দূর্নীতি রাশিয়ার অর্থনৈতিক গতিবেগ মন্থর করে দিয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি বড় অংশ অর্থনীতি পুঁজিতান্ত্রিক কল্প গ্রহণ করেছে—সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এবং ফিলিপিন্স এদের মধ্যে সিঙ্গাপুর বিশ্বমানের অর্থনীতি। অন্যান্যদের বিপনন

ব্যবস্থায় কৃষিপণ্য ও ধাতুসম্পদ বড় অংশ দখল করে। ৮০-এর দশকে এই রাষ্ট্রগুলির লক্ষণীয় বিকাশ ঘটলেও ৯০-এর দশকের মন্দা তাদের অর্থনৈতিক গতিশক্তি দুর্বল করে দেয়। বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়া থাইল্যান্ড ও মালয়শিয়া সমস্যার সম্মুখীন হয়। অর্থনৈতিক ভারসাম্য পূর্ণস্থাপন করা সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া রক্ষণশীল অর্থনীতিগুলি তথা কাম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস ও মায়নমার অর্থনৈতিক সংস্কার গ্রহণ করেছে তথা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি বেসরকারিকরণ ঘটেছে। কিন্তু এই বেসরকারিকরণের মধ্যে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ ও সংযম লক্ষণীয়। নিয়ন্ত্রিত উদারিকরণ উত্তর কোরিয়াতেও ঘটেছে। কিন্তু সেখানে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও ভূমিকা এতটাই বেশি যে সেই সংস্কারের যথার্থ পরিস্ফুটন ও বিকাশ ঘটেনি। এর সবচেয়ে বড় কারণ হল উত্তর কোরিয়ার নেতৃত্বের প্রকটতা। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ অর্থনীতিগুলি শুধু ক্ষুদ্রই নয় তারা প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর। ফলে তাদের অর্থনৈতিক বিকাশ ওতপ্রতভাবে সম্পদের পর্যাপ্ততা বা অপর্যাপ্ততার ওপর নির্ভরশীল। এটাই তাদের দুর্বলতা। এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের বিভিন্ন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিন্যাসগত ও সামর্থগত দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক জীবনীশক্তি ইউরোপের থেকে বেশি। দেখা যাচ্ছে এ্যাপেকের একার আয় প্রায় ২১ ট্রিলিয়ান মার্কিনী ডলার যা পৃথিবীর জিডিপির অর্ধাংশ এর থেকে প্রমাণিত যে এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চল এখন পৃথিবীর অর্থনৈতিক শক্তি অঞ্চল রূপে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে।

১.৪.৩ এশিয়ার প্রশান্ত অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা

এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলে সমাজ ব্যবস্থাগুলি দুটি নির্ধারকের দ্বারা নির্দিষ্ট—প্রথমতঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃতি ও মান, দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেকটি সমাজের উপজাতীয় গঠন পরিচয়। জনসংখ্যা বিন্যাসের দিক থেকে এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চল বেশ বৈচিত্রময়। একদিকে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশগুলিতে শহরকেন্দ্রিক সমাজে সীমিত জনসংখ্যা লক্ষণীয়। অপরদিকে যেমন বাংলাদেশ, লাওস, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশগুলিতে গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় বিপুল জনসংখ্যার পাশাপাশি শহরগুলিতে খুবই সীমিত ধনী প্রভাবশালী মানুষের বাস। এই ধরনের দুটি বিপরীত সামাজিক বিন্যাসের মাঝামাঝি উন্নয়নশীল সমাজ ব্যবস্থাগুলির অবস্থান। তাদের সামাজিক জনসংখ্যা বিনাসে দেখা যায় যে কৃষি সমাজের পাশাপাশি উদীয়মান মধ্যবিত্ত সমাজেরও বিকাশ ঘটেছে। অবশ্য সেটি দেশের শিল্প বিকাশের ওপর নির্ভরশীল। যেমন শিল্পবিকাশ শ্রমিক সমাজের জন্ম দেয়, তেমনি নগরায়ন অভিবাসাকে উৎসাহ দেয়। যে কোন কাজের খোঁজে দলে দলে মানুষ গ্রাম থেকে এসে শহরে বস্তি অঞ্চল তৈরি করে। ফলে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যেমন ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপিন্স, চীন ও ভারত প্রভৃতি দেশগুলিতে নগর প্রধান জনবিন্যাসে বৃহৎ নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের পাশাপাশি একটি ছোট মধ্যবিত্ত সমাজের বসবাস দেখা যায়।

এশিয়া প্রশান্ত সমাজ ব্যবস্থাগুলি বহুজাতিক ও বহুসাংস্কৃতিক। তারও দুটি নির্ধারক আছে। প্রথম

হল অধিবাস প্রধান সমাজ ও তার সমীকরণ। দ্বিতীয় হল একাধিক সমাজব্যবস্থায় সংখ্যালঘু মানুষদের অবস্থান ও তার সমীকরণ। অভিবাসী সমাজগুলি শুধু বহুজাতিকই নয়, বহুসাংস্কৃতিকও হয়। তার পাশাপাশি অভিবাসী ও উপজাতীয় জনসমষ্টির মধ্যে বিভেদ লক্ষণীয় যেমন নিউজিল্যান্ড বিভেদ আছে মাওরী উপজাতি ও প্যাসিফিক আইল্যান্ডসের বাসিন্দাদের মধ্যে। আসলে কোন দেশই একজাতীক নয়, যদিও বা জাপান, দুই কোরিয়াকে এক জাতিক ব্যবস্থা বলা হয়। চীনে হান জাতির আধিক্য থাকলেও প্রাদেশিক স্তরে তীব্রতী মুসলমান এবং একাধিক উপজাতীয় গোষ্ঠীর বসবাস লক্ষ্য করা যায়। সমগ্র দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় চীনা প্রবাসীদের বসবাস। কোন দেশে যেমন সিঙ্গাপুরে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ তো কোন দেশে যেমন ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া বা থাইল্যান্ডে তারা সংখ্যালঘু। মজার ব্যাপার হল এই যে, থাইল্যান্ডে থাই জাতির পূর্বপুরুষরা চীন থেকে এসেছিলেন বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন কিন্তু তারা থাই বাসিন্দা হিসেবেই পরিচিত। একইভাবে মালয়শিয়াতে প্রবাসী চীনারা দুই তিন প্রজন্ম পরে মালয়েশিয়ার নাগরিকত্ব পেয়েছে।

মায়ানমারে শুধু একটি উপজাতি গোষ্ঠীর বসবাস নেই। পার্বত্য ও উপত্যকা অঞ্চলের মানুষরা এক অপরের থেকে ভিন্ন। এমনকি গোষ্ঠীগুলি একে অপরের থেকে ভিন্ন মনে করে এবং গোষ্ঠী পরিচিতি সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ। অথচ ভিয়েতনামে সমতল ও পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে সেইরকম কোন প্রকট বিভেদজ্ঞান নেই। ইন্দোনেশিয়াতেও তেমন ভৌগোলিক বিন্যাস অনুসরণে জনসমষ্টির মধ্যে বিভেদ নেই। সেখানে জাভা সম্প্রদায়ের মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও প্রায় তিনশত উপজাতির বসবাস লক্ষণীয়। তাদের মধ্যে সুদানিস, মাদুরিস, বুগিস, মালয়, মিনাংগকবাকু উপজাতির উল্লেখ করা যায়। চীনা প্রপাসীদের তুলনায় ভারতীয়রা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু অংশ জুড়ে বসবাস করে—মালয়েশিয়া ও মায়েনমার। তুলনামূলকভাবে ভারতীয়রা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সর্বত্র উপস্থিত। এছাড়া প্রশান্ত মহাসাগরের কিছু দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় বংশভুক্ত মানুষ থাকেন। যেমন ফিজি দ্বীপে ভারতীয় বংশভুক্ত ফিজি নাগরিক আছে। তাদের ও আদি ফিজি বাসিদের মধ্যে স্তিমিত মনমালিন্য সেই দেশের রাজনীতির ওপর প্রভাব ফেলেছে। অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জের শান্তি ও স্থায়িত্বও আন্তউপজাতির সম্পর্কে ওপর নির্ভরশীল।

এই অঞ্চলে জনসংখ্যার বিন্যাসগত বৈচিত্রের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিন্যাস যুক্ত। সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা বলতে গোষ্ঠীভিত্তিক জীবনধারার নক্সা নয়, তাদের সামাজিক মূল্যবোধ। এশিয় প্রশান্ত অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা বিভিন্ন সভ্যতার সূত্রে পুষ্ট বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার মিলন কেন্দ্র। এই অঞ্চলে পশ্চিমি, চৈনিক, জাপানি, রুশ, হিন্দু ও ইসলামীয় রক্ষণশীল সভ্যতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তাদের কোন সংঘাত নেই। এশিয় প্রশান্ত অঞ্চলের একাধিক রাষ্ট্রে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড সম্পূর্ণ পশ্চিম সভ্যতার প্রভাবভুক্ত হলেও পশ্চিমি সভ্যতার প্রভাব আরও সুদূর প্রসারী—লাতিন আমেরিকা,

দক্ষিণপূর্ব এশিয়া। সাম্রাজ্যবাদ থেকে আরম্ভ করে প্রযুক্তিগত বাজারের প্রসার বিশেষ করে বিশ্বায়নের সাহায্য পশ্চিমি ধ্যান ধারণাকে নানা জায়গায় পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছে। বর্তমানে পশ্চিমের মূল্যবোধ যদিও বা মূলত মার্কিনী মূল্যবোধকে বোঝায়। কিন্তু তার শিকড় ইউরোপের নবজাগরণের যুক্তিবাদ, বৈজ্ঞানিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণের সঙ্গে যুক্ত। ফলে যে ব্যবস্থাগুলি পশ্চিমি মূল্যকে গ্রহণ করেছে, ধরে নিতে পারা যায় যে তারা উদারবাদী গণতান্ত্রিক কাঠামো গ্রহণ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমি উদারগণতান্ত্রিক দেশগুলি তাদের উদারমুখি রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রসার ও রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর।

প্রাচ্যের সভ্যতা বলতে ভারতীয়, চৈনিক ও জাপানী সভ্যতা বোঝায়। জাপানের প্রভাব তার সাম্রাজ্যবাদী ভাবমূর্তির কারণে খুব সীমিত। সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতা হিসেবে জাপানের ক্ষমতা সুদুর দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও ভারতীয় উপমহাদেশ অবধি পৌঁছালেও তার 'শিন্ডোবাদ' সাংস্কৃতিক প্রভাব কোরিয়া ও তাইওয়ান অবধিই সীমাবদ্ধ। তার তুলনায় তাও চিন্তন কনফিশুয়াসের প্রভাবমুক্ত চৈনিক মূল্য ও হিন্দুচিন্তন ও বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত ভারতীয় মূল্যবোধের বিস্তার হয়েছে ঘটেছে এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলে। পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণপূর্বে তারা জীবনের সব ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও সংহতির কথা বলে। তারা ব্যক্তিগত বৃত্ত ও সামাজিক বৃত্তের মধ্যে কোন বিভেদের কথা বলে না। তার প্রভাব দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্পষ্ট।

ইসলামের প্রভাবও কম নয়। ইন্দোনেশিয়া শুধু এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলেরই নয় সমগ্র পৃথিবীর সর্বোচ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান রাষ্ট্র। এছাড়াও মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই দুটিই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান রাষ্ট্র। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রে যেমন থাইল্যান্ড, ফিলিপিন্স, কাম্বোডিয়া এবং চীনে তারা সংখ্যালঘু। প্রশান্ত এশিয়ার অন্যান্য অংশে মুসলমানেরা সংখ্যালঘু। তার একটি কারণ হল তাদের অনেকেই পশ্চিমে চলে গেছে। প্রাচ্যের সভ্যতাগুলি ও মূল্যবোধের সঙ্গে ইসলামের কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও ইসলাম ভিন্ন, কারণ ইসলাম মানব জীবনের ও রাজনীতির আঙ্গিকগুলিকে ধর্মের সঙ্গে মিলিত করার চেষ্টা করে। উপরন্তু মৌলবাদী ইসলামের প্রভাব রাজনীতির ওপর পড়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমান সংস্কারগুলি ও ইসলামী গোষ্ঠীগুলি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান রাষ্ট্রগুলিতে—ইন্দোনেশিয়ায় ও মালয়েশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে চলেছে। অন্যদিকে থাইল্যান্ডে মুসলিমরা সংখ্যালঘু হলেও সেখানে উপজাতীয় আন্দোলনকে প্রভাবিত করে আরও প্রতিক্রিয়াশীল করে তোলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি সংখ্যায় কম, সিংহভাগ মুসলমান উদারবাদী। তারা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ সমর্থন করে।

এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলে বহুত্ববাদী বিন্যাস থাকা সত্ত্বেও কিছু সাদৃশ্য আছে যেমন গণতান্ত্রিক উদারতার সমর্থন ও পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক উন্নয়ন গ্রহণ। অনেকে এই ধরনের সমর্থন আদতে মার্কিনী ব্যবস্থার

প্রতি দুর্বলতা বলে মনে করত। তার কারণ হচ্ছে, যদি এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের ধারণাটাই মার্কিনী হয় তাহলে তাতে মার্কিনী স্বার্থ অন্তর্নিহিত থাকবে এটাই স্বাভাবিক। এই অঞ্চলের প্রতি মার্কিনীদের দুর্বলতা অন্যান্য ক্ষমতাধর রাষ্ট্রদের সঙ্গে সম্পর্কের সমীকরণ আরও জটিল করে তুলেছে। প্রশ্ন ওঠে যে এই অঞ্চলে রাষ্ট্রপ্রধান বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতি কি দর কষাকষির চাপে আঞ্চলিক সংগঠনগুলির দুর্বলতা প্রমাণ করে দেবে? তা বোঝার জন্য এই অঞ্চলের আন্তর্জাতিক রাজনীতির গুরুত্ব অনুধাবন করা দরকার।

১.৫ আন্তর্জাতিক সম্পর্কে এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

এই ঘটনাবহুল বিশ্বে এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের গুরুত্ব ক্রমন্বয়ে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই অঞ্চলের কিছু অংশ ঠান্ডা লড়াইয়ের রাজনীতির কবলে পড়ে। অনেক সময় মনে করা হয় যে এই অঞ্চলের ঠাণ্ডা লড়াই-এর রাজনীতি আধুনিক ওয়েষ্টফেলিয়া ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি। ওয়েষ্টফেলিয়া ব্যবস্থার আগে ছিল রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। কিছু রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পরিণত হয় এবং তারা প্রতিবেশি অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে। এইভাবে চৈনিক, ভারতীয় ও কিছুটা পরিমাণে জাপানী সভ্যতা প্রতিবেশে তাদের প্রভাব বিস্তার করে। আন্তর্রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক মূলত বড় বড় সাম্রাজ্যের বিস্তার ও প্রতিবেশীদের থেকে উপঢৌকন ও সাম্মানিক উপহার আদায় করাই বোঝাতো। চৈনিক সভ্যতার প্রভাব মূলত সাংস্কৃতিক, তার বিস্তার জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় দেখা যায়। জাপানী সভ্যতার বিস্তার শুধু তার সীমান্তবর্তী এলাকায়। তুলনায় ভারতীয় সভ্যতা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় তার ছাপ ফেলতে পেরেছিল। ইন্দোচীন শব্দটি ভারতীয় ও চৈনিক সভ্যতার যুগ্ম প্রভাবের প্রমাণ। কিন্তু কোন সময়ই তারা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ওপর একছত্র সাংস্কৃতিক প্রভাব বজায় রাখতে পারেনি। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় প্রাচীন রাজত্বগুলি মান্ডালা তত্ত্ব প্রয়োগ করে তাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অদূর প্রতিবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখত। ইসলামও কেবলই উপকূলবর্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে। পশ্চিমি প্রভাবেরও প্রাথমিক কারণ ছিল বাণিজ্য ও ধর্মান্তর। তারা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় প্রবেশ অধিকার পায়, যেমন পর্তুগাল, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও চীন মাকাওতে। স্পেন ফিলিপিন্সে, পরবর্তীতে ইন্দোনেশিয়ায় ইংরেজ ও ফরাসীরা সুদূর প্রাচ্যে ও ভারতীয় উপমহাদেশে তাদের বাণিজ্যিক ভিত তৈরী করতে থাকে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ভূখণ্ড দখলের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। উত্তরপূর্ব পশ্চিমি শক্তিগুলি নিজেদের প্রভাবের বৃত্ত সৃষ্টি করার চেষ্টা চালায়—হংকং ইয়াংজী উপত্যকা (ইংরেজদের দখলে), ইউনান (ফরাসীদের দখলে), শানতুং উপদ্বীপ (জার্মানদের দখলে)। রাশিয়া মধ্য এশিয়া ও উত্তর মাঞ্চুরিয়া দখল করে কিন্তু কোরিয়া প্রভাব বিস্তার করতে গিয়ে জাপানের সম্মুখীন হয়। ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকগুলিতে জাপানের উত্থান তাকে এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত করে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতা দেখা যায়। বৃটেন, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস্, স্পেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও একমাত্র এশিয়ান সাম্রাজ্ঞাবাদী ক্ষমতা হিসেবে জাপান এই প্রতিযোগিতার জড়িয়ে পড়ে। জাপান এশিয়ার আত্মপ্রকাশের ওপর জোর দেয় এবং এশিয়ার ঐক্যের ডাক দেয়। জাপানী অধিগ্রহণের সুযোগ নিয়ে বেশ কয়েকটি উপনিবেশ তাদের পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন আরও মজবুত করে নেয়। ঘটনাচক্রে স্বাধীনতার পরেই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের রাজনীতিতে তারা জড়িয়ে পড়ে। তার একটা বড় কারণ হল গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের জন্ম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান চীনের এই উত্থানে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে ও তাদের মধ্যে সম্পর্ক মজবুত হতে আরম্ভ করে। ১৯৪০-১৯৮০ এর দশকে ঠাণ্ডা লড়াই এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ওপর প্রবল প্রভাব ফেলে। দুই কোরিয়ার যুদ্ধ, তাইওয়ানকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে তিক্ততা এবং সবচেয়ে জটিল ঘটনা ভিয়েতনামের যুদ্ধ এই অঞ্চলের রাজনীতি খুব দ্বন্দ্বপ্রধান করে তোলে। এই প্রেক্ষিতে সমাজতান্ত্রিক প্রসার থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য কিছু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি আসিয়ান (ASEAN) তৈরি করে। এটি পরে আঞ্চলিক সংগঠনে পরিণত হয়।

১৯৭০ ও ১৯৮০ দশকে ভিয়েতনামের যুদ্ধ বড় আকার ধারণ করে। কিন্তু অপরদিকে তাইওয়ানকে কেন্দ্র করে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের উন্নতি জাপানের ক্ষেত্রে লাভজনক হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি জাপান আন্তর্জাতিক ভূমিকা পালন করার আগ্রহও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের তকমা তাকে সামরিক ক্ষেত্রে সংযত হতে বাধ্য করে। বিকল্প হাতিয়ার রূপে অর্থনৈতিক কূটনীতিই জাপানের সঙ্গে এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করে। তার এই কৌশল জাপানকে জি-সেভেন-এ (G7) সদস্যপদ নিশ্চিত করে। এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছে জাপানের উন্নয়ন ছিল অনুকরণযোগ্য। তা অনুসরণ করে পর্যায়ক্রমে এশিয়ান টাইগার্স—দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং এবং সিঙ্গাপুর উচ্চ হারে উন্নতি, উচ্চ মানের শিল্পায়ন এবং বাণিজ্যিক আয় উপভোগ করতে থাকে। অথচ উত্তর কোরিয়া, মায়েনমারের মত দেশগুলি না তো অর্থনৈতিক ভাবে উন্নত হতে পারে না গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিতে পুষ্ট হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ১৯৭০ ও ১৯৮০-র দশকে দুটি বিপরীত ধারা দেখা যায়। একদিকে আঞ্চলিক সংহতি ও পরিচিত দৃঢ় করে শান্তি ও শৃঙ্খলা রাখার চেষ্টা, আসিয়ান তার প্রাতিষ্ঠানিক বহিঃপ্রকাশ। অপরদিকে উপনিবেশের লক্ষণ, অঞ্চলের শান্তি ও স্থায়িত্ব বিঘ্নিত করে। যেমন পূর্ব তিমোরে ইন্দোনেশিয়ার অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ৯০ এর দশক অবধি চলতে থাকে। তার পাশাপাশি অনেক ছোট ছোট গোষ্ঠী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে নিজেদের পৃথক সত্ত্বা ও ভূখণ্ডভিত্তিক জাতীয়তাবাদী অধিকারের জন্য

লড়াই চালাতে থাকে। এই আন্দোলনগুলি কিছু ক্ষেত্রে সশস্ত্র হওয়ায় আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

১৯৯০ এর দশক থেকে আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে সত্য, তার অপর এক প্রমাণ হল এশিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উত্থান। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি এশিয়া মহাদেশ আন্তর্জাতিক কর্মকর্তা রূপে নিজের জায়গা তৈরী করে নিয়েছে। ঠাণ্ডা লড়াই-এর অবসান অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভবপর করেছে। এই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রথম সারিতে চীন, জাপান, ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মত রাষ্ট্রগুলি রয়েছে। এদের মধ্যে চীনের অর্থনৈতিক উদ্যাম ও সামরিক শক্তি এবং এই অঞ্চলের ওপর রাজনৈতিক প্রতিপত্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগের কারণ হয়ে পড়েছে। ভূখণ্ডভিত্তিক ও নৌভিত্তিক দাবিগুলিতে চীনের অনমনীয় মনোভাব এশিয়ায় একাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে এতটাই ভীতি তৈরী করেছে যে তারা মার্কিনী আশ্বাসের প্রত্যাশি। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলে কিছু বন্ধু রাষ্ট্র পেয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার এশিয়ায় 'পিভোট স্ট্রাটেজি' অনুযায়ী একাধিক স্তরে এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে চলেছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে এ্যাপেক ও ট্রান্স প্যাসেফিক পার্টনারশিপের মাধ্যমে বাণিজ্য গোষ্ঠী ও সংহতির ওপর জোর দিচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আগ্রহ না থাকায় তাদের জন্য 'আসিয়ান এক্সপ্যান্ডেড এনগেজমেন্ট' (ASEANE-3) ব্যবস্থা মার্কিনীরা তৈরি করে। এছাড়া লোয়ার মেকং ইনিশিয়েটিভ (Lower Mekong Initative) শুরু করে যার উদ্দেশ্য হল আসিয়ানের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ব্যবধান হ্রাস করা।

ইদানীং কালে এশিয়া প্রশান্ত সংলগ্ন নৌ অঞ্চল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। 'ইন্দো প্যাসিফিক' ইন্ডিয়ান ওশান রিম' এই ধরনের ধারণাগুলি এই নৌ-অঞ্চলের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বহিররাষ্ট্রগুলির ভূমিকার কথা স্পষ্ট করে তোলে। নৌ এলাকা সংক্রান্ত ছাবি ও তার বিতর্কগুলি যেমন দক্ষিণ চীন সাগরের বিতর্ক, পূর্ব চীন সাগরের বিতর্ক, শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে সমস্যার সৃষ্টি করে চলেছে। চীন সেই বিতর্কগুলির শরিক, কাজেই চীনের অবস্থান নিয়ে সকলেই উদ্বিগ্ন। এছাড়াও এই নৌ অঞ্চল উর্জা সম্পদ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য খুবই আর্কষণীয়। বিশেষ করে এশিয়ার দুটি বৃহৎ অর্থনীতি ভারত ও চীন উর্জার প্রয়োজনে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেছে। তাদের পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানও আছে। অনুমান করা যায় যে উর্জার প্রতিযোগিতা ও নৌ-দাবির সমস্যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষতি করতে পারে। এই আশঙ্কায় অন্যান্য মহাদেশের রাষ্ট্রগুলিও এই অঞ্চলের রাজনৈতিক দিকে নজর রেখে চলেছে। ফলে এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চল বিশেষ করে নৌ অঞ্চল বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

১.৬ সারসংক্ষেপ

- পূর্ব এশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও নিউজিল্যান্ডের মতন কিছু প্রভাবশালী প্রশান্ত অঞ্চলের রাষ্ট্র নিয়ে প্রশান্ত এশিয়ার ধারণাটি সৃষ্ট। পূর্ব এশিয়া বলতে উত্তর-পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকেই বোঝায়।
- আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অঞ্চল বিষয়ক পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'এশিয়া প্রশান্ত' ধারণাটিকে জনপ্রিয় করে তোলে। পরে অন্যান্য রাষ্ট্রও তা ব্যবহার করে।
- ভৌগোলিক ভাবে, বাতাবরণগত ও জনসংখ্যাগত বিন্যাসে এই অঞ্চল বৈচিত্রময়। এছাড়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উপজাতীয় বিন্যাস এমনকি মূল্যবোধের বিন্যাসেও এই অঞ্চল বৈচিত্রযুক্ত। তা সত্ত্বেও আসিয়ান ও এ্যাপেকের মাধ্যমে আঞ্চলিক সত্তা ও পরিচিতি গঠনের চেষ্টা চলছে নিরন্তর।
- আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অনেক আগের থেকেই এই অঞ্চলে আন্তর্রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ইতিহাস আছে। কিন্তু তা মূলত দুটি বড় সভ্যতা তথা ভারত ও চীনের পারস্পরিক আদান প্রদানের কথা। ইসলামের প্রভাব এই অঞ্চলে মূলত বাণিজ্যকে অবলম্বন করে বিস্তৃতি লাভ করে কিন্তু তা অনেক পরে ঘটে।
- ১৯৪০ থেকে ১৯৯০ অবধি এই অঞ্চল ঠাণ্ডা লড়াই-এর সাক্ষী হয়ে রয়েছে। কিন্তু এই সময়ই আসিয়ান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিচিতি গঠনের চেষ্টা হয়েছ।
- এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের অর্থনৈতিক উত্থান মূলত চীন, জাপান ও এশিয়ান টাইগারদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সমষ্টিগত বহিঃপ্রকাশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এরই মধ্যে এ্যাপেকের মাধ্যমে এশিয়ার অর্থনৈতিক সংহতি তৈরী করার চেষ্টা করেছে।
- সাম্প্রতিককালে এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের কৌশলগত তাৎপর্য তার নৌ বিতর্কগুলির আলোকে বোঝা দরকার। এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের বড় রাষ্ট্রগুলি এই দীর্ঘ জটিল বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে। ফলে তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। কিন্তু তার পাশাপাশি অপ্রচলিত নিরাপত্তার সংকট সহযোগিতার সুযোগও তৈরী করে দিয়েছে।

১.৭ নমুনা প্রশ্নমালা

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

১. এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চল বলতে কী বোঝেন? এই অঞ্চলের বিস্তৃতি ও বিন্যাস আলোচনা করুন।

২. এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।

৩. আন্তর্জাতিক সম্পর্কে এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী

১. এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করুন।

২. এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করুন।

৩. এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের রাজনীতিতে ধর্মীয় প্রভাব আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. আসিয়ান (ASEAN)-এর মূল উদ্দেশ্যগুলি লিখুন।

২. এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের সমাজব্যবস্থার নির্ধারকগুলি উল্লেখ করুন।

১.৮ গ্রন্থপঞ্জী

1. Vera Simone, *The Asian Pacific : Political and Economic Development in a Global Context*, Pearson, 2000
2. Giovanna Maria Dora Dore, et. al, *Incomplete Democracies in the Asia-Pacific : Evidence from Indonesia, Korea, the Philippines and Thailand*, Palgrave Macmillan, 2014.
3. Vinod K. Aggarwal, *The Political Economy of the Asia Pacific*, Springer, 2011.
4. Tanweer Fazal, *Minority Nationalisms in South Asia*, Routledge, 2013
5. Rajat Ganguly and Ian Macduff, *Ethnic Conflict and Secessionism in South and Southeast Asia : Causes, Dynamics, Solutions*, Sage Publications 2003.
6. Michael Edward Brown and Rajat Ganguly, *Government Policies and Ethnic Relations in the Pacific*, MIT Press, 1997.

7. Jocelyn Linnekin, Lin Poyer, *Cultural Identity and Ethnicity in the Pacific*, University of Hawaii, 1990.

8. Paul Pickard and W. Jeffrry Burroughs, *Narrative and Multiplicity in Constructing Ethnic Identity*, Temple University Press, 2000.

9. Douglas S. Massey, "The New Immigration and Ethnicity in the US", *Population and Development Review*, Vol. 21, No. 3, September 1995, pp. 631-652.

10. J. Jupp, "Immigration and Ethnicity" Australian Cultural History : *The Journal of History of Culturel in Australia*, Vol 27, No, 2, 2009, pp. 157-166.

11. Jupp, J 2009, 'Immigrant settlement, ethnic relations and multiculturalism in Australia', in John Highly, John Nieuwenhuysen with Stine Neerup (ed.), *Nations of Immigrants : Australia and the USA Compared*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, pp. 147-159.

একক—২ ❑ নির্বাচিত কিছু এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের রাষ্ট্রে কর্তৃত্ববাদ, সামরিক-অসামরিক সম্পর্ক ও তাদের গণতান্ত্রিকরণের সম্ভাবনা ঃ ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স ও উত্তর কোরিয়া

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ ভূমিকা

২.৩ এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলে সামরিক-অসামরিক সম্পর্কের প্রকৃতি ও তাদের গণতান্ত্রিকরণের সম্ভাবনা

২.৩.১ ইন্দোনেশিয়া

২.৩.২ দি ফিলিপিন্স

২.৩.৩ দক্ষিণ কোরিয়া

২.৪ সারসংক্ষেপ

২.৫ নমুনা প্রশ্নমালা

২.৬ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্যগুলি হল—

- এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সামরিক বাহিনীর প্রভাব বিষয়ে জ্ঞানলাভে সাহায্য করা।
- এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলে সামরিক-অসামরিক শক্তির সম্পর্কের গতি প্রকৃতি ও সমীকরণ অনুধাবনে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা।
- এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলে গণতান্ত্রিকরণের সম্ভাবনা সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা।
- এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের কিছু নির্বাচিত রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের সম্ভাবনা ও প্রকৃতি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা।

২.২ ভূমিকা

এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলে কর্তৃত্ববাদ ও অসামরিক-সামরিক সম্পর্কের আলোচনার মূলত প্রেক্ষিত হল—সাধারণ ভাবে ধরে নেওয়া হয় যে, উদারবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা হল আদর্শ ব্যবস্থা। উদারবাদী ব্যবস্থায় অসামরিক সরকারের তত্ত্বাবধানে গণতান্ত্রিক মূল্য নিরাপদ। কিন্তু অসামরিক সরকার ও কর্তৃত্ববাদী সরকার একে অপরের বিপরীত এ ধারণা সবক্ষেত্রে সত্য নয়। বরঞ্চ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার একাধিক অসামরিক সরকার কর্তৃত্ববাদী পদক্ষেপ ও নীতি গ্রহণ করেছে। 'এশিয়ান ভ্যালিউস' বা এশিয়ার মূল্যবোধ তৎকালীন মালয়শিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথীর মহম্মদের অবদান। তিনি এর দ্বারা এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থাগুলির শুধু ব্যাখ্যাই দেননি, সমর্থনও করেছিলেন। কিন্তু পশ্চিমি মানদণ্ড অনুসারে এশিয়ান ভ্যালিউস' কেবলই কর্তৃত্ববাদের প্রশ্রয় দেয়, তাকে যুক্তিপূর্ণ দেখাবার চেষ্টা করে। পশ্চিমে ব্যক্তিস্বাধীনতা সরকারি হস্তক্ষেপের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলে একাধিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সামাজিক প্রয়োজন ও জনকল্যাণ ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্রের থেকে অনেক বেশি প্রয়োজনীয়। দেশের উন্নয়নের জন্য ব্যক্তিস্বাধীনতা গুরুত্বপূর্ণ নয় বরঞ্চ সিঙ্গাপুরের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী একটা দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য স্বাধীনতা অপেক্ষা অনেক প্রয়োজন সরকারের ভূমিকা ও হস্তক্ষেপ।

সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সংকটের প্রেক্ষিতে উন্নয়নধারী কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থা ও এশিয়ান ভ্যালিউস নিয়ে প্রশ্ন ওঠে এবং সুপ্রশাসনের পক্ষে সওয়াল করা হয়। ৯০-এর দশকে গণতান্ত্রিক উত্থান ইন্দোনেশিয়ায় ও মালয়েশিয়ায় পটপরিবর্তন করতে সাহায্য করে। কিন্তু অনেক অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও আছে যারা তাদের অনমনীয়তার জন্য সমালোচিত হলেও অর্থনৈতিক উন্নয়ন অব্যাহত রেখেছে। চীন, ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়ার মত কর্তৃত্ববাদী দেশ অর্থনৈতিক মন্দার দ্বারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। বরঞ্চ এদের মধ্যে চীন বাজারী অর্থনীতির সঙ্গে রাষ্ট্রপরিচালিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি এক সফল সমন্বয় সাধন করতে পেরেছে। সিঙ্গাপুর কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও উন্নত অর্থনীতিই শুধু নয়। এশিয়ান টাইগার্স উপাধি পেয়েছে। বর্তমানে মায়েনমার ও অর্থনৈতিক সংস্কারের পাশাপাশি কিছুটা গণতান্ত্রিকরণ করছে। উত্তর কোরিয়ায় সেই তুলনায় কোন পরিবর্তনই লক্ষণীয় নয়। এদের মধ্যে অনেক ব্যবস্থা আছে যারা সামরিক বাহিনীর দ্বারা পরিচালিত বা সামরিক প্রভাবের শিকার—মায়েনমার, চীন, থাইল্যান্ড। এক্ষেত্রে রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা ও সামরিক-অসামরিক পক্ষের আলোচনা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

২.৩ এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলে সামরিক-অসামরিক সম্পর্কের প্রকৃতি ও তাদের গণতান্ত্রিকরণের সম্ভাবনা

সামরিক বাহিনীর ভূমিকা এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলে যথেষ্ট গবেষিত বিষয় কিন্তু যেটা বোঝার দরকার

সেটা হল এই যে, সামরিক বাহিনীর ভূমিকার গতিপ্রকৃতি বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভিন্ন। ফিলিপিন্সের মত দেশে সরকার অসামরিক হলেও সামরিক বাহিনী নেপথ্যে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। অন্যদিকে মায়েনমার ও থাইল্যান্ডে বাহিনীর প্রত্যক্ষ ভূমিকা স্পষ্ট। ইন্দোনেশিয়াতে সরকার সামরিক বাহিনী ও রাজনৈতিক দলগুলি জোটের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে। যেখানে সামরিক বাহিনী রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ফেলতে পারে, সেখানে অসামরিক পক্ষকে সব সময়ই সাবধান থাকতে হয়েছে। এমনকি অসামরিক সরকারের সামরিক বিষয়গুলিতে যেমন প্রতিরক্ষা, জাতীয় নিরাপত্তা, এই বিষয়গুলিতে এমনভাবে সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া পরিচালন করতে হয় যাতে সামরিক পক্ষ একক সিদ্ধান্ত না নিতে পারে। দুর্বল অসামরিক সরকার থাকলে, সামরিক হস্তক্ষেপের আশঙ্কা সব সময়ই রয়েছে। বর্তমানে কিছু দেশে গণতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটেছে। সেক্ষেত্রে যেটি বিবেচনার সেটি হল সামরিক শক্তির রাজনৈতিক সংযম কতটা। বিগত দুই দশকে গণতান্ত্রিকরণের তৃতীয় তরঙ্গের অধ্যায়ে কিছু এশিয়া প্রশান্ত রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিকরণ ঘটে। উত্তরপূর্ব এশিয়াতে দক্ষিণ কোরিয়ার এই পরিবর্তন ঘটেছে; দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ইন্দোনেশিয়ায় ও ফিলিপিন্সে। এইসব উদীয়মান গণতন্ত্রে সামরিক-অসামরিক সম্পর্কে দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা ও দ্বন্দ্ব দুটোই লক্ষণীয়, এছাড়া দুইপক্ষের মধ্যে বেসরকারি যোগাযোগও অব্যাহত। দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক দলগুলির কোন্দলের সুবিধা নিয়ে সামরিক বাহিনী প্রচুর সুবিধে লাভ করেছে। ফলে দেশের ও রাজনৈতিক স্থায়িত্বের রক্ষক বলে সামরিক বাহিনীর একটা আত্মবিশ্বাস আছে। তারা দেশ গঠনের কাজেও নিজেদের যুক্ত রাখতে চায়। কাজেই এই উদীয়মান গণতন্ত্রগুলিতে ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স ও দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক স্বার্থ নির্লোপ হয়নি। এই তিনটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিচে আলোচিত হল।

২.৩.১ ইন্দোনেশিয়া

ইন্দোনেশিয়া সামরিক বাহিনী দেশে ডাচ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে ও দেশগঠনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। স্বাধীনতার পর দু দশক দুধরনের শাসন ব্যবস্থা—প্রথমে সংসদীয় গণতন্ত্র ও তারপর সুকার্নোর নির্দেশিত গণতন্ত্র যার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সুহার্তোর (১৯৬৭-১৯৯৮) স্বঘোষিত নব্য ব্যবস্থায় (New Order) সামরিক বাহিনীর প্রভাব বিস্তারের পথ আরও বিস্তৃত হতে থাকে। ৭০ এর দশকে সামরিক বাহিনী প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা ও অসামরিক প্রশাসনিক দায়িত্ব উভয়ই নিয়ন্ত্রণ করত। 'দ্বুই ফাসি (যৌথ দায়িত্ব) এবং 'কেকেরয়ান' (সামরিক বাক্তিদের অসামরিক কর্তব্য পালন) জাতীয় ধারণা অবলম্বন করে সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রের আমলাব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে সিদ্ধান্তগ্রহণ নীতি নিরূপণের প্রতিটি আঙ্গিনায় ঢুকে পড়ে।

৭০-এর দশকে সামরিক বাহিনী ও রাষ্ট্রপতি সুহার্তোর মধ্যে মতপার্থক্য হলে সুহার্তো একদিকে বাহিনীর মধ্যে বিভাজন তৈরী করতে থাকেন ও অপরদিকে সংসদীয় ব্যবস্থাকে উৎসাহ দেবার জন্য

গোলকার নামক রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। গোলকার সামরিক প্রতিনিধিত্ব থাকলেও আমলাদের উপস্থিতি ও একে অপরের ভারসাম্য হয়ে ওঠে। উপরন্তু গোলকারের প্রতিষ্ঠার পর ধরে নেওয়া হল যে সামরিক বাহিনীরও খানিকটা হলেও অসামরিককরণ ঘটে, যার ফলে তারা রাষ্ট্রপতি সুহার্তোর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সামরিক বাহিনীর নিজস্ব দুর্নীতি তার দুর্বলতার কারণ হয়ে ওঠে যার সুযোগে সুহার্তো আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠেন এবং বাহিনীকে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সব দিক দিয়ে বিরোধীদের দখল করতে ব্যবহার করতেন। ফলে রিফর্মাসীতে (ইন্দোনেশিয়ায় অর্থনৈতিক মন্দা উত্তর গণতান্ত্রিক পরিবর্তন) সামরিক বাহিনী সুহার্তো বিরোধী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সংযত থাকে। কার্যত এটাই সুহার্তোর বাধ্যতামূলক পদত্যাগের কারণ হয়। উত্তর সুহার্তো অধ্যায়গুলিতে সামরিক বাহিনীর ব্যারাকে ফিরে যাবার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয়নি। যদিও বা কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটেছে যেমন দুই-ফাসি ধারণার প্রত্যাহার, আমলা ব্যবস্থা ও পুলিশি ব্যবস্থা থেকে বাহিনীর প্রত্যাহার। অপরদিকে বাহিনীর কাঠামোগত বিন্যাস পরিবর্তন, বা ব্যবসায়িক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ সীমিত করার প্রয়াস সফল হয়নি। এই ব্যর্থতার একাধিক কারণ আছে। প্রথমে, সুহার্তোর পতনে সামরিক বাহিনী বরিষ্ঠ ভূমিকা থাকায় উত্তর সুহার্তো ব্যবস্থার নেতৃত্ব নির্ধারণে বাহিনীর সক্রিয় ভূমিকা পালন করার দাবি করে। দ্বিতীয়, উত্তর সুহার্তো অধ্যায়ে অসামরিক নেতৃত্বের একতার অভাব তাদের বাহিনীর উপর নির্ভরশীল করে তোলে। তৃতীয়, এই পর্বে প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয়গোষ্ঠী ও বিচ্ছিন্নবাদী শক্তির সক্রিয়তা দেশের সংকট সৃষ্টি করায় পরিস্থিতি মোকাবিলায় সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন দেখা দেয়। চতুর্থ, সামরিক বাহিনীর কিছু মৌলিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার ক্ষমতা যেমন কাঠামোগত বিন্যাস ও ব্যবসায়িক স্বার্থ অটুট রাখতে পারায় সামরিক বাহিনী নিঃসহায় হয়ে পড়েনি। বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি জোকে উইদোদো প্রথম একজন ব্যক্তি যিনি সামরিক বাহিনী ও বিত্তশালীদের প্রভাব রহিত রাষ্ট্রপ্রধান। কাজেই যেটা দেশের সেটা হল তাঁর সংশোধন প্রক্রিয়া ইন্দোনেশিয়ার রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা সংযত করতে কতটা সফল হল।

২,৩.২ দি ফিলিপিন্স

ইন্দোনেশিয়ার তুলনায় ফিলিপিন্সের সামরিক বাহিনীর ভূমিকা আপেক্ষিকক ভাবে স্বল্পচর্চিত। তার কারণ বোধহয় এই যে ঐতিহাসিক ভাবে দেখলে দেখা যাবে যে সে দেশের সামরিক বাহিনী নিযুক্তির মাধ্যমে দেশের সংসদ, রাষ্ট্রপতি, এমনকি স্থানীয় প্রভাবশালীরাও বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছে। উপরন্তু দেশে সমাজতান্ত্রিক চাপ ও দক্ষিণ ফিলিপিন্সের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের আশঙ্কা ফিলিপিন্সের নিরাপত্তার বিষয়টিকে প্রধান করে তুলেছে। এই পরিস্থিতিতে সামরিক বাহিনী নিজেদেরে রক্ষাকর্তা মনে করতে থাকে। ১৯৫২ সালে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র ও ফিলিপিন্সের মধ্যে চুক্তির ফলে বিদেশি আক্রমণের ক্ষেত্রে মার্কিনী সহায়তার প্রতিশ্রুতি পাওয়ায় ফিলিপিন্সের সামরিক বাহিনী আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দিকেই মনযোগ

দেয়। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণেও অংশগ্রহণ করতে থাকে। ৫০ এর দশকে তারা সামরিক ও অসামরিক যৌথ প্রকল্পের দিকে মন দেয় ও একাধিক অসামরিক দায়িত্ব নিতে থাকে। ১৯৭২ সালে মার্কোস সামরিক আইন জারি করায় সামরিক বাহিনী আরও সক্রিয় ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রপতি মার্কোসের সঙ্গে সামরিক বাহিনীর ভালো সম্পর্ক থাকায় তার আত্মীয় ও বন্ধুরা সামরিক বাহিনীতে দায়িত্বপূর্ণ পদ অধিকার করে। বাহিনীর প্রশাসনের সঙ্গে এই সম্পর্ক, দুর্নীতি ও পক্ষপাতিত্ব শুধু সামরিক বাহিনীর কর্মযোগ্যতার ক্ষতি করেনি তার বিচ্ছিন্নবাদী বিরোধী কর্মসূচীও খানিকটা বিঘ্নিত করে।

মার্কোস পরবর্তী দুটি প্রশাসনিককালে তথা এ্যাকুইনো ও রামোস প্রশাসন বাহিনী পেশাদারি ভাবমূর্তি পূর্ণপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। তথা তার কর্তব্যের অভিমুখ বাহ্যিক নিরাপত্তার দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। রামোস প্রশানের সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণ এক অর্থে বৃথা হয়ে যায় কারণ ২০০১ সালে রাষ্ট্রপতি গ্লোরিয়া ম্যাকপাগল আরিও তাঁর বিপক্ষ এস্ত্রাদাকে রুখতে সামরিক বাহিনীর সাহায্য নেন। কাজেই তার পূর্বশরিকদের সামরিক বাহিনীর পেশাদারি ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনার প্রয়াস তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদ ও উন্নয়নের নামে ব্যর্থ করে দেন। ফলে একবিংশ শতাব্দীতে সামরিক বাহিনী আবার প্রশাসনিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফিলিপিন্সের নিরাপত্তা চুক্তি পুনর্নবীকরণ হওয়ায় সামরিক বাহিনী আরও বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে উঠেছে ও আরিও সরকার তাদের ওপর নির্ভরশীল।

ফিলিপিন্স শক্তিধর হয়ে উঠলেও বাহিনী অসামরিক ক্ষমতা দখল করেনি তার একাধিক কারণ আছে। প্রথম, সামরিক বাহিনীর বিকল্প কার্যবাহী প্রশাসনিক কাঠামো ও উন্নয়ন সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। দ্বিতীয় তারা ফিলিপিন্সের সুশিল সমাজ ও সাধারণ সমাজের বিরোধ করার ক্ষমতা সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ফলে সামরিক বাহিনী অসামরিক প্রশাসনের বিকল্প নয়। বর্তমান রাষ্ট্রপতি তৃতীয় বেনগিনো এ্যাকুইনো একদিকে যেমন প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের কথা বলেছেন তেমন বিচ্ছিন্নতাবাদ দমনে সামরিক আধুনিকীকরণের কথাও বলেছেন। ইদানীং দক্ষিণ চীন সাগরে নৌ বিতর্ক বাহিনীর ভূখণ্ডভিত্তিক অখণ্ডতা রক্ষা করার দায়িত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে এবং বর্তমানে তৃতীয় এ্যকুইনো প্রশাসন তাই চায়। কিন্তু আভ্যন্তরীণ সমস্যা সামরিক বাহিনীর ভূখণ্ড রক্ষার দায়িত্বে বাধা সৃষ্টি করেছে বলে মনে করা হয়। যতদিন এই সমস্যা থাকতে ততদিন সামরিক বাহিনীর প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ অব্যাহত থাকবে। বর্তমানে রাষ্ট্রপতির পক্ষে অপর্যাপ্ত সম্পদ নিয়ে সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণ তথা তার নিয়ন্ত্রণ করা বেশ কঠিন।

২.৩.৩ দক্ষিণ কোরিয়া

দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনীর সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সময়কাল হল ১৮৬১-১৯৮৮। ১৯৬১ সালে সামরিক প্রধান জেনারেল পার্ক চুং হিং-এর নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সামরিক বাহিনীর রাজনীতিতে প্রবেশ ঘটে। তিনি মার্কসবাদ বিরোধী ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রধান বি সিং মানকে

ক্ষমতাচ্যুত করেন। পরবর্তীকালে জেনারেল হি সামরিক বাহিনীকে দুর্বল করে দিয়ে একটি রাষ্ট্রপতি প্রধান ব্যবস্থার (ইউশিন ব্যবস্থা) প্রতিষ্ঠা করেন। এটি আধাসামরিক ব্যবস্থাও বটে। এই ব্যবস্থায় লক্ষণীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে এবং পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ সামরিক রাষ্ট্রের আকার ধারণ করে। সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শুধু সামরিক খরচের ব্যয় বৃদ্ধিই নয়, প্রশাসনিক পদে সামরিক মানুষজন নিযুক্তও হন। এই ইউশিন ব্যবস্থার ঘোর গণতন্ত্র বিরোধী ছিল। এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনে বদ্ধপরিকর। এরই বিরুদ্ধে ৭০ এর দশকে গণতান্ত্রিক আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে ওঠে।

জেনারেল পার্কের ইউশিন ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের তীব্রতা জেনারেল পার্কের হত্যার কারণ বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু ইউশিন প্রশাসনিক ব্যবস্থা চলতে থাকে। তার কারণ হল জনপ্রিয় গুয়াংজু আন্দোলনের উত্থানের পর নয়া সামরিক বা আধাসামরিক শক্তিগুলি জেনারেল চুন দু হুয়ানকে রাষ্ট্রের নেতৃত্বের দায়িত্ব দেন এবং ইউশিন সংবিধান বলবৎ থাকে। তাঁর সময়ে একনায়কতন্ত্র নয়, যৌথ নায়কতন্ত্র বা গোষ্ঠীনায়কতন্ত্র চলতে থাকে—হানহো গোষ্ঠীর তত্ত্বাবধানে। সামরিক আধিকারিকরা গুরুত্বপূর্ণ সামরিক দায়িত্ব পালন করতেন এবং অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ব্যক্তিরা রাষ্ট্রপতির সচিবালয়, গোয়েন্দা বিভাগ ও বিচার বিভাগের মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতেন। এবং এইভাবে ইউশিন সংবিধানের সাহায্যে জেনারেল চুনের প্রশাসন চলতে থাকে। ১৯৮৭ সালে প্রতিবাদের সম্মুখীন হয়ে নতুন সংবিধানের প্রয়াসও যেমন চলতে থাকে, তেমন জেনারেল চুন তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে রো তায় উকে বেছে নেন।

১৯৮৭-র জুন মাসের গণতান্ত্রিক উত্থান বহু দিনের গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ ও ক্ষোভেরই পরিণাম। রোহ তায় উ সামরিক আইন প্রয়োগের বিরোধিতা করেন ও রাজনৈতিক সংস্কার শুরু করতে চান। ১৯৮৭ এর সংবিধান রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নির্বাচন করতে সাহায্য করে, শুধু তাই নয়, ঘটনাচক্র দেখা যাচ্ছে যে বিরোধী প্রকৃত গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যের অভাবে রোহ তায় উ জয়লাভ করেন। সামরিক বাহিনীরও কিছু ভূমিকা আছে এক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব কিছু সংস্কার করে, সেই সংস্কারের লক্ষ্য ছিল সামরিক ব্যবস্থার উদারিকরণ ও আধা পৌর সরকার তৈরী করা। তা হয়ত করা যেত তার কারণ হল দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার সামরিক প্রধান ব্যবস্থার তুলনায় দক্ষিণ কোরিয়ায় সামরিক বাহিনী অর্থনৈতিক ভাবে বা প্রযুক্তিগতভাবে বা প্রতিষ্ঠানিক যোগাযোগের দিক থেকে কোনটাতেই ততটা সম্পদশীল বা বলিয়ান ছিল না। কিন্তু সমস্যা হল যে বাহিনীর মধ্যে হানহো গোষ্ঠী ও তার বিরোধীদের মধ্যে বিভেদ সামরিক বাহিনীর দুর্বলতার কারণ হয়ে ওঠে। কিন্তু অন্যদিকে বাস্তব হল যে গণতান্ত্রিক দলগুলির ঐক্যের অভাবে সামরিক পক্ষেরই একজন রাষ্ট্রপতি হন। রোহ তায় উ-র উত্তরসুরি হয়ে কিম ইউং স্যাম আসেন।

১৯৮৭ এর এক দশক গণতন্ত্রের পর ১৯৯৭ সালে কিম ডেই জং প্রথম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত

হন। কিম ডেই জং এর পূর্বসূরি হিসেবে রাষ্ট্রপতি রোহ মু হিউন যথেষ্ট সংস্কার করেছিলেন। দুর্নীতি দূরীকরণ, কর্তৃত্ববাদী কার্যকলাপ বন্ধ করা এবং মানব অধিকার রক্ষা করা। কিন্তু রাজনৈতিক সংস্কারের তুলনায় সামাজিক সংস্কারের অভাব দক্ষিণ কোরিয়ায় এখনও লক্ষণীয়। সামাজিক ও আঞ্চলিক বিভেদ ও দ্বন্দ্ব স্পষ্ট বিশেষ করে ১৯৯৭ এর আর্থিক সংকটের পর অর্থনৈতিক উন্নয়নের এতটাই মেরুকরণ হয়েছে যে সামাজিক ও আঞ্চলিক ব্যবধান ও দ্বন্দ্বগুলি আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। মনে রাখা উচিত যে দক্ষিণ কোরিয়াতে সাধারণ জনকল্যাণ ব্যবস্থা খুবই দুর্বল এবং বিশ্বায়নের প্রভাবে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন অসম বিকাশ ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাব মানুষের মনে অসন্তোষ ও উষ্মার জন্ম দিচ্ছে।

২.৪ সারসংক্ষেপ

- এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের বিবিধ রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলি দেখার পর বলা যেতে পারে যে সামরিক ও অসামরিক ব্যবস্থা একে অপরের সম্পূর্ণ বিরোধী নয়। তার কারণ অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেমন কর্তৃত্ববাদী প্রবৃত্তি দেখিয়েছে, ঠিক তেমনই কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থারও অনেক সময় বিরোধী পক্ষের চাপ সামলানোর জন্য কিছু উদারবাদী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
- এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের উন্নয়নমুখি নায়কতন্ত্রগুলির মূল ভিত হল এশিয়ান ভ্যালিউস যা সবসময়ই ব্যক্তির অধিক ব্যবস্থাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। অথচ পশ্চিমি দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সেটি হল কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থার লক্ষণ।
- এশিয়ার অর্থনৈতিক মন্দা উত্তর পর্যায়ে এই ধরনের উন্নয়নমুখি নায়কতন্ত্রগুলি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিল এবং সুপ্রশাসনের পক্ষে সওয়াল উঠেছিল। ফলে ইন্দোনেশিয়ার মতন দীর্ঘ নায়কতন্ত্র ভেঙে পড়েছিল। অথচ অনেক অন-উদার রাজনৈতিক ব্যবস্থাও এই অঞ্চলে অক্ষত রয়েছে যারা সংস্কারের পর উচ্চ অর্থনৈতিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখে।
- এই অঞ্চলে সামরিক বাহিনী নিঃসন্দেহে বলশালী কিন্তু তাদের ভূমিকা পৃথক দেশে পৃথক ফিলিপিন্সে সরকার অসামরিক সরকার, সামরিক বাহিনী নেপথ্যে। কিন্তু থাইল্যান্ড ও দক্ষিণ কোরিয়াতে বাহিনী প্রশাসনে আরও সরাসরিভাবে যুক্ত। ইন্দোনেশিয়ার সরকার দীর্ঘ সময় ধরে সামরিক ও অসামরিক জোটের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে।
- এই সব ব্যবস্থায় সামরিক বাহিনীর ব্যাপ্তি প্রায় সর্বক্ষেত্রে— শুধু প্রতিরক্ষাই নয়, পুলিশি দায়িত্ব, উন্নয়ন কর্মসূচি ও জাতিরাষ্ট্র নির্মাণ কাজে তারা যুক্ত। এই সকল দেশে সামরিক বাহিনীর আত্মবিশ্বাস যে তারা দেশের রূপকার, নির্মাণকর্তা রাজনৈতিক ব্যবস্থার অভিভাবক এবং সাধারণ ভাবে দেশের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য দায়বদ্ধ।

- এই অঞ্চলের উদীয়মান গণতন্ত্রগুলিতে যেমন ইন্দোনেশিয়ায় ফিলিপিন্সে ও দক্ষিণ কোরিয়াতে সামরিক ও অসামরিক সম্পর্কের মধ্যে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যুগ্ম প্রয়াস, সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা দুটোই দেখা যায়। বিশেষ করে দুটি পক্ষের শীর্ষস্তরের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বেশ স্পষ্ট।

২.৫ নমুনা প্রশ্নমালা

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

১. এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক কর্তৃত্ববাদের কারণগুলি উদাহরণের সাহায্যে বিশ্লেষণ করুন।

২. এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকার কারণগুলি ব্যাখ্যা করুন। আপনার বক্তব্যকে পুষ্ট করার জন্য ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপিন্সের উদাহরণ দিন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী

১. এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলে ফিলিপিন্সের মত নব্য গণতন্ত্রগুলির ভবিষ্যৎ আলোচনা করুন।

২. এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলিতে সামরিক বাহিনীর ব্যাপ্তি আলোচনা করুন।

৩. এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলে সামরিক-অসামরিক শক্তির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. টীকা লিখুন— 'এশিয়ান ভ্যালিউস্'।

২. গোলকার দল কী?

৩. ইউশিন ব্যবস্থা বলতে কি বোঝেন।

২.৬ গ্রন্থপঞ্জী

1. Vera Simone, *The Asian Pacific : Political and Economic Development in a Global Context*, Pearson, 2000

2. Giovanna Maria Dora Dore, et. al, *Incomplete Democracies in the Asia-*

Pacific : Evidence from Indonesia, Korea, the Philippines and Thailand, Palgrave Macmillan, 2014.

3. Vinod K. Aggarwal, *The Political Economy of the Asia Pacific*, Springer, 2011.

4. Tanweer Fazal, *Minority Nationalisms in South Asia*, Routledge, 2013

5. Rajat Ganguly and Ian Macduff, *Ethnic Conflict and Secessionism in South and Southeast Asia : Causes, Dynamics, Solutions*, Sage Publications 2003.

6. Michael Edward Brown and Rajat Ganguly, *Government Policies and Ethnic Relations in the Pacific*, MIT Press, 1997.

7. Jocelyn Linnekin, Lin Poyer, *Cultural Identity and Ethnicity in the Pacific*, University of Hawaii, 1990.

8. Paul Pickard and W. Jeffrry Burroughs, *Narrative and Multiplicity in Constructing Ethnic Identity*, Temple University Press, 2000.

9. Douglas S. Massey, "The New Immigration and Ethnicity in the US", *Population and Development Review*, Vol. 21, No. 3, September 1995, pp. 631-652.

10. J. Jupp, "Immigration and Ethnicity" Australian Cultural History : *The Journal of History of Culturel in Australia*, Vol 27, No, 2, 2009, pp. 157-166.

11. Jupp, J 2009, 'Immigrant settlement, ethnic relations and multiculturalism in Australia', in John Highly, John Nieuwenhuysen with Stine Neerup (ed.), *Nations of Immigrants : Australia and the USA Compared*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, pp. 147-159.

একক—৩ ❑ এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের আর্থ-রাজনীতি

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ ভূমিকা

৩.৩ এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের আর্থ-রাজনীতির প্রেক্ষিত

৩.৪ এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের অর্থনীতি

৩.৫ সারসংক্ষেপ

৩.৬ নমুনা প্রশ্নমালা

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্যগুলি হল—

- এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের সামগ্রিক আর্থ-রাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জ্ঞানলাভে সহায়তা করা।
- এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের অর্থনীতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা গঠনে সাহায্য করা।
- এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃতি ও তার প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে সহায়তা করা।
- এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা চুক্তি ও সংগঠন সম্পর্কে ধারণা গঠনে সাহায্য করা।

৩.২ ভূমিকা

এশিয়া প্রশান্ত একটা প্রাণবন্ত অর্থনৈতিক এলাকা। কিন্তু অনেকের মতে সমগ্র অঞ্চলের অর্থনৈতিক চরিত্র একরকম নয় কারণ ভিন্ন ভিন্ন অর্থনীতি তাদের নিজ নিজ রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিপূরক হয়েছে অথবা হয়নি। এছাড়া উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পার্থক্যও লক্ষণীয় যেমন 'ওয়াশিংটন সংকটের আঁচ যাদের স্পর্শ করেছে তথা উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলেশিয়া ভুক্ত রাষ্ট্রগুলি তারা

উদারনৈতিক নীতি অনুসরণ করেছে। অন্যদিকে পূর্ব এশিয়ার অর্থনীতিগুলিতে উন্নয়ন ও সংস্কারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকাই অগ্রগণ্য। তার থেকে বোঝা যায় যে পূর্ব এশিয়া নয়া উদারনৈতিক নীতি গ্রহণ করতে চায় না। চীন বা ভিয়েতনাম সরকারি তত্ত্বাবধানে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন হাসিল করেছে। যুদ্ধোত্তর জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও চোখে পড়ার মত। তার 'ডেভেলাপমেন্টাল স্টেট' কল্প বিত্তশীল বণিক শ্রেণী ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতারও উন্নয়নের একটা আদর্শ বিকল্পই শুধু নয়, 'নমনীয় কর্তৃত্ববাদের' একটা উদাহরণও বটে।

৩.৩ এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের আর্থ-রাজনীতির প্রেক্ষিত

অর্থনৈতিক বিন্যাসের উদ্ভব এই অঞ্চলের উপনিবেশিক ইতিহাস ও ঠান্ডা লড়াই-এর অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত ভূকৌশলগত গতিপ্রকৃতিতে পাওয়া যায়। উপনিবেশিক প্রসার, সামাজিক কাঠামোর ভাঙন ও রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের পতন, সবই অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কারণ নির্ধারণ করে দেয়। উপনিবেশিক কালে বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে একত্রীকরণ প্রক্রিয়ায় যে প্রভাব অনুভূত হয় সেটাই পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রতি অনাগ্রহের মূল কারণ। উপরন্তু ঠান্ডা লড়াই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বন্দ্ব, পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তর ভূকৌশলগত রাজনীতি পাল্টে দেয় এবং সামগ্রিক উন্নয়নের গতিপথের ওপরে তার প্রভাব পড়ে। একদিকে আদর্শগত মতভেদ আঞ্চলিক ঐক্য ও সংগঠন তৈরির ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। অন্য দিকে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বই প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে মনে হয়েছে।

৩.৪ এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের অর্থনীতি ঃ

প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের প্রথম লক্ষণ হল নিয়ন্ত্রিত মুদ্রাস্ফীতি। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলিতে স্ফীতির হার ২০১৩ সালের ৫ শতাংশের তুলনায় ১০১৪ সালে ছিল ৪.৮ শতাংশ। পুঁজি লগ্নিও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে ও বাণিজ্যিক গতিও অব্যাহত। ফলে এশিয়া ও প্রশান্ত অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও পুঁজিলগ্নির খতিয়ান প্রশংসাযোগ্য। কারণ বিশ্বঅর্থনীতির উৎপাদন জালক, মূল্যশৃঙ্খল ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সবই এই অর্থনীতিগুলিকে অবিশ্রান্ত সাহায্য করে চলেছে। ১৯৯৪ এর বোগোর লক্ষ্যসমূহ (Bogor Goals) অনুসারে অবাধ বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতাগুলি সরিয়ে দেবার চেষ্টা চলেছে। যেমন শুল্ক ও অন্যান্য ও অশুল্কজাত প্রতিবন্ধক। রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সত্ত্বেও এ্যাপেকের সদস্যরাষ্ট্রগুলি বিশ্ববাণিজ্যিক ব্যবস্থার নিয়ম মেনে নিয়েছে। চীন ও ভিয়েতনামের মতন কর্তৃত্বপ্রধান ব্যবস্থাগুলি বিশ্ব বাণিজ্যিক সংগঠনের সদস্য হয়েছে। যদিও এই অঞ্চলের অর্থনীতিগুলি ব্যক্তিরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা পরিচালিত, তবুও ক্রমন্বয় পারস্পরিক অর্থনৈতিক সুবিধাভিত্তিক ও বৈচিত্র্যভিত্তিক

সহযোগিতার ধারা বৃদ্ধি পেয়েছে। আসিয়ান ও এ্যাপেক জাতীয় অর্থনৈতিক আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলি আঞ্চলিকতা ও একীকরণ প্রক্রিয়া আরও তরান্বিত করবে প্রত্যাশা করা যায়।

বর্তমানে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বেশ মন্থর এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে সমস্যা প্রচুর। এশিয়া প্রশান্ত আর্থ সামাজিক পরিষদ অনুসারে (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific ESCAP) কাঠামোগত প্রতিবন্ধক এবং পুঁজির অভাব। এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিকাশের প্রধান অন্তরায়। বর্তমান উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলির উন্নয়নের হার ৬% থেকে ৫.৮% নেমেছে। ২০১৪ সালে পূর্ব ও উত্তরপূর্ব এশিয়ার অর্থনীতিগুলির উন্নয়নের হার ছিল ৪.১% যা ২০১০ সালের থেকে ১% কম। কিন্তু প্রশান্ত সাগরের দ্বীপসমূহের অর্থনীতিগুলি ২০১৩ র ৪% উন্নয়নের হারের তুলনায় ২০১৪ সালে ৪.৯% উন্নতি ঘটিয়েছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার অর্থনীতি গুলি উন্নতি ২০১৩ তে ৩.৯%, ২০১৪ তে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪.৭% হয়েছে। কিন্তু অনেক অর্থনীতির উন্নতি নিম্নগামী, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অর্থনীতি গুলির উন্নতির হার ২০১৩ সালে ৪.৯% থেকে ২০১৪ সালে ৪.৬% নেমে গেছে। একইভাবে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের বৃহৎ অর্থনীতিগুলি ও নিম্নগামী উন্নয়নের সূচক দেখাচ্ছে। ২০১৩ সালে যে উন্নতির হার ছিল তা ২০১৪ সালে কমে গেছে। চীন ৭.৭% থেকে ৭.৫%, ভারত ৫.৪% থেকে ৪.৭%। অবশ্য ইন্দোনেশিয়া ও রাশিয়ার উন্নতি ঘটেছে— ইন্দোনেশিয়া ২০১৩ তে ৫.৪% থেকে ২০১৪ সালে ৫.৮% পৌঁছেছে, রাশিয়া ০.৩% থেকে ১.৩% বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে সমস্যা হল তার উচ্চ সুদের হার। কড়া সুদের হার, ক্রয় ক্ষমতার প্রভাব ফেলে, ফলে চীন মার্কিনে পুঁজি লগ্নি ও রপ্তানি বৃদ্ধি দুটোই বৃথা হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এদিকে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক মতভেদ উভয়েরই অর্থনৈতিক ক্ষতি করবে। মার্কিন বাণিজ্যিক মহলের একাংশ উদার অর্থনীতির বিরুদ্ধে এবং চীনের পণ্য রোধ করার চেষ্টায় একাধিক প্রতিরোধক প্রয়োগের সমর্থক। অবশ্যই তা চীনে বাণিজ্যিক শ্রেণীর উদ্বেগের কারণ। এই প্রেক্ষিতে এ্যাপেকের অর্থনৈতিক একীকরণের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাণিজ্যগত ত্রুটি বৈষম্য দূরীকরণে তার মস্ত হাত আছে। এ্যাপেক গোষ্ঠীসংহতির উদ্দেশ্যে প্রধান হলেও বাণিজ্যিক পরামর্শের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা অগ্রগণ্য। পূর্ব উল্লেখিত বোগর আলোচনায় নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক উদারীকরণের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেই মুক্ত বাণিজ্যিক এলাকা প্রতিষ্ঠা করা এ্যাপেকের একটি প্রধান লক্ষ্য। ২০০১ সালে এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের লগ্নির দুর্বলতা ও কাঠামোগত অপ্রতুলতার জন্য অর্থনৈতিক বিকাশ সীমিত। উন্নতির জন্য এশিয়া বিজনেস্ এ্যাডভাইসারি কাউন্সিল (Asia Business Advisory Council ABAC) অনেক পরামর্শ দিয়েছে। ট্রান্স প্যাসিফিক পার্টনারশিপ (Trans Pacific Partnership TPP) রিজউন্যাল কম্প্রিহেন্সিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) প্যাসিফিক এ্যালায়েন্স (Pacific Alliance) এই ধরনের পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়ন করার কথা

বলেছে। এর জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন। তার উপমা হল আসিয়ান। আসিয়ান শুধু উদারীকরণ করছে তা নয়, তাদের উন্নত রাষ্ট্রগুলি (আসিয়ান ছয়) ও অনুন্নত চারটে রাষ্ট্র (তথা কম্বোডিয়া, মায়নমার, ভিয়েতনাম ও লাওস) রাষ্ট্রগুলির মধ্যে উন্নয়নগত ব্যবধান হ্রাস করবার উদ্যোগ নিয়েছে। যেমন ইনিশিয়েটিভ ফর আসিয়ান ইন্টিগ্রেশন (Initiative for ASEAN Integration, IAI) এবং ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট গ্যাপ (National Development Gap, NDG) প্রক্রিয়া। এ্যাপেক কে একই উৎসাহের সঙ্গে বাণিজ্যিক মুক্ত অঞ্চল সফল করতে হবে। তা খুবই শ্লথ গতিতে চলেছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বহুপাক্ষিক বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে— চীন আসিয়ান বাণিজ্যিক চুক্তি (China ASEAN Free Trade Area) বা আসিয়ান, কোরিয়া এবং চিলি নিউজিল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ব্রুনাই-বাণিজ্যিক চুক্তি (TPSEP)। এই সুবিধে প্রধান বাণিজ্যিক চুক্তিগুলি যতক্ষণ না এ্যাপেকের ছন্দে চলছে, তা এ্যাপেকের বৃহত্তর লক্ষ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক।

৩.৫ সারসংক্ষেপ

- এশিয়া প্রশান্ত অর্থনীতি এক ও অভিন্ন নয় কারণ তারই মধ্যে নানা ধরণের অর্থনীতি তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট সহ সহবস্থান করছে। অর্থনীতিগুলি রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিপূরক।
- সার্বিকভাবে বলা যায় যে উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও সংলগ্ন অর্থনীতি উদারপন্থি। এদিকে পূর্ব এশিয়ার অর্থনীতিগুলিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা অবিচল রেখেও ঈর্ষণীয় উন্নতি করেছে— চীন, জাপান, ভিয়েতনাম।
- অর্থনীতির অভিমুখ উপনিবেশিক অভিজ্ঞতার থেকে নিঃসৃত। উপনিবেশিক অভিজ্ঞতা উদার ব্যবস্থার প্রতি অনিচ্ছার সৃষ্টি করেছে। পরবর্তীতে ঠান্ডা লড়াই এর পর্বে রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলির এমনই বিন্যাস হয় যে রাষ্ট্র কর্তৃত্ব আরও বলশালী হয়ে উঠেছে।
- বর্তমানে এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চল অর্থনৈতিক ভাবে প্রাণবন্ত হলেও পুঁজি পরিকাঠামোর অভাব সম্পূর্ণ বিকাশের পথে প্রধান সমস্যা। এটি অতিক্রম করতে হলে বহুপাক্ষিক বাণিজ্যিক চুক্তির প্রয়োজন। এই চুক্তিগুলি নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করে অর্থনৈতিক একীকরণ সুনিশ্চিত করবে, এরকম আশা করা যায়।
- এ্যাপেকের বহুজাতিক বাণিজ্যিক ব্যবস্থা হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মতন বড় অর্থনীতির যেমন অসুবিধে করবে, তেমনি তুলনামূলক সুবিধের ভিত্তিতে ছোট অর্থনীতিগুলিরও উপকার করবে প্রত্যাশা করা হয়।

- এই লক্ষ্যে এ্যাপেক যদিও বা সম্পূর্ণ সংহতির লক্ষ্যপূরণ করতে পারেনি এশিয়া প্রশান্ত মুক্ত বাণিজ্যিক অঞ্চল স্থাপন করা তার প্রথম পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে বহুপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য সম্ভবপর হবে। অন্যদিকে আসিয়ান তাদের নিজস্ব উন্নয়নগত ব্যবধান হ্রাস করে এ্যাপেকের কাছে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

৩.৬ নমুনা প্রশ্নমালা

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

১. আঞ্চলিক আর্থ-রাজনৈতিক বিন্যাসে এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

২. এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের অর্থনীতিক প্রকৃতি বিশ্লেষণ করুন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী

১. এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাগুলি ব্যাখ্যা করুন।

২. এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংগঠনগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. ট্রান্স প্যাসিফিক পার্টনারশিপ বলতে কি বোঝেন?

২. টীকা লিখুন— 'এ্যাপেক' (EPEC)

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

1. Vera Simone, *The Asian Pacific : Political and Economic Development in a Global Context*, Pearson, 2000
2. Giovanna Maria Dora Dore, et. al, *Incomplete Democracies in the Asia-Pacific : Evidence from Indonesia, Korea, the Philippines and Thailand*, Palgrave Macmillan, 2014.
3. Vinod K. Aggarwal, *The Political Economy of the Asia Pacific*, Springer, 2011.

4. Tanweer Fazal, *Minority Nationalisms in South Asia*, Routledge, 2013
5. Rajat Ganguly and Ian Macduff, *Ethnic Conflict and Secessionism in South and Southeast Asia : Causes, Dynamics, Solutions*, Sage Publications 2003.
6. Michael Edward Brown and Rajat Ganguly, *Government Policies and Ethnic Relations in the Pacific*, MIT Press, 1997.
7. Jocelyn Linnekin, Lin Poyer, *Cultural Identity and Ethnicity in the Pacific*, University of Hawaii, 1990.
8. Paul Pickard and W. Jeffrry Burroughs, *Narrative and Multiplicity in Constructing Ethnic Identity*, Temple University Press, 2000.
9. Douglas S. Massey, "The New Immigration and Ethnicity in the US", *Population and Development Review*, Vol. 21, No. 3, September 1995, pp. 631-652.
10. J. Jupp, "Immigration and Ethnicity" Australian Cultural History : *The Journal of History of Culturel in Australia*, Vol 27, No, 2, 2009, pp. 157-166.
11. Jupp, J 2009, 'Immigrant settlement, ethnic relations and multiculturalism in Australia', in John Highly, John Nieuwenhuysen with Stine Neerup (ed.), *Nations of Immigrants : Australia and the USA Compared*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, pp. 147-159.

একক—৪ ❑ এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলে নৃকুলগত (Ethnic) সমস্যাসমূহ

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ ভূমিকা

৪.৩ দক্ষিণ এশিয়ার নৃকুল পরিচিতিসত্তা

৪.৪ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নৃকুল পরিচিতিসত্তা

৪.৫ প্রশান্ত দ্বীপ সমূহের নৃকুল পরিচিতিসত্তা

৪.৫.১ প্রশান্ত অঞ্চলে অভিবাস প্রধান রাষ্ট্রসমূহ

৪.৬ সারসংক্ষেপ

৪.৭ নমুনা প্রশ্নমালা

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্যগুলি হল—

- এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের নৃকুল-এর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুধাবনে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা।
- দক্ষিণ এশিয়া নৃকুলগত বৈচিত্র ও নৃকুলগত (ethnic) সমস্যাসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানলাভে সাহায্য করা।
- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতি রাষ্ট্র নির্মাণের প্রকৃতি ও সমস্যাসমূহ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভে সহায়তা করা।
- এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলে নৃকুলগত সমস্যার বিষয়ে ধারণা গঠনে সাহায্য করা।
- প্রশান্ত অঞ্চলে অভিবাস প্রধান রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে সহায়তা করা।

৪.২ ভূমিকা

নৃকুল পরিচিতি সত্তা এশিয়া ও প্রশান্ত অঞ্চল জুড়ে ব্যাপ্ত, ফলে তার প্রকৃতি জটিল। নৃকুল পরিচিতি সত্তা ও তার গতিপ্রকৃতি, এশিয়া ও প্রশান্ত অঞ্চলে ভিন্ন হলেও তাদের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে। যেমন একাধিক জাতিগোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠীর সহবস্থান। তাদের মধ্যে অনেকেই সামাজিক মূলস্রোতের মধ্যে নিজেদের জাতিসত্ত্বার একটি পৃথক পরিচিতি তৈরী করতে উৎসাহী। এ্যান্ডারমানের কাল্পনিক গোষ্ঠী ধারণা অনুসারে অনেকেই তাদের এই পরিচিতি রক্ষার স্পৃহাকে রাজনৈতিক আন্দোলন তথা পৃথক ভূখণ্ডের দাবির স্তরে নিয়ে গেছে। এই ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলনগুলিকে নৃকুলগত আন্দোলন বলে জানা হয়। অন্যদিকে সমাজে যেখানে নৃকুলগত ভেদাভেদ, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক লক্ষ্যের উত্তরোত্তর চাপ বাড়তে থাকে, সেখানে কাঠামো বা রাজনৈতিক জোট কোনটাই রাজনৈতিক বিপর্যয় রক্ষা করতে পারবে না। দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার একাধিক রাষ্ট্রে এর কথাটি লক্ষ্যণীয়—মালয়শিয়া, মায়নমার, শ্রীলঙ্কা, ফিজি। প্রশান্ত অঞ্চলের একাধিক জনগোষ্ঠী শুধু তাদের জাতিসত্ত্বা সম্বন্ধে সচেতনই নয়, তারা তাদের সাংস্কৃতিক বিশেষত্ব বজায় রাখতে চায়। অন্যদিকে বিশেষ কিছু এশিয়া প্রশান্ত রাষ্ট্র যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্টেলিয়াতে অভিবাসন ও নৃকুলগত পরিচিতির একটা সম্পর্ক নিয়ে অনেকেই আলোচনা করছেন। প্রত্যেকটি বিষয় পৃথক আলোচনার দাবি রাখে।

৪.৩ দক্ষিণ এশিয়ার নৃকুল পরিচিতিসত্তা

দক্ষিণ এশিয়ার জনবিন্যাসের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল ভাষা, ধর্ম, জাতি, বর্ণ ও নৃকুল পরিচয় ভিত্তিক বৈচিত্র। বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও খানিকটা প্রতিযোগিতামুখি ও খানিকটা দ্বন্দ্বপ্রধান। ফলে রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাগুলি এই ধরনের জটিল বর্ণবিন্যাস ও তদোৎপন্ন সংকট মোকাবিলা করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক রদবদল করেছে। তাতু ভানহানদের মতন পশ্চিমি বিশেষজ্ঞরা দক্ষিণ-এশিয়ার বর্ণবৈচিত্র নিরীক্ষণ করেছেন। জাতিগত, ভাষাগত, আদি ধর্মগত বিভাজনের ভিত্তিতে দেখা গেছে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত সর্বাধিক বৈচিত্রময় দেশ (বৈচিত্রের সূচক ১২৮) আফগানিস্তান ও ভুটানের বৈচিত্রের সূচক-৯০, নেপাল-৬০, শ্রীলঙ্কা-৫৭ এবং পাকিস্তান-৫৫। বাংলাদেশের বর্ণবৈচিত্র সবচেয়ে কম, সূচক-১৯। এখানে বলে নেওয়া উচিত যে নৃকুলগত বৈচিত্রের নির্ধারকগুলি সমান নয়। যেমন আফগানিস্তানে আফগান জনসমষ্টিকে অভিন্ন ভাবলেও বাস্তবে তারা ভাষা, ধর্ম ও গোষ্ঠী পরিচয়ের ভিত্তিতে দেশের ভিন্ন অংশে বসবাস করে। পুস্তুরা কিছু অংশে সংখ্যাগরিষ্ঠ তো অন্যান্য গোষ্ঠীরা যেমন তাজিক, হাজারা, উজবেক ও তুর্কমনরা আফগানিস্তানের পৃথক পৃথক প্রান্তগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ। সিংহভাগ

আফগান ধর্মের দিক থেকে সুন্নি মুসলমান, কিন্তু হাজারা ও তাজিক গোষ্ঠীরা শিয়া মুসলমান। বাংলাদেশ সাংস্কৃতি ও ভাষাগত ভাবে বর্ণ অভিন্ন রাষ্ট্র মনে হলেও শুধুমাত্র বাঙালীরা বসবাস করে না। অর্থাৎ বাঙলাভাষা প্রধান হলেও ধর্মের দিক থেকে মুসলমান হলেন ৮৮% ও হিন্দুরা সংখ্যালঘু। চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকায় উপজাতিরা গোষ্ঠী ১%। তারা বাঙালী মুসলমানদের থেকে ভাষা, ধর্ম, বর্ণ সবদিকে থেকেই ভিন্ন বলে বাঙলাদেশের বর্ণ বৈচিত্র আপেক্ষিকভাবে সবথেকে কম হলেও আছে। ভূটান, বর্ণ, ভাষা ও ধর্মের ভিত্তিতে অন্যতম ভেদাভেদ সম্পন্ন রাষ্ট্র। ভূটানের মোট জনসংখ্যার ৭০% হল দ্রুপকারা। কিন্তু তারা মঙ্গোলয়েড বা ইন্দো-মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীতে বিভক্ত। পূর্ব ভূটানে অবস্থিত সারচোপরা হল ভূটানের আদি অভিবাসী বাসিন্দা, তারা উত্তরপূর্ব ভারত ও বার্মা থেকে আসে ফলে তাদের ইন্দোমঙ্গোলয়েড বলা হয়। নাগলোঙ্গেরা সারচোপ জাতীর দমন ঘটিয়ে তাদের বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করে। নাগলোঙ্গেরা তিব্বতী ভাষা জংখ্যায় কথা বলে। সারচোপেরা অ-তিব্বতী বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করে। নেপালীরা সংখ্যালঘু এবং দক্ষিণ ভুটানের ছটি জেলায় বসবাস করে। তারা বর্ণগতভাবে মিশ্র ককেশায়ড ও ধর্মের দিক থেকে হিন্দু। ১৮৮০ সালের পর থেকে তারা দক্ষিণ ভূটানের ওই ছটি জেলায় বসবাস করতে আরম্ভ করে। পাকিস্তানের জনসমষ্টি জাতিগত ভাবে (ককেশয়েড) ও ধর্মের ক্ষেত্রে (মুসলমান) এক চরিত্রের হলেও ভাষার ভিত্তিতে তারা পাঁচটি জাতিগোষ্ঠীতে গুচ্ছিত—পাঞ্জাবী, সিন্ধি, পাতুন, বালুচ এবং মুজাহির। মুজাহিরা দেশ বিভাগের ফলে ভারত থেকে শরণার্থী রূপে ১৯৪৭-এ পাকিস্তানে চলে আসে। বাকি চারটি জাতিগোষ্ঠীরা ভিন্ন ভিন্ন এলাকা দখল করে। ইসলাম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্ম (৯৭%) কিন্তু সংখ্যালঘু ধর্ম হিসেবে হিন্দুরা ও খ্রীষ্টানরাও আছেন। ভারতের জনসংখ্যা জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও নৃকুলগত পরিচয়ের ভিত্তিতে শুধু বিভক্তই নয় নৃকুল গোষ্ঠীগুলির কিছু বৈশিষ্ট্য অনেকক্ষেত্রে অপর কোন গোষ্ঠীর সঙ্গে জটিলভাবে যুক্ত। জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে সমগ্র দেশভাসী—নিগরিটো, প্রটো-অস্ট্রেলোয়েড, মঙ্গোলয়েড, পোলাউ মঙ্গোলয়েড ও তিবেতো মঙ্গোলডেয়), মেডিটেরেনিয়ান্স, ওয়েস্টার্ন ব্রাচিসিফালস্ (আল্পিনিসম ও জইনারিক্স) ভাগে বিভক্ত। ভাষার দিক থেকে হিন্দি (৩০%) সরকারি ভাষা হলেও অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষাও জনপ্রিয়। ভারতে একাধিক ধর্মাবলম্বী মানুষ বসবাস করে যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠ হল হিন্দু (৮৩%) সংখ্যালঘু মুসলমান (১১%) খ্রীষ্টান (২.৭%), জোরাসট্রিয়ান্স। হিন্দুরা বর্ণব্যবস্থা অনুসারে একাধিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত। তাদের মধ্যে ১৬% হল তফশিলি জাতি যারা সাবেকি হিন্দু বর্ণব্যবস্থার প্রায় বহির্ভূত এবং অস্পৃশ্য বলে বহুকাল ধরে চিহ্নিত। নৃকুল গোষ্ঠীরা তফশিল উপজাতি বলে পরিচিত এবং তারা দেশের ৮% মানুষ।

জাতিগত বিভেদ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন হলেও তারা জাতি বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, বিদ্রোহ, সন্ত্রাস ও গৃহযুদ্ধের মত তীব্র সংকট তৈরী করেছে। অন্তত দক্ষিণ এশিয়ার তিনিট

দেশ স্বাধীনতার পর থেকে জাতি সমস্যার সম্মুখীন—ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে জাতি বিদ্বেষ ও পরবর্তীতে বিদেশি হস্তক্ষেপে দেশ ভেঙে বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়। ভারতের বর্ণ বিন্যাস অত্যন্ত জটিল হওয়ায় জাতি আন্দোলন বেশি। এই নৃকুলগত আন্দোলন ও সংকট মোকাবিলা করার ক্ষমতা রাষ্ট্র ও তার প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে। সাধারণত ধরে নেওয়া হয় যে কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থা অধিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে জাতিগত রাজনৈতিক দুর্নীতি মোকাবিলা করা যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে ভারতের জাতিগত সমস্যার তীব্রতা ব্যাখ্যা করা কঠিন। বাস্তব হল যে আসলে দক্ষিণ এশিয়ার জাতিগত আন্দোলনের শিকড় রয়েছে ইতিহাসের প্রাক উপনিবেশিক ব্যবস্থায়। তার প্রভাব বর্তমানের নৃকুলগত গোষ্ঠী পরিচয় ও সাম্প্রতিক আন্দোলনে লক্ষণীয়, যেমন তামিল বিচ্ছিন্নবাদীদের উত্তর শ্রীলঙ্কায় 'এলামে' দাবি তাদের ঐতিহাসিক বিশ্বাসের মধ্যে নিহিত। তারা বিশ্বাস করে যে প্রাচীনকালে উত্তর শ্রীলঙ্কা তামিল শাসনের অধীনস্ত ছিল। একইভাবে ইতিহাসকে হাতিয়ার করে সিংহলিরা সমগ্র দেশে অবিচ্ছিন্ন রাজত্বের দাবি রাখে। তারা দেশের কোনরকম বিভাজনের বিরোধীতা করেছে। এছাড়া প্রাক্ উপনিবেশিক নৃকুল গোষ্ঠীগুলি বা সামন্তবাদী ব্যবস্থাগুলি আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার তীব্র বিরোধী কারণ তারা মনে করে তাদের সাবেকি প্রশাসনিক ব্যবস্থার ও সম্পদের ওপর আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা বা অভিবাসী সম্প্রদায় কারোরই অধিকার নেই। উপরন্তু আধুনিক উত্তর উপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তারা বঞ্চনার শিকার হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় নৃকুলগত আন্দোলনের পথ ধরেছে। তাদের আভ্যন্তরীণ উপনিবেশিকতার অনুভূতি আত্মবিকাশের দাবি আরও মজবুত করলেও রাষ্ট্র দৃষ্টিতে উপজাতিয়তাবাদী আন্দোলন রাষ্ট্রদ্রোহ ও নিরাপত্তার সংকট এবং তাকে দমন করার জন্য রাষ্ট্র যাবতীয় ব্যবস্থা নেয়।

৪.৪ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নৃকুল পরিচিতিসত্তা

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নৃকুলগত সমস্যাগুলি অত্যন্ত বিচিত্র ও জটিল। দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই অর্থে সাদৃশ্য আছে যে এই অঞ্চলও নৃকুল বৈচিত্রে পরিপূর্ণ। জেরার্ড ক্লার্কের মত কিছু পণ্ডিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসবাসরত নৃকুল গোষ্ঠী ও আদি বাসিন্দাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। তিনি বলেন নৃকুল গোষ্ঠীগুলি সংস্কৃতি, ভাষা ও ধর্মের ভিত্তিতে নির্ধারিত। অন্যদিকে আদি বাসিন্দারা একটি অঞ্চলের আদি পুরুষদের বংশজ বলে চিহ্নিত হয়। আপেক্ষিকভাবে নৃকুল গোষ্ঠীগুলি পরদেশী এবং তারা তাদের কোন মৌলিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নিজেদের পরিচিতি রক্ষা করার চেষ্টা করে। যেমন ফিলিপিন্সের বসবাসরত মোরোরা সেখানকার নৃকুল গোষ্ঠী হলেও তাদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মগত যোগাযোগ মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে। আবার মালয়শিয়ান আদি বাসিন্দা ওরাং আসলিরা হলেন মালয়শিয়া উপদ্বীপের বসবাসকারি এবং তারা পূর্ব মালয়শিয়ার দায়াকদের থেকে ভিন্ন। দায়াকদের বরঞ্চ বর্নিওর

পূর্ব কালিমান্ডানে অবস্থিত নৃকুল গোষ্ঠীদের সঙ্গে অনেক বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্য আছে। কিন্তু অনেক দেশেই দুটি বিষয় নৃকুল গোষ্ঠী ও আদি বাসিন্দা এদের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে না এবং দুটিকেই একভাবে। যেমন ভিয়েতনামে আদি বাসিন্দা মেমের ও উপজাতি সংখ্যালঘু গোষ্ঠী কিনহ দেদের মধ্যে কোন বিভেদ করে না। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে অনেক ক্ষেত্রেই নৃকুলগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলি অন্যদেশের নৃকুল গোষ্ঠীগুলির সাংস্কৃতি বা ভাষার সঙ্গে কোন না কোন যোগ অনুভব করে, ফলে তাদেরকে সরকার ও সংখ্যাগরিষ্ঠ উভয়ই বিদেশি ভাবে। এই ধরনের ভাগ্য পেয়েছে 'হমা' নৃকুলগোষ্ঠী যারা দিক্ষণ চীন, ভিয়েতনাম, লাওস ও থাইল্যান্ড বিদেশি হিসেবে চিহ্নিত, চাম জাতিরা ভিয়েতনামে ও কাম্বোডিয়ায়, ও নাগারা মায়েনমারে। এই ধরনের জাতিগুলিকে উপজাতি সংখ্যালঘু রূপে দেখা হয় এবং তারা অন্যান্য সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতিদের থেকে ভিন্ন বলে মনে করা হয়। এছাড়া ভাষাভিত্তিক পরিচিতি বা ধর্মগত পরিচিতি এসবের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই মিলেমিশে যায়। তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল দক্ষিণ ফিলিপিন্সের মোরো মুসলমানরা। অনেক সময় রাষ্ট্র এই উপজাতিদের ধর্মভিত্তিক পরিচিতি দমন করার চেষ্টা করেছে এবং তাদেরকে প্রতিক্রিয়াশীল হতে বাধ্য করেছে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বেশিরভাগ কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলি, যেমন ভিয়েতনামে, বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে এই ধরনের বঞ্চনার অভিযোগ আছে এবং তারা এমন প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতার পর ইন্দোনেশিয়াতেও কিছু ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় কার্যকলাপ লক্ষ্য করা যায়।

সমগ্র দক্ষিণপূর্ব এশিয়া প্রবাসী উপজাতি চীনারা, শুধু অর্থনৈতিকভাবে ধনী নন, তারা সামাজিক ও রাজনৈতিক বৃত্তে অনেক সাংগঠিত। ইন্দোনেশিয়া, মালয়শিয়া এবং সিঙ্গাপুর এবং কতকটা ফিলিপিন্স, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডে চীনার মূলস্রোতের সঙ্গে অনেকটাই মিশে গেছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের তারা বেসরকারি ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করে, ফলে বর্তমান দশকগুলিতে তারা আর্থিকভাবে লাভবান। অথচ তারা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শুধু দুর্বলই নয়, ভুক্তভোগীও বটে। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়শিয়াতে তাদের সাফল্য সংখ্যাগরিষ্ঠদের ঈর্ষার কারণ এবং শুধু হিংসাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে তারা সরকারি নিয়ন্ত্রণের সম্মুখীন হয়ে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার সরকার ও মালয়শিয়ার সরকার চীনাদের তুলনায় দেশবাসীদের আলাদা সুবিধে দেবার জন্য প্রিভুমি (ইন্দোনেশিয়ায়) ও ভূমিপত্র (মালয়শিয়ায়) দুটি নীতি চালু করেছে। তার আর একটি উদ্দেশ্য হল সাংস্কৃতিক কুক্ষিকরণ। এছাড়াও ১৯৯৭ ও ১৯৯৮ এ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় অর্থনৈতিক মন্দাকালে চীনা প্রবাসীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা, খুন ও ব্যবসায়িক লুঠতরাজ তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ঈর্ষার প্রমাণ।

এই অঞ্চলে জাতিরাষ্ট্র নির্মাণের কাজেও অনেক বিড়ম্বনা আছে। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রগুলি নৃকুল গোষ্ঠীগুলির উদ্দেশ্যে উপনিবেশিক প্রশাসনিক ধারা প্রয়োগ করে বলেই নৃকুল সংকট গড়ে ওঠে। এই

ধরনের প্রশাসনিক মানসিকতায় নৃকুলগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র দেশের একতা ও সামাজিক সংহতির পক্ষে ক্ষতিকারক বলে ধরে নেওয়া হয়। কাজেই বৈচিত্রকে ঐক্যের মোড়কে মুড়ে নেবার চেষ্টা চলে সব সময়। মায়েনমার, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড ও কাম্বোডিয়ায় উপজাতি সংখ্যালঘুদের মূলধারায় সমন্বিত করাই মূল সমস্যা। এদের মধ্যে অন্তত তিনটি আন্দোলন সশস্ত্র বিচ্ছিন্নবাদের স্তরে চলে গেছে—থাইল্যান্ডে, মায়েনমার ও ফিলিপিন্সে। এছাড়া পাপুয়া অঞ্চলে ধীরিধীরি একটা জাতিগত দ্বন্দ্ব রয়েছে। তাদের কাজকর্মে সন্ত্রাসবাদের ছায়া লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে ফিলিপিন্সে বাইরের উপদ্রবের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এই ধরনের নৃকুলগত হিংসা এবং সংশ্লিষ্ট সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দমন করার জন্য শুধু পুলিশ ও সামরিক সক্রিয়করণই যথেষ্ট নয়, তার পাশাপাশি উন্নয়নের মাধ্যমে উপজাতীয় গোষ্ঠী ও আদি বাসিন্দাদের যথার্থ উপকার করা প্রয়োজন। এই ধরনের চিন্তাধারা এমন প্রাধান্য পাচ্ছে। সৌভাগ্যবশত ৮০ এবং ৯০-এর দশক থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক রাষ্ট্রই গণতান্ত্রিক হয়ে উঠেছে বলে প্রত্যাশা করা যায় যে তারা নৃকুলগত সংখ্যালঘুদের প্রতি সংবেদনশীল হবে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির পাশাপাশি সুশিল সমাজের কর্মবিস্তারের ফলে অনেক সংগঠনই এখন নৃকুল গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা ও প্রতিনিধিত্ব করছে। কিন্তু এটাও সত্য যে বিশ্বায়নের ফলে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোগুলি সমাজকে বর্ণ অভিন্ন, বৈচিত্র রোহিত করে ফেলেছে। এমন অবস্থায় সংখ্যালঘুরা কোনঠাসা হয়ে পড়েছে। সেক্ষেত্রে নৃকুলগত সংখ্যালঘুদের ও আদি বাসিন্দাদের জ্ঞাতিরাষ্ট্রের মূল স্রোতে যথার্থ স্থান তৈরী করে দিতে সুশিল সমাজের নায়কদের আরও তৎপর ও সক্রিয় হতে হবে।

৪.৫ প্রশান্ত দ্বীপসমূহের নৃকুল পরিচিতিসত্তা

প্রশান্ত দ্বীপসমূহ বৃহৎ সামুদ্রিক অঞ্চল জুড়ে ব্যাপ্ত। দক্ষিণে আর্কটিক অঞ্চল থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণ আমেরিকা এবং ওসানিয়া অঞ্চলের দ্বীপসমূহ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ওসানিয়া অঞ্চলের কিছু কিছু দ্বীপগুলিতে মানুষের বসবাস। এই দ্বীপগুলি তিনটি গুচ্ছে গুচ্ছিত—মিলেনেশিয়া, মাইক্রোনেশিয়া ও পিলিনেশিয়া। এছাড়া প্রশান্ত সাগরের সীমান্তের মধ্যে কিছু দ্বীপ আছে যেগুলি ওসানিয়া অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত নয়। বর্ণ বিন্যাস ও নৃকুলগত বৈচিত্রে দৃষ্টিভঙ্গির থেকে এগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এই অঞ্চল নৃকুলগত গঠন বোঝার জন্য তিনটি দ্বীপপুঞ্জ—মিলেনেশিয়া, মাইক্রোনেশিয়া ও পলিনেশিয়া সবগুলিই গুরুত্বপূর্ণ। নিউ গিনি, দ্যা বিসমার্ক এবং লুইসিয়াডে দ্বীপমালা, এ্যাডমিরালিটি দ্বীপসমূহ, নিউ ক্যালেজোনিয়া ও ল্যএলটি দ্বীপসমূহ, ভানাউতু, ফিজি, নরফক দ্বীপসমূহ এবং আরো কিছু দ্বীপ মিলেনেশিয়া দ্বীপগুচ্ছ অন্তর্ভুক্ত। মাইক্রোনেশিয়ার দ্বীপগুচ্ছে অন্তর্ভুক্ত হল—কিরিবাতি, নাউরু, মারিয়ানাস, মার্শাল দ্বীপসমূহের প্রজাতন্ত্র, পালাউ, মাইক্রোনেশিয়ার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত দ্বীপগুলি

(ইয়াপ, চুক, পহনপেই, কসরেই এবং ক্যারেলিন দ্বীপগুলি)। পলিনেশিয়া, দ্বীপ অঞ্চলের একাংশ একটি ত্রিভূজীয় গঠনে দেখা যায় যার উত্তরে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিমে নিউজিল্যান্ড এবং পূর্বে ইস্টার দ্বীপসমূহ। পলিনেশিয়ার বাকি এলাকায় রয়েছে সামোয়ান দ্বীপসমূহ, কুফু দ্বীপসমূহ, ফরাসী পলিনেশিয়া, নিউই দ্বীপগুলি তোকেলা ও তুভালু, টোঙ্গা, ওয়ালিস, ফতুনা এবং পিটক্যাইর্ন দ্বীপসমূহ। ভাষার ভিত্তিতে এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের তিনটি ভাগ করা যায় যথা—অস্ট্রোনেশিয়ান ভাষা গোষ্ঠী, এ্যাবর্জিন্যাল ভাষা গোষ্ঠী, পাপুয়ান ভাষা গোষ্ঠী। ভৌগোলিক দিক থেকে অস্ট্রোনেশিয়ান ভাষা গোষ্ঠীরা হল ওসানিয়ার সব ভাষা। পলিনেশিয়া, মাইক্রোনেশিয়া ও মিলেনেশিয়ার ছোট দ্বীপে বসবাসকারী ২৩ কোটি মানুষ। পাপুয়ান ভাষা ব্যবহার করে নিউগিনি ও তার উত্তরপূর্ব উপকূলের কাছে অবস্থিত মিলেনেশিয়ার কিছু ছোট দ্বীপে অবস্থিত প্রায় ৭ কোটি মানুষ। অস্ট্রেলিয়ায় এই দ্বীপের বাসিন্দাদের বলা হয় সাউথ সি আইল্যান্ডার্স, নিউজিল্যান্ডে তাদের প্যাসেফিক আইল্যান্ডার্স বলে জানে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাওআইর গুআম ও সামোআর বাসিন্দাদের আদি হাওআইয়ান ও গুয়ামানিয়ানস অথবা চামারো এবং সামোয়ানস্ বলে। অবশিষ্ট প্রশান্ত দ্বীপসমূহের বাসিন্দাদের অ্যাদর প্যাসিফিক আইল্যান্ডার্স বলে জানে। প্রশান্ত দ্বীপগুলির লক্ষণীয় সংখ্যক বাসিন্দা এই মহাদেশগুলিতে বসবাস করে। ফলে তাদের ও মহাদেশবাসীদের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রে শুধু গবেষণাই চলছে না, প্রবাসী দ্বীপবাসীদের অধিকার রক্ষার্থে বিশেষ আইনও রূপায়ন করা হয়েছে।

এই দ্বীপগুলি ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে দ্বীপসমাজগুলি বিচ্ছিন্ন, জীবন ধারায় বাহিত হয়ে চলেছে। এমনকি মিলেনেশিয়া বা পলিনেশিয়া দ্বীপগুচ্ছগুলির পারস্পরিক সম্পর্কও খুব সীমিত। অধিউপজাতীয় গোষ্ঠী প্রায় সংখ্যায় কম, তারা ফিজি, টোঙ্গা ও সামোয়াতে থাকে উপনিবেশিক প্রভাবে তাদের চারদিকে পরিবর্তন ঘটেছে। সেদিক থেকে ওসানিয়ার বেশির ভাগ সমাজ হল উত্তর উপনিবেশিক সমাজ। উপনিবেশ থেকে মুক্তি পেতে তাদের দীর্ঘ জাতিয়তাবাদী সংগ্রাম করতে হয়েছে। কিছুকাল অন্যের অভিভাবকত্ব স্বীকার করতে হয়। তার প্রভাব সবটাই বর্তমান ব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায়। উপনিবেশিকতা জীবনযাত্রা আধুনিক করলেও উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলিকে মানিয়ে নিতে সাহায্য করেনি। উপরন্তু উপনিবেশিক প্রভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই গোষ্ঠীগুলির জটিল সমীকরণ সংকট ও সংঘাত সৃষ্টি করেছে। শুধু উপনিবেশিক কারণেই নয়, ঐতিহাসিক দমন পীড়নের সম্পর্কের কারণে উপজাতীয় অন্তর্ঘাত বর্তমানে প্রকট হয়েছে। কিন্তু উপজাতীয় সংকটের অন্যতম বড় কারণ হল উপনিবেশিক আমলে সীমান্ত নির্ধারণ প্রক্রিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে সীমান্ত নির্ধারণের সময় উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলির আবেগ ও আবেদন কোনটাই মানা হয়নি। ফলে একই নৃকুল গোষ্ঠীর মানুষ বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যেমন সামোয়া গোষ্ঠীর মানুষ দুটি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক অংশে বিভক্ত তথা মার্কিন সামোয়া ও পশ্চিম সামোয়া।

বেগানভিলিয়ান্স সোলোমান আইল্যান্ডসের অধিক পাপুয়া নিউগিনি তে বসবাস করে। আবার ডাচ উপনিবেশের দৌলতে পশ্চিমি পাপুয়ান্সগণ মিলিনেশিয়ান দ্বীপ অঞ্চলের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও তারা ইন্দোনেশিয়ার ইরিয়ান জায়াতে বসবাস করেন। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে জাতিরাষ্ট্র গঠনের যে উদ্যোগ তা সাবেকি নৃকুলগত পরিচিতি ও সত্ত্বা দুর্বল করতে ব্যর্থ। বরঞ্চ তা ভবিষ্যতের জাতি সংকটের বীজ বপন করেছে। আইনি, রাজনৈতিক এবং আদর্শগত কাঠামো পরিমার্জন উপকারের থেকেও বেশি উপজাতীয় প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে। জমি অধিকার, চাষের অধিকার, নৃকুল গোষ্ঠীদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। প্রশান্ত দ্বীপগুলির অর্থনীতি ও রাজনীতি কার্যত নৃকুল পরিচিতি সত্তার সমীকরণের দ্বারা নির্ণীত। নৃকুল পরিচিতি বর্ণভিত্তিক পরিচিতি, ধর্ম বিশ্বাস এবং উপাচার, গোষ্ঠীসত্ত্বা ঐতিহাসিক যোগ এগুলি জাতিসত্ত্বা রক্ষা করতে সাহায্য করেছে।

এই ধরনের গোষ্ঠী পরিচিতি ও সনাতনী মূল্যবোধের প্রাধান্য নৃকুল জাতীয়তাবাদের সম্ভবনা তৈরি করেছে। নৃকুল জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রীয় সীমান্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতেও পারে বা নাও পারে। অনেকক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্র একাধিক নৃকুল গোষ্ঠী বসবাস করে। মনে রাখতে হবে যে প্রশান্ত দ্বীপগুচ্ছের জাতীয়তাবাদী ধারণা কোন মতাদর্শ নয়, তাদের নিজস্ব, বর্ণভিত্তিক, সাংস্কৃতিক এবং ভাষাভিত্তিক যোগের অনুপ্রেরণায় সৃষ্ট। পৃথিবীর অন্যান্য অংশে রাষ্ট্র সাংস্কৃতিক গঠন না হয়ে রাজনৈতিক গঠন হিসেবেই পরিচিত। কিন্তু প্রশান্ত দ্বীপ অঞ্চলে বিচ্ছিন্নবাদের মাধ্যমে একটিও রাষ্ট্র তৈরী হয়নি। নৃকুলগত পরিচিতি ভিত্তিক সত্ত্বা স্থাপনের ইচ্ছা আন্দোলনের সৃষ্টি করলেও রাষ্ট্রের ভাঙন ঘটাতে পারেনি। এই অঞ্চলে নৃকুল পরিচিতি প্রধান আন্দোলন বা জাতীয়তাবাদ এতটাই অবাস্তব যে যদি প্রত্যেকেই পৃথক রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করে তাহলে বাস্তবে তার কার্যকারিতা ব্যর্থ হবে।

এই অঞ্চলে কিছু রাষ্ট্র আছে যেমন ফিজি যেখানে দীর্ঘ নৃকুল পরিচিতিগত সংঘাত ও অশান্ত পরিবেশের জন্য দেশের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছে উপনিবেশিক আমল থেকে ভারতীয়রা ফিজিতে আখের চাষে শ্রমিক হিসেবে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করে। ক্রমশ ফিজিয়ান ও ভারতীয় ফিজিয়ানদের মধ্যে সংগ্রাম বৃদ্ধি পায়। ১৯৮০-এর দশকের দাঙ্গার পর থেকে ভারতীয় অভিবাসীরা ভীতিবশতঃ দেশ ছেড়ে গেলে ফিজির অর্থনীতি বিপন্ন হয়। ১৯১৪-এর গণতান্ত্রিক নির্বাচনের আগে ফিজিতে একাধিক রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা ও রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে। বৌগনভিলাতে সবচেয়ে দীর্ঘায়িত পরিচিতিভিত্তিক সংকট দেখা গেছে। ভৌগনভিলাবাসী পাপুয়া নিউগিনি অধিক সোলোমান আইল্যান্ডসের প্রতি তাদের দুর্বলতা। জমির সংকটকে (মূলত পানগুনা তামার খনি) ও খননের অধিকারকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন শুধু হয় সেটাই বিপ্লবের আকার ধারণ করে। ১৯৯০-এর বিদ্রোহী ও পাপুয়া নিউগিনি সরকারের মধ্যে গৃহযুদ্ধ সোলোমান আইল্যান্ডস ও পাপুয়া নিউগিনির মধ্যে সম্পর্কের অবনয়ন

ঘটায়। ২০০০ সালে নিউজিল্যান্ডের মধ্যস্থতায় বৌগনভিলা সরকারের যে স্থায়িত্ব শাসন ব্যবস্থা চুক্তি হয়, সেটি সেখানকার আন্দোলনের নেতারা অস্বীকার করে। আন্দোলনের মধ্যেও বিভাজন হয়ে গেছে। পশ্চিমি সমর্থনপ্রাপ্ত আন্দোলনকারী ও স্বঘোষিত রাজা ফান্সিস ওনার মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। ২০০০-এর শান্তি চুক্তি অনুসারে বৌগনভিলাবাসী গণভোটের সুযোগ পাবে। ২০১৫ অবধি সেই গণভোট নেওয়া হয়নি।

ব্রাহাম হাসেলের মত বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সবসময় বিচ্ছিন্ন হবার জন্য নয়। রাষ্ট্রের প্রতি অসন্তোষের প্রতিক্রিয়ায় দানা বাঁধে। এর থেকে নৃকুল গোষ্ঠীদের প্রতি অধিকার, সুবিধে ও গণতান্ত্রিক সুযোগ সুবিধের মানদণ্ড নির্ধারণ করা যায়। সত্যি হল যে ওসানিয়া অঞ্চলের অধিকাংশ রাষ্ট্রই গণতান্ত্রিক। কিন্তু গণতন্ত্রের কোন একটি নির্দিষ্ট নক্সা নেই যার মাধ্যমে প্রত্যেকটি নৃকুল গোষ্ঠীর প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ করা যাবে। বেশির ভাগ রাষ্ট্রেই হল সনাতনী গ্রামীণ সমাজ এবা পশ্চিমি গণতন্ত্র অনেক ক্ষেত্রে দুটির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে ব্যর্থ। দেখা গেছে সনাতনী কর্তৃত্ব ও আইনি ব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক ব্যবস্থায়িক বিন্যাস, প্রাধ্যানিকরণের সমস্যার সৃষ্টি করে। দৃষ্টিভঙ্গিগত সংঘাত ঘটায়। সবচেয়ে সঙ্কট প্রধান বিষয়গুলি হল যুদ্ধ এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া, সংঘাত ব্যবস্থাপনা, সংখ্যালঘুদের অধিকার, উন্নতি ও সংঘাতের সমস্যা এবং সম্পদ উত্তোলনের সমস্যা। ওসানিয়া অঞ্চলের নৃকুল পরিচিতি, গোষ্ঠীপ্রধান, বহুমুখি সমস্যার সমাধান করতে হলে নৃকুল গোষ্ঠীদের স্বীকৃতি দিতে হবে। গতানুগতিক সনাতনী উপাদান মিশ্রিত পশ্চিমি গণতান্ত্রিক কাঠামোর উর্ধ্বে কিছু ভাবতে হবে। সম্পদের সংকট মাথায় রেখে সরকারের সমতা প্রধান বন্টনের উপরে জোর দেওয়া উচিত। সর্বাধিক, জাতীয় নেতৃত্ব, জাতীয় সনাতনী ধারণার অধিক জাতীয় সংহতির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

৪.৫.১ প্রশান্ত অঞ্চলে অভিবাস প্রধান রাষ্ট্রসমূহ

এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড তিনটি বৃহৎ অভিবাসী সমাজ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমধ্বয় ইউরোপীয় ও আহিস্পানিক গোষ্ঠীদের মূল ইউরো-মার্কিনি সমাজের সঙ্গে সম্মিলিত করার বিষয় চিন্তা ব্যক্ত করা হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে ধারাবাহিক অভিবাস ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপ সৃষ্টি করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অভিবাস তিনটি অধ্যায়ে ঘটে—প্রথম অধ্যায় (১৯০১-১৯৩০) হল ক্লাসিক ইরা, নিয়ন্ত্রণমূলক আইনের প্রতিক্রিয়ায় দ্বিতীয় অধ্যায় ১৯৭০ থেকে শুধু হয়ে বর্তমান অবধি তাকে নিউ রেজিম বলা হয়। প্রথম দুটি অধ্যায় সম্মিলিতকরণ বনাম উপজাতীয় বৈষম্য ও অভিবাসীদের অর্থনৈতিক সংগ্রাম এই ধরনের বিতর্ক চলতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থনৈতিক ক্ষমতা কমে যাওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাস লক্ষ্যণীয়। মেক্সিকো থেকে শ্রমিক অভিবাসীরা আসতে থাকে। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের

সময় শুধু পশ্চিম ইউরোপে অভিবাস ঘটে। তৃতীয় পর্যায়ে নিউরেজিমে আভ্যন্তরীণ থেকে অভিবাসন ঘটে। কিছু আইনি সংস্করণের জন্য এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় কাম্বোডিয়া ও লাওস থেকে আমেরিকায় অভিবাসন ঘটে। তৃতীয় পর্যায়ের অভিবাস মূলত এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার থেকে ঘটে। তাদের উপজাতীয় পরিচিতি এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম প্রজন্মের অভিবাসে ইউরোপ থেকে আগত বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মানুষ তথা ইতালিয়ান, পোল্যান্ডবাসী, চেকবাসী, রুশ, হাঙ্গেরিয়ান ও লিথুয়েনিয়ানস এসে বসবাস করতে আরম্ভ করে। তারা পশ্চিম ইউরোপ থেকে আগত সর্বপ্রথম অভিবাসীদের থেকে ভাষা সংস্কৃতি শিক্ষাজ্ঞান থেকে অনেক ভিন্ন ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে জাতিগত মেলামেশা বৃদ্ধি পায়। তাদের মধ্যে আর্ন্তগোষ্ঠীয় বিবাহের সূত্রে যোগাযোগ আরও বাড়তে থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্মের সমন্বয় অনেক বেশি সহজসাধ্য ছিল। কিন্তু যেহেতু তৃতীয় প্রজন্মের অভিবাসীরা মূলত অ-ইউরোপিয়ান, তাদের মূলস্রোতে সমন্বিত করা কঠিন। ফলত অনেক সামাজিক স্তরায়ন ঘটেছে এবং উপজাতিক পারস্পরিকতার সচেতনতা অনেকের মধ্যে প্রখর। এমন পরিস্থিতিতে অবারিত অভিবাস শুধু জটিল সামাজিক কুক্ষিকরণই করবে না, জাতিগত সংঘাতের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেবে অর্থনৈতিক ভাবে তা অভিবাসীদের পক্ষে হানিকর। এছাড়া মার্কিনী অর্থনীতির মন্থর গতি অভিবাসপ্রধান জাতিগুলির সমন্বয় আরও সমস্যা বহন করে তুলেছে। অর্থনৈতিক অসুবিধায় পড়ে নতুন প্রজন্মের অ-ইউরোপীয় মার্কিনিরা ন্যায়বিচার ও মানসিক বলের জন্য আরো অন্তর্মুখি। তারা শুধু একই ভাষা বা সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরেনি, তারা পাশাপাশি তারা একই বসত এলাকায় সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। এই ভিন্ন ভিন্ন অ-ইউরোপীয় গোষ্ঠীগুলির মার্কিনী সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সমন্বিত করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

অস্ট্রেলিয়া অভিবাসীদের বিশেষ করে শ্রমিকদের দেশে আসতে সুযোগ দিয়েছে। মূলত অস্ট্রেলিয়ায় কয়েকদিনের চালান করা হত। পরবর্তীতে সোনা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে অনেকে এখানে বসতি করতে আরম্ভ করে। ফলে ইউরোপীয়, উত্তর আমেরিকাবাসী ও চীনে অভিবাস বাড়তে থাকে এবং অস্ট্রেলিয়ান সরকার প্রতিক্রিয়ায় জাতীয় পরিচয় গঠনের নামে অতি ভিন্ন চেহারার মানুষদের নাগরিকত্বর থেকে বাদ দিতে থাকে। এই নীতি ১৮৯০ থেকে আরম্ভ করে প্রায় ১৯৭০ অবধি চলতে থাকে। এই নীতি নিষ্ক্রিয় হলে নতুন করে অ-ইউরোপীয় অভিবাস বৃদ্ধি পায়। সরকার অভিবাস মূলস্রোতের সঙ্গে ব্যক্তিসমন্বয়ের ওপর জোর দিতে থাকে। তারা তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতি ও জীবনধারা বর্জন করতে আরম্ভ করে। অভিবাসীদের মূলস্রোতের সঙ্গে সম্পর্কের সেতুবন্ধন তৈরী করাও তাদের সামাজিক সম্পর্ক সমৃদ্ধ করার দায়িত্ব যতটা আমলাতান্ত্রিক ছিল ততটাই উপজাতিক সংস্থাগুলির দায়িত্বও বটে। সমন্বয় সাধন

আরও তবান্বিত করার জন্য বহুসাংস্কৃতিকতা বা মাল্টিকালচারিজম ধারণাটির বুৎপত্তি হয়। বিংশ শতাব্দীতে অভিবাসের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় বহুসাংস্কৃতিকতার মাধ্যমে অভিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির নিজস্বতা সম্পূর্ণ বির্সজন না দিয়েও অস্ট্রেলিয়ান আদবকায়দা সামাজিক রাজনৈতিক বিন্যাসে নিজেদের মানিয়ে নিয়ে শিখেছে। ব্রিটিশ ধারণার একজাতি সম্পন্ন রাষ্ট্রের বিকল্পে কিটিং অস্ট্রেলিয়াকে এশিয়ার বহুজাতিক রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করেন। অতএব অস্ট্রেলিয়ায় বহুসাংস্কৃতিক শুধু তার জাতীয় পরিচিতির অন্যতম উপাদানই নয়, বর্তমান রাজনৈতিক বির্তকের দৌলতে নাগরিকত্ব প্রসারের ক্ষেত্রে উপজাতিক পরিচিতিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ক্রমবর্ধমান অভিবাস এবং বিশেষ করে বেআইনী অভিবাসের নিরিখে অস্ট্রেলিয়ায় রাজনৈতিক বির্তক তুঙ্গে।

বাস্তবে অস্ট্রেলিয়ার শ্রমিক বাজারের প্রয়োজনেই অভিবাসের বৃদ্ধি ঘটেছে। তাদের স্থায়ী অভিবাস কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত প্রায় ৬৮% হল পটু শ্রমিক। এক্ষেত্রে সাবেকি বৃটিশ অভিবাসের জায়গায় চীন ও ভারতীয় অভিবাস লক্ষণীয় ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১১-২০১২ নথিকৃত ২৯০১৪ জন ভারতীয় ও ২৫,৫০৯ জন চীনে অভিবাস করে যা বৃটিশ অভিবাসের অনেক বেশি। অস্থায়ী শ্রমিকদের কেন্দ্র করে অনেক বিতর্ক রয়েছে। যদিও বা উপজাতিক সংস্কৃতির পৃথকতার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় সত্তার বিষয়ও আজকাল প্রশ্নের মুখে। বিশেষ করে ইসলামী মৌলবাদের সম্মুখীন হয়ে অনেকে মনে করে যে উপজাতিক সাংস্কৃতিক তার পাল্টা উত্তর হতে পারে। মনে রাখতে হবে যে অস্ট্রেলিয়ান নাগরিকত্বের আইনী উপাদান অধিক সামাজিক উপাদান অনেক বেশি স্পষ্ট। হাওয়ার্ড আমলে অস্ট্রেলিয়ান ঐতিহ্যের ওপর জোর দেওয়ায় বহুসাংস্কৃতিকতা প্রশ্নের মুখে পড়ে; বহুজাতিক সাংস্কৃতি ও ধর্ম ও প্রশ্নের মুখে। ফলে সংখ্যালঘুরা শুধু নিজেদের উপজাতীয় পরিচিতির সুরক্ষা চাইছে না, তারা দেশ নির্মাণের কাজে তাদের অবদানের স্বীকৃতিও চাইছে। তারা মনে করে যে তাদের সাংস্কৃতিক সত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠরা কোন একপাক্ষিক বিধান দিতে পারে না। বাস্তবে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীদের খানিকটা আপোস তো করতেই হয়। সংখ্যালঘুদেরও নিজেদের 'ভুক্তভোগী' দৃষ্টিকোণের উঠে নতুন করে অস্ট্রেলিয়ান মূল্যবোধের ছন্দে নতুন করে নিজেদের পরিচিত ভাবতে ও গড়তে হচ্ছে।

৪.৬ সারসংক্ষেপ

- এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলে নৃকুলগত চরিত্র বৈচিত্রপূর্ণ ও জটিল। এশিয়াও প্রশান্ত অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় যে ভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় আছে তারা তাদের সত্তার ও পরিচয় সম্বন্ধে সচেতন ও তা রক্ষার জন্য সক্রিয়।

- পরিচিতি রক্ষার এই প্রয়াস কাল্পনিক গোষ্ঠী (Imagined Communities) এর তত্ত্বের মত শুধু মানসিকই নয়। ভূখণ্ড দখলের লড়াই-এর মাধ্যমে মাঝে মাঝে তার বর্হিপ্রকাশ ঘটেছে। এই ধরনের কাজকর্ম উপজাতীয়তাবাদের উৎস।

- বিভিন্ন আন্ত-নৃকুল সাম্পর্কিত জটিলতা তার চাপ ও তার জবাবে রাজনৈতিক পদক্ষেপ যেমন জোটসরকার পর্যায়ক্রমে রাজনৈতিক ভাঙ্গনের দিকে নিয়ে যায়।

- নৃকুল পরিচিতি সত্তা অনেক ক্ষেত্রে অভিবাসের সঙ্গে যুক্ত। অভিবাস প্রধান সমাজে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ায় এর বিবিধ প্রভাব পড়ে। অন্যান্য অঞ্চলে দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ওসানিয়া পৃথক আলোচনার দাবি রাখে।

- দক্ষিণ এশিয়ার জনসমষ্টি ভাষা ধর্ম বর্ণ জাতি ও নৃকুলগত পরিচিতির ভিত্তিতে বিন্যস্ত। আন্তর্জাতীয় সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক ও কিছুক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব প্রধান। এই জটিল পরিস্থিতি জাতীয় নিরাপত্তার সংকট সৃষ্টি করে এবং রাষ্ট্রকে তার মোকাবিলা করতে হয়। অনেক গবেষক ও বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে দক্ষিণ এশিয়া নৃকুলভিত্তিক অশান্তির অন্যতম পীঠস্থান।

- দক্ষিণ এশিয়ার মতন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও নৃকুলগত সাংস্কৃতিক ও ধর্মগত বৈচিত্র দেখা যায়। কিন্তু নৃকুলগত সংখ্যালঘু ও আদি বাসিন্দাদের মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে। এখানে নৃকুলগত সংখ্যালঘুরা ধর্ম, জাতি, সংস্কৃতির ভিত্তিতে বহুবিভক্ত।

- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও বহুজাতিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র জাতিরাষ্ট্র গঠন, জাতীয় সংহতি ও সামাজিক ঐক্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা মনে হয়। ফলে স্বাধীনতার পর সরকারগুলি বৈচিত্রকে সংহতির মোড়কে জড়িয়ে নিয়ে একটিই জাতীয় সত্ত্বা ও পরিচিতি নির্মাণের কাজে ব্যস্ত।

- প্রশান্ত দ্বীপাঞ্চলে ও ওসানিয়া অঞ্চলের উপজাতিক বিন্যাস বোঝার জন্য তিনটি দ্বীপপুঞ্জ অপরিহার্য তথা মিলিনেশিয়া, মাইক্রোনেশিয়া ও পলিনেশিয়া।

- প্রশান্ত অর্থনীতি ও রাজনীতি উপজাতিকতার ধারণাটি ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার পাশাপাশি বর্ণ পরিচিতি ধর্ম বিশ্বাস ও উপাচার, ভাষা, গোষ্ঠী সৌহার্দ ও ঐতিহাসিক যোগের ওপর নির্মিত।

- মূলত অভিবাসীরাই মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া সমাজের চিন্তার কারণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইউরোপীয় ও অ-হিসপ্যানিক অভিবাসীদের অবারিত প্রবেশ মার্কিনী মূলস্রোতের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করেছে। অস্ট্রেলিয়াতেও সমন্বয়ের সমস্যা সেখানে বহুসাংস্কৃতিকতা নীতির বিরুদ্ধে সওয়াল তৈরী করেছে।

৪.৭ নমুনা প্রশ্নমালা

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

১. দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নৃকুলগত বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার মত অভিবাস প্রধান সমাজগুলির বর্তমান সমস্যাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

৩. প্রশান্ত দ্বীপপুঞ্জের রাজনীতি ও অর্থনীতি কিভাবে তার নৃকুলগত ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত তা ব্যাখ্যা করুন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী

১. দক্ষিণ এশিয়ায় নৃকুল পরিচিতি সত্তায় বর্ণ বিন্যাসের পরিচয় দিন।

২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিন প্রজন্মের অভিবাস ব্যাখ্যা করুন।

৩. আঞ্চলিক পরিচিতি গঠনে এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপাঞ্চলের দ্বীপগুচ্ছগুলি কী কী?

২. দক্ষিণ এশিয়ার জনবিন্যাসের তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

৩. অস্ট্রেলিয়ার অভিবাসের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ কী?

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

1. Vera Simone, *The Asian Pacific : Political and Economic Development in a Global Context*, Pearson, 2000

2. Giovanna Maria Dora Dore, et. al, *Incomplete Democracies in the Asia-Pacific : Evidence from Indonesia, Korea, the Philippines and Thailand*, Palgrave Macmillan, 2014.

3. Vinod K. Aggarwal, *The Political Economy of the Asia Pacific*, Springer, 2011.

4. Tanweer Fazal, *Minority Nationalisms in South Asia*, Routledge, 2013

5. Rajat Ganguly and Ian Macduff, *Ethnic Conflict and Secessionism in South and Southeast Asia : Causes, Dynamics, Solutions*, Sage Publications 2003.

6. Michael Edward Brown and Rajat Ganguly, *Government Policies and Ethnic Relations in the Pacific*, MIT Press, 1997.

7. Jocelyn Linnekin, Lin Poyer, *Cultural Identity and Ethnicity in the Pacific*, University of Hawaii, 1990.

8. Paul Pickard and W. Jeffrry Burroughs, *Narrative and Multiplicity in Constructing Ethnic Identity*, Temple University Press, 2000.

9. Douglas S. Massey, "The New Immigration and Ethnicity in the US", *Population and Development Review*, Vol. 21, No. 3, September 1995, pp. 631-652.

10. J. Jupp, "Immigration and Ethnicity" Australian Cultural History : *The Journal of History of Culturel in Australia*, Vol 27, No, 2, 2009, pp. 157-166.

11. Jupp, J 2009, 'Immigrant settlement, ethnic relations and multiculturalism in Australia', in John Highly, John Nieuwenhuysen with Stine Neerup (ed.), *Nations of Immigrants : Australia and the USA Compared*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, pp. 147-159.

পর্যায় - ৪

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

একক ১ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্র এবং নাগরিক সমাজ ঃ একটি পর্যালোচনা

একক ২ প্রবাসী চীনাদের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশে বসবাস করার বিষয়ে আলোচনা ঃ মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের উদাহরণ

একক ৩ থাইল্যাণ্ড ও মায়ানমারের সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রনীতি

একক ৪ বিশ্বায়ন এবং ঠাণ্ডা যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংস্কৃতি

পর্যায় - ৪ : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

একক—১ ❑ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্র এবং নাগরিক সমাজ ঃ একটি পর্যালোচনা

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ ভূমিকা

১.৩ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রের প্রকৃতি

১.৪ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নাগরিক সমাজ

১.৫ সারসংক্ষেপ

১.৬ নমুনা প্রশ্নাবলী

১.৭ নির্বাচিত সহায়ক গ্রন্থ

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্যগুলি হল ঃ

- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজের কার্যকলাপ বিষয়ে জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা।
- ঔপনিবেশিক কাল থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রাষ্ট্রের উদ্ভব বিষয়ে সম্যক ধারণা প্রদান করা।
- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নাগরিক সমাজ, তাদের কার্যকলাপ এবং তাদের যেসব বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে সে বিষয়ে ধারণা প্রদান করা।
- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নাগরিক সমাজের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব কিরূপ, সেবিষয়ে ধারণা প্রদান করা।

১.২ ভূমিকা

এই পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজ্যগুলির চরিত্র, এর প্রধান বৈশিষ্ট্য, ঔপনিবেশিক সময়কাল থেকে বিশ্বায়নের পথে তাদের বিবর্তন এবং বিভিন্ন ধরণের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি

হওয়া। দ্বিতীয়ত; এই পরিচ্ছেদে নাগরিক সমাজের আন্দোলন এবং এই অঞ্চলে তার নির্দিষ্ট রূপ নেওয়ার ব্যাপারটিও আলোচিত হয়েছে।

১.৩ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রের প্রকৃতি

থাইল্যান্ড ছাড়া, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সমস্ত দেশের ঔপনিবেশিক শাসনের অভিজ্ঞতা আছে। ষোড়শ শতাব্দিতে ইউরোপিয়ানরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় প্রথম পদার্পণ করে। বিশ্বের অন্যান্য অংশের মতো দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াও অনতিবিলম্বে ইউরোপিয়ান শক্তির ঔপনিবেশিক আধিপত্য স্থাপন করার যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। ১৫১১ খৃষ্টাব্দে পর্তুগাল উপনিবেশ করে মালাক সুলতানেটকে। ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মূল বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে বাটাভিয়াকে, যা পরে জাকার্তা নামে পরিচিত হয়, বেছে নেয়। স্পেন আগ্রহী হয়ে ফিলিপাইন্স সম্পর্কে এবং ১৫৬০ সাল থেকে তার উপনিবেশ বিস্তার লাভ করে। অপরদিকে বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সিঙ্গাপুরকে তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের মূল বন্দর হিসেবে পরিগণিত করে। বৃটিশরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় পেনাং-এ প্রথম উপনিবেশ গড়ে তোলে। বৃটিশরা ধীরে ধীরে মালয়, বার্মা, বর্নিও অঞ্চল অধিকার করে, ফ্রান্স উপনিবেশ করে ইন্দো-চীন এলাকা এবং ডাচ ও পর্তুগীসরা অধিকার করে যথাক্রমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ও পর্তুগীস টিমোর। ফলতঃ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে প্রায় সমস্ত অঞ্চল ইউরোপিয়ান ঔপনিবেশিক শাসনে কম্পমান ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন সারা বিশ্ব ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হচ্ছিল তখন এই অঞ্চলের উপনিবেশগুলিও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে। ইন্দোনেশিয়া ১৯৪৫ সালে, ১৯৪৬ সালে ফিলিপাইন্স্, বর্মা ১৯৪৮ সালে, ইন্দোচীন রাজ্যগুলি ১৯৫৪ সালে, মালয় ১৯৫৭ সালে, ব্রুনাই ১৯৮৩ সালে, সিঙ্গাপুর, সাবা এবং সারওয়াক ১৯৬৩ সালে সার্বভৌমত্ব লাভ করে। এখানে উল্লেখ্য মালয়, সিঙ্গাপুর সাবা ও সারাওয়াক একসঙ্গে মিলে মালয়েশিয়া ফেডারেশান গঠন করে ১৯৬৩ সালে কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক ভাবে ১৯৬৫ তে সিঙ্গাপুর এই ফেডারেশান থেকে বেরিয়ে আসে।

দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে থাকলেও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজ্যগুলি শক্তিশালী এবং আপেক্ষিকভাবে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রু মোকাবিলায় সক্ষম ছিল। তুলনামূলকভাবে ইন্দোচীন এলাকায় অনুন্নত অর্থনৈতিক অবস্থান বাদ দিলে কিছু রাজ্য যেমন ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুর পূর্ব এশিয়ার অসাধারণ উন্নয়নের কারীগর ছিল। তারা যে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বাড়িয়েছিল তাই নয় তারা রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখতেও উল্লেখযোগ্য ভাবে সমর্থ হয়েছিল। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে রফতানি ভিত্তিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং জন্মলগ্ন থেকেই উদারীকরণ অর্থনীতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের

মুখ্য চাবিকাঠি হিসেবে পরিগণিত হয়। রাজনৈতিক দিক দিয়ে নেতারা পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের চরিত্র এবং কৌশল বদল করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ভঙ্গুর অথবা দুর্বল সরকার পরিচালনার জন্যে আগে সেখানে জোর করে ক্ষমতার ব্যবহার করে সরকারে টিকে থাকার চেষ্টা হত এখন সেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মৃদু সরকারী শাসন এবং আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সরকার চালানো হয়। ঔপনিবেশিক শাসন উত্তরকালে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির শাসন চালানোর মূল কথা শক্তভাবে সরকারী পরিচালন ব্যবস্থা এবং বহুধা বিভক্ত সমাজকে মান্যতা দেওয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে চলা। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় রাষ্ট্রগুলির আর একটি বিশেষত্ব হল তারা ঐতিহাসিক পরম্পরা মেনে চলতো কারণ বিভিন্ন রাজ্যের যে সীমানা তা ঔপনিবেশিক পূর্ব সময় থেকেই স্বতন্ত্র ছিল।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় রাজ্যগুলির বিশেষত্ব একটি রাজ্য থেকে আর একটি রাজ্যে এবং বিভিন্ন সময়ে আলাদা আলাদা ছিল। যেমন বর্ম্মাতে আমরা দেখি প্রধান জাত বা সাংস্কৃতিক ভাবধারার মানুষরা আধিপত্য করত। যেমন, বর্মন, সান, কাচিন, চিন এবং কারেন। এইসব রাজ্যকে বলা হয় এথনোক্রেটিক (Ethnocratic) রাজ্য। আবার সিঙ্গাপুরের মত দেশে বাস্তববাদী এবং কর্পোরেটিস্ট (corporatist) দৃষ্টিভঙ্গী নেওয়া হয় যেখানে রাজ্যের প্রতি আনুগত্যই প্রধান হিসাবে ভাবা হয়, জাতি, সংস্কৃতি, ধর্ম, শাসন করার মাপকাঠি হিসেবে নির্ধারিত হয় না। আমলা এবং প্রযুক্তিবিদরা (technocrat) রাষ্ট্রের উন্নতির জন্যে নিরপেক্ষভাবে শিক্ষিত হন সিঙ্গাপুরে।

আবার কিছু কিছু দেশ যেমন থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে যে সেদেশে মূল ভূখণ্ড এবং সংলগ্ন এলাকায় জাতিগতভাবে দুর্বল মানুষদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের চেয়ে অন্যদের বেশি উন্নত করে অসাম্য তৈরি করা হয়েছে। অবশেষে মালয়েশিয়া নিজেদের আদর্শ রাষ্ট্র (model state) হিসেবে উপস্থাপিত করে যেখানে তারা ১৯৬৯ সালের জাতিগত দাঙ্গা থেকে শিক্ষালাভ করে ১৯৭১ সাল থেকে নতুন অর্থনৈতিক নীতির মাধ্যমে জাতিগত পুনর্গঠন করার দিকে অগ্রসর হয়েছে। এতদত্ত্বেও বর্তমানে মালয়েশিয়ার ভূমিপুত্রদের পক্ষে সরকারের পক্ষপাতিত্ব ও একতরফা সুযোগসুবিধা দেওয়ার অভিযোগ আছে অমালয়ীদের, বিশেষতঃ ভারতীয়দের, যদিও ১৯৯১ সালে এই সরকার জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যা পরে অনুসরণ করে "নিউ ভিসন পলিসি"। এতদসত্ত্বেও এই দেশের উপর ভূমিপুত্রদের আধিপত্য এবং মালয়—চীন দ্বন্দ্ব এখনও রয়ে গেছে। সুতরাং এইসব বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় উন্নয়নের অগ্রগতি সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে মালয়েশিয়া এখনও জাতপাতের ব্যাপারে নিরপেক্ষ হতে পারেনি।

এই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজ্যগুলি স্বাধীনতা উত্তরকালে অত্যন্ত দুর্বল ছিল, সমাজ জাত পাতের ব্যাপারে বহুধাবিভক্ত ছিল, কিছু কিছু জাতের বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রবণতা, পরিকাঠামোয় এবং আন্তঃরাজ্য পরিবহণের অপ্রতুলতা, একটি রাষ্ট্রের খণ্ড খণ্ড রাজ্যে ভাগ হওয়া, সারা দেশের উপর কমিউনিজমের প্রভাব ছেয়ে থাকা এবং অর্থনৈতিক অনুন্নয়ন সবই বিদ্যমান ছিল। এই সব কারণে শুরুর দিকে এই সব রাজ্যের শাসকরা স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু করে কারণ তাদের মনে হয়েছিল পাশ্চাত্যের উদারীকরণ তাদের দেশের উপযুক্ত হবে না। সুতরাং, অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা দূর করা, চিনের আগ্রাসন থেকে রক্ষা পাওয়া এবং জাতিগত বৈষম্য সামাল দেওয়ার জন্যে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজ্যগুলিতে বিস্তার লাভ করে।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজ্যগুলির মধ্যে অনৈক্য এবং আত্মহংকারও ছিল। কখনও দেখা যায় এক রাজ্যের আইন ভঙ্গকারী অন্যে দেশে নিশ্চিন্তে আশ্রয় নিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, ইসলামিক বিচ্ছিন্নতাকারীরা মালয়েশিয়ান সরকারের সমস্যা তৈরী করায় যখন তারা ব্যবস্থা নিতে শুরু করে তখন এই সব বিচ্ছিন্নতাকারীরা দেশ ত্যাগ করে দক্ষিণ থাইল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। এইভাবে মালয় রাজ্যের কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যরা থাইল্যান্ডে নিরাপদ আশ্রয় লাভ করেছিল। ভিয়েতনাম ঐক্যবদ্ধ হবার পর সেই দেশের কমিউনিস্ট নেতৃত্ব মূলতঃ দক্ষিণ ভিয়েতনামে সামাজিক পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। এর ফলে ভিয়েতনামের অন্যান্য জাতি যেমন চীনা এবং খেমেররা ভিয়েতনামে অস্বস্তিতে পড়ে। এর ফলে বিপুল সংখ্যায় চীনা এবং খেমেররা নিকটবর্তী চিন, থাইল্যাণ্ড ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্যান্য অংশে আশ্রয় নেয়। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ বছরের পর বছর বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন দ্বারা আন্দোলনের মুখোমুখি হয়। এই সংগঠনগুলি মূলতঃ হল ইন্দোনেশিয়ায় দারুল ইসলাম, একে মারদেকা, ও পাপুয়া মারদেকা, ফিলিপাইনসে লা লিগা দ্যা রেসিসট্যান্স মেয়ো লাওসে, মোরো ন্যাশনাল লিবারেশান ফ্রন্ট ও মোরো ইসলামিক লিবারেশান ফ্রন্ট এবং থাইল্যাণ্ডে করিসান ন্যাশানাল পেথবেবাসন পাটান। এই রাজ্যগুলি দুর্বল কিন্তু একই সঙ্গে ভৌগোলিক দিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই সব দেশের প্রতি অন্যান্যদের নজর পড়ে এবং কোন কোন সময়ে এই সব দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অন্যান্য দেশের অন্যায্য হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়। যেমন মালয়ের জরুরী অবস্থায় সময়ে গ্রেট ব্রিটেন মালয়েশিয়ায় হস্তক্ষেপ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও স্বার্থ ছিল বলে কমিউনিজমের বিস্তার রোধে এই অঞ্চলের কিছু রাজ্যে যেমন ভিয়েতনামের সাথে দীর্ঘকালীন যুদ্ধে তারা জড়িয়ে পড়ে। ঠিক একই জিনিস হয় কাম্বোডিয়া ও লাওসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপিন্সকে অর্থনৈতিক ভাবে নিজের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে রেখে দিয়েছিল যাতে ফিলিপিন্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল থাকে এমনকি ঔপনিবেশিক

শাসনব্যবস্থার পরেও। বর্ম্মার অশান্তির সময়ও আন্তর্জাতিক নজর পড়ে এবং কিছু দেশ সামরিক শাসকদের সমর্থন করলেও রাষ্ট্রের ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্বের কারণে অনেক দেশ অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য বাধানিষেধ আরোপ করে। সম্ভবতঃ এই কারণে এই রাজ্যগুলি সম্মিলিতভাবে উপলব্ধি করে অপরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা এবং নিজেদের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখা কতটা জরুরী। এই উপলবব্ধির ফলস্বরূপ ১৯৬৭ সালে গঠিত হয় অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ ইষ্ট এশিয়ান নেশ্নস্' (ASEAN) যার মাধ্যমে অপরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা বাধ্যতামূলক করা হয় এবং তাঁরা নিজেরা সহযোগিতার ক্ষেত্রে নতুন চুক্তিবদ্ধ (Treaty of Amity and Coopration-TAC) হন যা বিদেশী-রাষ্ট্র যারা এইসব রাজ্যের ব্যাপারে সক্রিয় তাদের কাছে একটি বার্তাস্বরূপ।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া অঞ্চল বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় আভ্যন্তরীণ বিবাদগ্রস্ত ছিল। সম্প্রতি থাই-কাম্বোডিয়া সীমান্ত সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করে প্রাথমিকভাবে প্রিয়া বিহিয়ার (Preah Vihear) মন্দিরকে নিয়ে বিবাদে, থাইল্যাণ্ডের সীমান্ত সমস্যা, আম্বালাট অঞ্চলের সেলেবেস সমুদ্রের সমুদ্রতটের সার্বভৌমত্ব নিয়ে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় বিবাদ, জলবন্টন নিয়ে সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার বিবাদ এবং সম্ভবতঃ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষিণ চিন সমুদ্র বিরোধ যেখানে বিভিন্ন দেশ যেমন ভিয়েতনাম, ফিলিপিন্স, ব্রুনে, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, চিন ও ভারত জড়িত এবং সকলেই সার্বভৌমত্ব ও শান্তিপূর্ণভাবে তেল নিষ্কাশনের দাবিদার বিশেষতঃ স্প্যাটলী এবং প্যায়াসেন দ্বীপপুঞ্জে। দূর্ভাগ্যবশতঃ এই পারস্পরিক বিরোধ আসিয়ান (ASEAN) দেশগুলির সসদ্যদের মধ্যে অনৈক্যর প্রকাশ ঘটিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ এই বিবাদে থাইল্যাণ্ড বন্ধুভাবাপন্ন চিনের প্রতি, অপরদিকে ভিয়েতনাম আবার কট্টর চীনবিরোধী। যাই হোক, মোটামুটিভাবে, সার্ক (SAARC) গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির তুলনায় আসিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি পারস্পরিক সোহার্দ্য, সহযোগিতা ও সম্প্রীতি রক্ষায় এই অঞ্চলে অনেক সদর্থক ভূমিকা নিয়েছে।

১.৪ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নাগরিক সমাজ

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে পরম্পরাগতভাবে 'দেবরাজ' তত্ত্বে বিশ্বাস করত যেখানে রাজা এমন একজন মানুষ যাঁকে ভগবান নিজে প্রেরণ করেছেন অথবা তিনি ভগবানের আর এক রূপ যিনি পৃথিবীতে তাঁর সন্তান সন্ততিদের পথপ্রদর্শক হয়ে এসেছেন। এই ধারণা বা বিশ্বাস রাজার আসনকে এমন একটা স্থানে স্থাপন করায় রাজার কাজকর্ম বা উদ্দেশ্যকে প্রশ্নাতীত বলেই মনে করা হত। এই সময় সাধারণভাবে মনে করা হত রাজা যেহেতু নিজেই ভগবান তাই তিনি কোন ভুল করতে পারেন

না। এই ধারণায় বশবর্তী হওয়ার ফলে ভগবানের আনুগত্যের আড়ালে বহু অন্যায় এবং অত্যাচার ঢেকে রাখা হত। ফলতঃ উপনিবেশ পূর্ব সময়ে নাগরিক সমাজ গড়ে উঠার ক্ষেত্রে বাধা আসে এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যে সামাজিক ও মানসিক দূরত্ব তৈরী হয়। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে পাশ্চাত্যের ধাঁচে নাগরিক সমাজের দেখা পাওয়া সম্ভব নয় কারণ এই সব সমাজ পাশ্চাত্য সমাজের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের উন্নয়নের রাস্তা এবং সামাজিক মূল্যবোধ অনুসরণ করে।

ঔপনিবেশিক কালে সবরকমের অত্যাচার ও অন্যায় সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও নাগরিক সমাজ গঠনে ও বিভিন্ন আন্দোলনে সাহায্য করেছিল এবং এর ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষণ, একদেশের সীমানা ছাড়িয়ে অন্য দেশে সামগ্রী ও চিন্তাভাবনার আদানপ্রদান, ছাপাখানার ব্যবহার, এবং একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় জনগণের যাতায়াত বিশেষতঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে সস্তা শ্রমের জন্যে নিযুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্র বিস্তার লাভ করেছিল। এই সব মিলিয়ে একটা ধারণা মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল যে প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষকেও প্রশ্নের মুখে ফেলা যায়।

ঔপনিবেশিক প্রথা উঠে যাওয়ার পর এই দেশগুলির স্বাধীনতা উত্তর কালে নানাধরণের আভ্যন্তরীণ, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে নাগরিক সমাজের অস্তিত্বর প্রকাশ খুব অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে। বস্তুতপক্ষে ১৯৫০ এবং ১৯৬০ সালের নিরিখে বলা যায় বেশির ভাগ দেশই হয় সামরিক শাসনে অথবা কমিউনিস্‌মের আওতার থাকায় নাগরিক সমিতির সরকার বিরোধী কণ্ঠ অবদমিত হয়ে পড়ে। এর উদাহরণ বর্ম্মা, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম রাষ্ট্রের এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। এই প্রবণতা ১৯৭০ ও ১৯৮০ তেও বজায় ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ফিলিপিন্সের রাষ্ট্র প্রধান মার্কোসের কার্যকালে কট্টর স্বৈরতান্ত্রিক শাসন এবং মার্শাল কানুন প্রবর্তনের ফলে সমস্ত ক্ষেত্রে নাগরিক সমিতির কণ্ঠ রোধ হয়। অবশ্য এই সময় ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন শাসকের আড়ালে স্বৈরতান্ত্রিক মার্কোসের কোন কিছুই কাজে লাগেনি এবং ১৯৮০ সালে মাঝামাঝি তাঁর রাজত্বের অবসান হয় মূলতঃ নাগরিক সমাজের শক্তিশালী আন্দোলনের মাধ্যমে। এর সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক সমাজ ১৯৯০ সালে এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশে যেমন মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, লাওস দেশেও বিস্তার লাভ করে। এই সংস্থা শুধু যে ব্যাপক বিস্তারলাভ করেছিল তাই নয় বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে উন্নত যোগাযোগ গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল। নাগরিক সমাজ সংগঠিত ছাত্র আন্দোলন, মহিলাদের আন্দোলন, পরিবেশ এবং মানবাধিকার আন্দোলন ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করেছিল। কয়েকটি সাফল্যের মুখ দেখা সংস্থার নাম মালয়েশিয়ার এনভেরোমেন্টাল প্রোটেকশান সোসাইটি অফ মালয়েশিয়া (EPSM) ওয়ানা লিংকুংগন হিডাপ (WALHI) এবং সিঙ্গাপুরের সোসাইটি এগেনস্ট্ ফ্যামিলি ভায়োলেন্স (SAVE)।

যাই হোক, দীর্ঘ দিন ধরে এই অঞ্চলের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অগ্রগতি সত্ত্বেও নাগরিক সমাজের বিরুদ্ধে শাসকদের বিরূপভাব সমানেই চলতে থাকে। যেমন মালয়েশিয়া আল আরকামের নাগরিক সমাজের আন্দোলন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং ২০০৫ সালে বহু মানবাধিকার কর্মী বিশেষ সুরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হন। আবার ২০১২ তে মার্কিণ প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা আসিয়ান (ASEAN) সম্মেলনে অংশগ্রহণের প্রাক্কালে নম পেন (Phnom Penn) শহরে মহিলারা কাম্বোডিয়ায় সরকারের জন বিরোধী নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদ মিছিল করে। এর মোকাবিলায় সরকার সমস্ত ধরণের প্রতিবাদ সভা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং কিছু মহিলা স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করে তাদের জাতীয়তা বিরোধী বলে তকমা দেয়। এর উপর সেই বছরেই কাম্বোডিয়াতে একজন অগ্রগণ্য পরিবেশকর্মীর মৃত্যু হয় এবং তাতে সারা দেশ শোকার্ত হয়ে পড়ে।

বিশ্বায়ন এবং উদারীকরণ নীতি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক কাঠামোতে বড় সড় রদবদল আনে। সারা বিশ্বে এই নতুন আবহে সাধারণ মানুষের কাছে গণতান্ত্রিক অধিকার সব চাইতে বড় দাবিতে পরিণত হয় যা তাদের শাসকরা চিরকাল উপেক্ষা করে এসেছে। সাধারণ মানুষের দাবি এবং আন্তর্জাতিক চাপে বাধ্য হয়ে অনেক দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ গণতন্ত্রকে ভবিতব্য হিসাবে মেনে নিতে বাধ্য হয়। এর ফলে কিছু কিছু দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ একদিকে খুব দ্রুত তাদের শাসক বদল করেছে এবং অন্যদিকে নতুন পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে এই সব নাগরিক সমাজ নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। কাম্বোডিয়া যেমন বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়েছে বিচ্ছিন্ন চরম এক স্বৈরতন্ত্রী এবং কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে নব্য উদার রাষ্ট্র হিসাবে। কাম্বোডিয়াকে একটা উদাহরণ হিসাবে ধরা হয় যেখানে গণহত্যা এবং দীর্ঘ মেয়াদী গৃহযুদ্ধ স্থানীয় গোষ্ঠী ও দলকে নিশ্চিহ্ন করে নাগরিক সমাজের আন্দোলনকে দুর্বল করেছে। তার উপর, বহু দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ অর্থনৈতিক উদারীকরণ নীতি নেয় যেমন ভিয়েতনামের দয় ময় (Doi Moi), লাওসে New Economic Mechanism এবং এই সব উদারীকরণ বিশ্বায়নের সাথে যুক্ত হয়ে সীমানা উন্মুক্ত করার এবং সাংগঠনিক বহুবাদের সুযোগ এনে দিয়েছে। একদিকে বিদেশী নন-গর্ভনমেন্টাল অর্গানাইজেশান (NGO) সংস্থাগুলি দেশী NGO সংস্থাগুলিকে ট্রেনিং দেওয়া, অর্থ সাহায্য এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের সাহায্য করা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে স্থানীয় সমস্যায় বিদেশী হস্তক্ষেপের অভিযোগ উঠে। অন্যদিকে নাগরিক সমাজের মধ্যে রাজনীতিকরণের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং তারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে রাষ্ট্র এবং জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করতে শুরু করে। এটা প্রমাণিত হয় Timor-leste এবং Aceh সংঘর্ষে নাগরিক সমাজের মধ্যস্থতার মধ্য দিয়ে ফিলিপিন্সেও Bantay Cease fire Watch সফল নাগরিক সমাজের আন্দোলনের এক প্রকৃষ্ট

উদাহরণ যা সমাজের প্রান্তিক মানুষের উন্নতিতে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করে এবং এই এলাকায় দীর্ঘমেয়াদী শান্তি ও উন্নতির দ্যোতক।

বিশ্বায়নের ফলে এই অঞ্চলে বৃহত্তর নাগরিক সমাজের জন্ম হয়। কাম্বোডিয়ার মত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় দেশগুলির সাধারণ মানুষকে জমি থেকে উচ্ছেদ করে বড় বড় বহুজাতিক সংস্থাকে কারখানা গড়ে তোলার অনুমতি দেওয়ার কারণে গ্রামীন মানুষ এবং তাদের সামাজিক অবস্থান বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হয়। এই সব কারণে নাগরিক সমাজ আন্দোলিত হয় এবং তাদের কার্যকলাপের সামনের সারিতে মহিলাদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। মজার ঘটনা সরকারী সুযোগ বাড়ায় সাথে সাথে বেশির ভাগ শাসক NGO এর CSO (civil society organization) দের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে সরকারী কমিটিতে মনোনয়ন দেয়। এই সংস্থাগুলি শুধু যে সরকারী সংস্থা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতো তাই নয় তাদের ক্ষোভ সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়ায় সচেষ্ট ছিল যা সরকারের সেফটি ভালভের (safety valve) কাজ করতো। যেমন, সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী গো চোক টং নাগরিক সমাজের কাজে উৎসাহ দিতেন যাতে তারা উন্নয়ন এবং স্থানীয় পর্যায়ে রাজনীতিতে অংশ নিতে পারে। এর ফলে সিঙ্গাপুরে প্রতিষ্ঠা হয় টাউন কাউন্সিল এবং কমিউনিটি ডেভালপমেন্ট কাউন্সিল। এমনকি পুরোপুরি গণতান্ত্রিক নয় এমন শাসন ব্যবস্থাকেও ধীরে ধীরে নাগরিক সমাজের গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা হতে থাকে। থাইল্যান্ডের নাগরিক সমাজ ক্ষমতার বারান্দায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যেমন ১৯৯৭ সালে সংবিধানের খসড়া তৈরি করার সময় তাদের প্রভাব খাটায় এমনকি সেটা সামরিক শাসকের রাজত্বকালেও বহাল থাকে। নির্বাচনে জালিয়াতি এবং সামরিক অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে এই নাগরিক সমাজ সোচ্চার ছিল কারণ তারা মনে করেছিল এটা সামাজিক বন্ধনের পরিপন্থী। কিন্তু ইন্দো-চায়না রাজ্যগুলির কেন্দ্রীয় স্তরের অর্থনীতি নাগরিক সমাজের ভূমিকাকে অনেক নিয়ন্ত্রিত রেখেছিল কারণ এই সব সমাজ এবং অর্থনীতি সরকার নির্দেশিত পথেই চলেছে। স্বাভাবিকভাবে এই নাগরিক সমাজের ভূমিকা আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে অনেকটাই সীমাবদ্ধ ছিল। যাই হোক আসিয়ান (ASEAN) সাংগঠনিক দিক দিয়ে এই সব নাগরিক সমাজের উন্নয়ন ও আন্দোলনে সদর্থক ভূমিকা পালন করেছিল এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন তৈরী করা হয়েছিল। যেমন, আসিয়ান গ্রাসরুট্স্ পিপ্ল্স অ্যাসেম্বলি, আসিয়ান সিভিল সোসাইটি কনফারেন্স, আসিয়ান পিপ্ল্স ফোরাম এবং ফোরাম ফর ডেমোক্রেসী এণ্ড কোঅপারেশান, ইত্যাদি। 'হেজ' (Haze) সমস্যা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ASEAN গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিকে বাধ্য করেছিল আন্তর্জাতিক এবং বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে এবং NGO সংস্থাগুলির থেকে সাহায্য এবং উপদেশ নিতে। ইন্দোনেশিয়ায় নন গভর্নমেন্টাল অগানাইজেশন (NGO) এবং রাষ্ট্রের মধ্যে একটা তিক্ত সম্পর্কের ইতিহাস দীর্ঘদিন ধরে

রয়েছে। অতীতে সুহার্তোর নতুন সরকার এবং ইন্দোনেশিয়ার NGO দের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল না এবং সরকার আভ্যন্তরীন এবং রাজনৈতিক বিষয়ে বেসরকারী সংস্থায় হস্তক্ষেপ নাচক করে দিয়েছিল। এই সব এনজিও (NGO) রা পরিবেশগত ব্যাপারে শক্তিশালী মহলের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ বা নিপীড়িত জাতির সমর্থক ছিল এবং সরকারী নীতির,বিরোধীতায় শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সদর্থক ভূমিকা নিয়ে সুহার্তো সরকারকে ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক বহুত্ববাদের জন্য চাপ দিতো। ইন্দোনেশিয়ায় আমলারা এই NGO গোষ্ঠীর কাজকর্মকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসাবেই গণ্য করতো এবং তাদের কোনদিনই গ্রহণ করেনি। কিন্তু আন্তর্জাতিক চাপে এবং দূষণ মুক্ত পরিবেশের স্বার্থে ইন্দোনেশিয়া সরকার ১৯৭৮ সালে নতুন দপ্তর প্রতিষ্ঠা করে যার নাম দেওয়া হয় মিনিষ্ট্রি ফর ডেভলপমেন্ট সুপারভিশন এণ্ড দি এনভারোনমেন্ট। এই মন্ত্রীত্বের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রকৃতির সম্পদকে কাজে লাগিয়ে উন্নত ও দূষণমুক্ত পরিবেশ যা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটাবে। কিন্তু এই দপ্তর দুঃখজনকভাবে সফলভাবে কাজ চালাতে ব্যর্থ হয় কারণ সুহার্তো সরকার এর সঙ্গে কোনরকম সহযোগিতার হাতে বাড়াননি। এর ফলে সারা ইন্দোনেশিয়া জুড়ে বহু এনজিও (NGO)র আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই এন. জি. ওদের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি সংস্থার নাম সেক্রেটারিয়েট কার্জসামা স্যালেসটারিয়ান হুতান ইন্দোনেশিয়া (SKEPH) এবং ওয়াহানা লিংকুংগান হিডাপ ইন্দোনেশিয়া (WAHLI)। ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই WAHLI আসলে ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত সমস্ত স্থানীয় এবং আঞ্চলিক NGO দের যৌথ প্রতিষ্ঠান। এই NGO যা অনেকগুলি NGO এর সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত তা যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে কারণ ১৯৮০ সালের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তারা সুহার্তোর উপর রাজনৈতিক স্বচ্ছতার জন্যে চাপ সৃষ্টি করতো। ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে এই WAHLI সংস্থা প্রেসিডেন্ট সুহার্তোর উন্নয়ন কর্মসূচীর বিরুদ্ধে কড়া মনোভাব নেয় এবং সুহার্তোর বড় ছেলে P1 Inti Indorayon Utama Ltd. নামে রেয়ন কারখানার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করে পরিবেশ দূষণের অভিযোগ এনে। পরিবেশ দূষণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়েছিল এই মামলায়। যদিও WAHLI এই মামলায় পরাজিত হয় কিন্তু এই ঘটনা NGO দের এবং পরিবেশবিদদের পক্ষে নীতিগত জয় হিসেবেই দেখা হয়। এই মামলার শুনানী চালাতে গিয়ে এই প্রথম আদালত পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখা বা জাতিগোষ্ঠীর ব্যাপারে এই সংস্থাগুলি প্রতিনিধিত্বের অধিকার মান্যতা দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে ইন্দোনেশিয়ার মানুষদের অধিকার এবং পরিবেশ সুন্দর রাখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সাফল্যের ভিত্তিপ্রস্তর এই মামলার মাধ্যমেই স্থাপিত হয়।

১৯৯৭ এবং ১৯৯৮ সালে Haze (হেজ) অনেক এনজিও কে একসঙ্গে আনে এবং প্রধানতঃ WAHLI সংস্থাটি সুহার্তোকে চাপ দেয় তার নীতি বদলের জন্য। কালি মুন্তন ও অন্যান্য স্থানের NGO কর্মীরা নিপীড়িত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্টের হাত থেকে রক্ষার জন্যে প্রাথমিক চিকিৎসা ও মুখোশ সরবরাহ করেন। বিভিন্ন এনজিও গোষ্ঠীর (প্রধানতঃ WAHLI গোষ্ঠী) সুহার্ত সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসারদের দুর্নীতি (১৯৮০ সালে ৩৪টি স্থানীয় কাঠ ব্যবসায়ীর ২৪টি এই অফিসারদের মালিকানায় ছিল) এবং সুহার্তোর পুত্রদের ইন্টারন্যাশানাল টিম্বার কর্পোরেশনে যুক্ত থাকা ১৯৯৮ সালে সুহার্তোর পতনের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে পরিগণিত হয়। এইভাবে বিভিন্ন NGO গোষ্ঠীর চাপে ASEAN সংগঠনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই চাপেই ASEAN সংগঠনের সদস্যরা আঞ্চলিক পরিবেশ সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করেন এবং সীমান্তবর্তী এলাকার পরিবেশ দূষণ ঠেকাতে আসিয়ান কো অপারেশনাল প্ল্যান প্রবর্তন করেন। এটি নিঃসন্দেহে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ান অঞ্চলের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির এক বিরাট সাফল্য।

১৯৯৮ সালের ১৯শে জুন সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত হয় 'হেজ' এর উপর আসিয়ান দেশের মন্ত্রীগোষ্ঠীর চতুর্থ সভা। এই সভায় আসিয়ান গোষ্ঠীর সদস্যরা আন্তঃসীমান্তে 'হেজ' সংক্রমণ রোধে NGO দের ভূমিকা গ্রহণ করা হয়। সুতরাং এই NGO দের ভূমিকা প্রশংসিত হওয়ায় যেসব জনজাতি জঙ্গলের আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হত তারা রাষ্ট্রের অন্যান্য ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কোম্পানীর হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা নিতে সমর্থ হত। কিন্তু NGO দের ভূমিকা গ্রহণ করার ফলে বর্ধিত ASEAN গোষ্ঠীর সামনে নতুন সমস্যারও উদ্ভব হয়। এই গোষ্ঠীতে বর্তমানে লাওসের মত দেশ আছে যাদের নাগরিক সমাজ তেমনভাবে গড়ে উঠেনি অথবা আছে কাম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম বা ম্যয়নমারের মত দেশ যারা এই নাগরিক সমাজকে হয় স্বীকৃতি দেয় না অথবা গুরুত্বহীন করে রাখে। যদি সমস্ত ASEAN গোষ্ঠীভুক্ত দেশকে NGO দের অন্তর্দেশিয় অথবা আঞ্চলিক নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নে একই মানদণ্ডে রাখা হয় তবে এই সংগঠনের পুরোনো ও নতুন সদস্যদের মধ্যে ভবিষ্যতে বিভাজন আসা অবশ্যম্ভাবী। সব কিছু বিবেচনা করে বলা যায়, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিকে সহাবস্থানের জায়গায় থাকতে দীর্ঘপথ পরিক্রমা করতে হবে।

১.৫ সারসংক্ষেপ

উপরিউক্ত আলোচনায় আলোকপাত করা হল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির ঔপনিবেশিক ইতিহাস। এই অঞ্চলের কিভাবে ষোড়শ শতাব্দী থেকে ইউরোপিয়ানরা ধীরে ধীরে তাদের আধিপত্য কায়েম

করেছিল। তার পরবর্তীতে, এই অঞ্চলের রাজ্যগুলির ধর্ম, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক মতাদর্শ, অর্থনীতি ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তারা ক্রমান্বয়ে তাদের সাবেকী রাজতান্ত্রিক শাসনের পরিবর্তে নাগরিক সমাজের আন্দোলনের মাধ্যমে কিভাবে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অগ্রগতি ঘটায়। ঐ সমস্ত রাজ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অগ্রগতি ঘটলেও শাসকদের সাথে নাগরিক সমাজের মতপার্থক্য, টানাপোড়েন চলতে থাকে, একই সাথে গণতন্ত্রের বিকাশ ও উন্নয়নে সংগঠিত অ-সরকারী সংগঠনসমূহ এই অঞ্চলে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। এই এককে আলোচনা করা হয়েছে কিভাবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নাগরিক সমাজ বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়েছে এবং বিশ্বায়ন-এর কারণে তাদের উপর কিরকম প্রভাব পড়েছে।

১.৬ নমুনা প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

১। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নাগরিক সমাজের আন্দোলনের তাৎপর্য সবিস্তারে আলোচনা করুন।

২। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নাগরিক সমাজের সামনে যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে সেগুলি সবিস্তারে পর্যালোচনা করুন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী

১। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজ্যগুলির বিশেষত্ব আলোচনা করুন।

২। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নাগরিক সমাজের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব সম্পর্কে আপনার ধারণা ব্যক্ত করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১। ইন্দোনেশিয়ার রাজনীতিতে NGO-র ভূমিকা সংক্ষেপে লিখুন।

১.৭ নির্বাচিত সহায়ক গ্রন্থ

1. David Brown, *The state and ethnic politics in Southeast Asia*, Routledge, London, 1994.
2. Leek Hock Guan (ed.), *Civil Society in Southeast Asia*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2004.

3. Gabi Waibel, Judith Ehlert and Hart Nadav Feuer (eds.), *Southeast Asia and the Civil Society Gaze: Scoping a Contested Concept in Cambodia and Vietnam*, Routledge, London, 2013.

4. Michele Ford (ed.), *Social Activism in Southeast Asia*, Taylor Francis Ltd., United Kingdom, 2012.

5. Pierre P. Lizze, "Civil Society and Regional Security: Tensions and Potentials in Post-Crisis Southeast Asia, *Contemporary Southeast Asia*, Vol.22, No.3, December 2000.

একক—২ ❑ প্রবাসী চীনাদের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে বসবাস করার বিষয়ে আলোচনা ঃ মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের উদাহরণ

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ ভূমিকা

২.৩ মালয়েশিয়াতে চীনা জনগোষ্ঠীর অভিবাসন

২.৪ জাতিদাঙ্গা এবং নতুন অর্থনৈতিক নীতি

২.৫ নয়া অর্থনৈতিক নীতি প্রবর্তনের পর মালয়েশিয়া

২.৬ সিঙ্গাপুরে চীনাদের অবস্থান

২.৭ সারসংক্ষেপ

২.৮ নমুনা প্রশ্নাবলী

২.৯ নির্বাচিত গ্রন্থ

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্যগুলি হল ঃ

- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনা জনগোষ্ঠীর অভিবাসন পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা।
- মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে চীনাদের অবস্থা বিষয়ে সম্যক জ্ঞানার্জনে সহায়তা করা।
- বিভিন্ন সরকারী নীতির ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন জাতির যে বিবর্তন হয়েছিল সে বিষয়ে জ্ঞান লাভে সাহায্য করা।

২.২ ভূমিকা

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসে এই অঞ্চলে বরাবরই আঞ্চলিক এবং ঔপনিবেশিক শক্তি শতশত বছর ধরে আধিপত্য করে এসেছে। এর ফলে এই অঞ্চলের বেশির ভাগ দেশের জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক

অবস্থা বার বার সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। এ ব্যাপারে মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরের ঘটনাও ব্যতিক্রমী নয়। মালয়েশিয়ার মোট জন সংখ্যার দুই পঞ্চমাংশ এবং সিঙ্গাপুরের চার পঞ্চমাংশ অধিবাসী চীন থেকে আগত।

২.৩ মালয়েশিয়াতে চীনা জনগোষ্ঠীর অভিবাসন

এটা সত্য যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে চীনা জন গোষ্ঠীর অভিবাসন ঔপনিবেশিক শাসনের পূর্ব থেকেই ঘটে চলেছে কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের সময় এর গতি বৃদ্ধি পায় বিশেষতঃ মালয় অঞ্চলে যা ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উপনিবেশ পূর্ব যুগে চীনারা এই অঞ্চলের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলো কিন্তু তা ছিল সীমিত আকারে। এমনকি ডাচরা মালয় অঞ্চলে বসবাস করার সময়ও বিদেশী অভিবাসনে কোন উৎসাহ দেখায় নি। কেবলমাত্র ১৭৮৬ সাল থেকে ব্রিটিশরা আসার পর বিদেশীদের আগমনকে উৎসাহ দেওয়া হয় যেমন চীনা এবং ভারত থেকে মানুষরা ঐ দেশে বসবাস শুরু করেন। এর পিছনে ব্রিটিশদের যুক্তিগত ভিত্তি ছিল যে এই অঞ্চলের কাঁচামাল পরিবহনের জন্য রেললাইন পাতায় কাজে প্রয়োজন পড়েছিল সস্তা শ্রম। নতুন নতুন উপনিবেশে চা কফি উৎপাদন বা কৃষিদ্রব্য উৎপাদনের জন্যেও সস্তা শ্রমের প্রয়োজন ছিল। চীন দেশ থেকে যারা মালয় দেশে চলে গিয়ে বসবাস শুরু করেছিলেন তারা মূলতঃ কোয়াংটাং, কোয়াংসি এবং ফুকিয়ান অঞ্চল থেকে এসেছিলেন। অতিরিক্ত জনসংখ্যায় চাপ এবং অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়াই এইসব মানুষের চীন থেকে প্রতিবেশী মালয় আসার প্রধান কারণ। চীন এবং মালয়ের পরিবেশগতভাবেও অনেক মিল বিদ্যমান। বৃটিশরা বিদেশিদের এ ব্যাপারে যে উৎসাহিত করেছিল তার অন্যতম উদাহরণ ১৯০৯ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে প্রায় এক কোটি ষাট লক্ষ চীনা এবং ভারতীয় নিজেদের দেশ ছেড়ে মালয়তে চলে এসেছিল বসবাসের উদ্দেশ্যে। এটাও বলা হয় চীন থেকে এত পরিমাণে জন সাধারণ চলে আসার পিছনে কোকিসঙ্গা নামক মাঞ্চু বিরোধী জলদস্যুর একটা বড় ভূমিকা ছিল। একবার কোকিসঙ্গা ফুকিয়ান প্রদেশের তটে অবতরণ করেন প্রাথমিকভাবে তার জাহাজের জন্য জ্বালানি ভর্তি এবং মাঞ্চুর সরকারকে অপছন্দ করার জন্যে। এই অঞ্চলের মানুষও মানঞ্চু সাম্রাজ্যের বিরোধী ছিল। মাঞ্চু সরকার এর মোকাবিলা করার জন্য—এই অঞ্চলের সমস্ত মানুষকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে যারা প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে কোয়ানটাং, ফুকিয়ন এবং চেকিয়ান প্রদেশের সমুদ্রতটে আশ্রয় নেয়। কিন্তু এই সব এলাকায়ও সমস্ত গ্রাম আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং সরকারের তরফ থেকে সব শস্য নষ্ট করে ফেলা হয়। শাসকদের নির্মম ব্যবহারে

এই এলাকায় মানুষ মালয়েশিয়ায় পালিয়ে গিয়ে বসবাস করতে এবং জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হয়।

প্রথমদিকে চীন থেকে যখন মানুষরা চলে আসছিলেন তখন মাঞ্চু সরকার তাদের প্রতি নিস্পৃহ ছিল। এমন কি দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলের ঔপনিবেশিক শাসকরা যেমন বাটাভিয়াতে ডাচরা ১৭৪০ সালে চীনাদের নৃশংস হত্যা করার সময় মাঞ্চু সাম্রাজ্য এব্যাপারে কোন বিচার দাবী করেনি। এর মূল কারণ সাধারণ ভাবে মনে করা হত সমস্ত জীবিত বস্তুর পূর্বসূরীদের আত্ম রক্ষা করা এবং দেখাশুনা করা উচিত এবং কখনই তাদের জন্মাস্থান ত্যাগ করা উচিত নয়। এই প্রথা সত্ত্বেও যারা অন্য দেশে স্থানান্তরিত হয়েছিল তাদের নিকৃষ্ট হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল এবং তারা তাদের সামাজিক সম্মান হারায়। অবশ্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে দেশান্তরিত চীনারা অত্যন্ত কষ্ট সহিষ্ণু এবং নিবেদিত প্রাণ জনগোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছিল ও সবুজ তৃণভূমির সন্ধানে কাজ করত। চীন থেকে আসা জনগোষ্ঠী ধীরে ধীরে মালয়েশিয়ার অর্থনীতিতে নিজেদের আধিপত্যের পরিচয় দিতে থাকে, বিশেষতঃ শিল্প সংস্থা এবং রবার ও চিনি উৎপাদনের জন্য অক্ষু চাষ সংক্রান্ত চাষবাসে, যেখানে স্থানীয় ভূমিপুত্ররা প্রথাগত কৃষিকার্যে নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছিল। মজার ব্যাপার যেসব চীনা মালয়েশিয়ায় দেশান্তরিত হয়েছিল তারা সমজাতীয় ছিল না। তারা বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং আঞ্চলিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল যেমন চাওঝাও, ফুজিয়ান, গুয়াংডং হাইনান কেজিয়া, ফুসাউ এবং ওয়াংজী। বৃটিশের ঔপনিবেশবাদ মালয়েশিয়ার অর্থনীতি আর্থ-সামাজিক উদ্ধৃত্তহীন কৃষিপণ্য উৎপাদনকারী দেশ থেকে রফতানী নির্ভর অর্থনীতি তে পরিবর্তিত হল যা উপনিবেশকারী দেশকেই সহায়তা করেছিল। এখানে উল্লেখ্য মালয়েশিয়ার ব্রিটিশ পদার্পনের পূর্ব পর্যন্ত টিন এবং কাঠকে কেন্দ্র করেই সাধারণ মানুষের জীবিকা নির্বাহ হত। ব্রিটিশরা আসার পর সম্পূর্ণ নিজেদের অর্থনীতির স্বার্থে রবার চাষের পত্তন হয়। এ জন্য ব্রিটিশদের উপনিবেশ থাকার সময় টিন এবং রবার মালয়েশিয়ার অর্থনীতির প্রধান দুটি স্তম্ভ ছিল। টিন, রবার এবং কাঠ, এই তিনটি জিনিস বহির্বিশ্বে রফতানী করা হত। যেহেতু স্থানীয় মালয়ীরা তাদের প্রথাগত কৃষিকাজ পরিত্যাগ করতে অনিচ্ছুক ছিল, ইউরোপিয়ান উপনিবেশীকারীরা দেশান্তরিত চীনা এবং ভারতীয়দের নতুন ধরনের কৃষিকার্যে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করেছিল। ঔপনিবেশিরাও এই সামাজিক বিচ্ছিন্নতা যা জাতপাত এবং পেশার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল তাকে স্বাগত জানিয়েছিল। চীনাদের সবচেয়ে কর্মকুশলী গোষ্ঠী হিসাবে সমীহ করা হত। উপনিবেশ কালে শিক্ষা ব্যবস্থাও এমনভাবে রূপ দেওয়া হয়েছিল যাতে চীনা এবং ভারতীয়দের সবচেয়ে সুবিধা হয় এবং সবচেয়ে কম সুবিধা হয় স্থানীয় মালয়ীদের। যার ফলে স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরই চীনাদের ঘরোয়া

আয় অন্যদের চেয়ে বেশি ছিলো এবং প্রশাসনিক পদ, দন্ত চিকিৎসক, প্রযুক্তিবিদ, হিসাবরক্ষক ইত্যাদির সংখ্যায় অন্যদের চাইতে তারা অনেকটা এগিয়ে ছিল।

জাতপাতের ভিত্তিতে বিভাজিত সমাজ ব্যবস্থার জন্য উপনিবেশ উত্তর কালে বহু রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করে যারা প্রত্যেকেই নিজেদের গোষ্ঠীর স্বার্থে কাজ করতে থাকে। এর ফলে চীনা গোষ্ঠীর স্বার্থে তৈরী হয় মালয়ান কমিউনিষ্ট পার্টি (MCP), এবং মালয়ান চাইনিস অ্যাসোসিয়েশন (MCA) দি ইউনাইটেড মালয়স্ ন্যাশনাল অর্গানাইজেসন (UMNO) এবং পাতাই ইসলাম (PAS) মালয়ীদের স্বার্থে গঠন করা হয়। ভারতীয়দের জন্য গঠিত হয় মালয়ন ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস যা প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর প্লাটফর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হত। ব্রিটিশরা "ডিভাইড এণ্ড রুল" বা "ভাগ করো এবং শাসন করো" নীতি অনুযায়ী চলে এই দলগুলিকে জাতপাতের ভিত্তিতে ভাগ করে রেখেছিল যাতে তারা না সমবেত ভাবে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। যখন ব্রিটিশরা 'মালয়ান ইউনিয়ন' প্রকল্প ঘোষণা করে তখন মালয়ী উচ্চবর্গীয় মানুষেরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয় কারণ এই প্রকল্পে মালয়ীদের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে, এই প্রকল্প জাতপাতের ভিত্তিতে বহুধা বিভক্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর মানুষদের সহায়তা করেছিল এবং মালয়ী সুলতানের ক্ষমতা ও সুযোগসুবিধা খর্ব করে অমালয়ীদের মালয়ের নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রস্তাবনা আছে। বস্তুতপক্ষে এই মালয়ান ইউনিয়ন প্ল্যানের বিরোধীতা করার জন্য ১৯৪৬ সালে UMNO গঠিত হয় যাতে মালয়ীদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে। এর সাথে মালয়ীদের ক্ষোভকে প্রশমিত করার জন্য 'দি মালয়ন ফেডারেশান প্রকল্প সামনে আনা হয় যার ফলে মালয়েশিয়ায় নাগরিকত্ব পাওয়া চীনাদের পক্ষে প্রচণ্ড কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। এর ফলস্বরূপ ১৯৩০ সালে স্থাপিত হওয়া মালয়ান কমিউনিস্ট পার্টি শক্তিশালী হয়ে আত্মপ্রকাশ করে যাতে শ্রমজীবি মানুষ বিশেষতঃ চীনাদের স্বার্থ রক্ষিত হয়। ধীরে ধীরে এটি খুবই শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে পরিগণিত হয় যাদের সংগঠিত অস্ত্রসজ্জিত শাখা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিজেদের পরিচিত করেছিল। আরো একটি রাজনৈতিক দল ১৯৪৭ সালে গঠিত হয় মালয়ন চাইনিস অ্যাসোসিয়েশন (MCA) নামে যাদের উদ্দেশ্য ছিল চীনা ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থ রক্ষা করা। এই গোষ্ঠী বা দল MCP নামক সংগঠনটির সমান্তরাল সংগঠন হিসেবে গড়ে উঠেছিল। বৃটিশ সরকার এই নতুন MCA সংগঠনের কাজকর্মের পিছনে সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল কারণ এই সংগঠন চীনাদের সমমনোভাবসম্পন্ন বুর্জোয়াদের ব্যবসায়িক সংগঠন হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। চীনা ব্যবসায়ীরা এর আগেও নানা সংগঠন যেমন স্ট্রেটস চাইনিস ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন এবং চাইনিস চেম্বার অবকমার্স গঠন করার প্রয়াস করলেও নতুন সংগঠন MCA তাদের স্বপ্নপূরণের পথে এক উল্লেখযোগ্য

পদক্ষেপ বলে মনে করা হয়। মালয়েশিয়ায় বসবাসকারী ভূমিপুত্র ও চীনাদের অর্থনৈতিক বৈষম্যের পরিমাণ নিচের সারণী থেকে স্পষ্ট হয়।

সারণি নং ১

(দারিদ্র্য সূচক মালয়েশিয়ায় (%) বসবাসকারীদের মধ্যে)

বছর	১৯৫৭	১৯৭০
মালয়ী		
সব মিশিয়ে	৭০.৫	৬৫.৯
গ্রামীণ	৭৪.৯	৭০.৩
শহর	৩২.৭	৩৮.৭
চীনা		
সব মিশিয়ে	২৭.৪	২৭.৫
গ্রামীণ	২৫.২	২৪.৬
শহর	২৯.৪	৩০.৫
ভারতীয়		
সব মিশিয়ে	৩৫.৭	৪০.২
গ্রামীণ	৪৪.৮	৩১.৮
শহর	৩১.৫	৪৪.৯

উপরের সারণী থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় অন্যান্য অমালয়ী জনগোষ্ঠীর তুলনায় মালয়ীদের দারিদ্র্য অনেকটাই বেশি ছিল। ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে মালয়ীদের দারিদ্র্য কিছুটা কমার লক্ষণ দেখা যায় যদিও তারা একেবারে নীচের সারিতেই ছিল। ১৯৭০ সালে ৬৫.৯ শতাংশ মালয়ী দরিদ্র ছিল যেখানে চীনা এবং ভারতীয়দের দারিদ্রের হার ছিল যথাক্রমে ২৭.৫ ও ৪০.২ শতাংশ।

তাছাড়া গ্রামীণ মানুষের দারিদ্র্য শহরের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। আরো উল্লেখ করা যায়, ১৯৭০ সালে চীনা গোষ্ঠীর মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় ৬৮ মালয়োশিয়ান ডলার যেখানে ভারতীয় এবং মালয়ীদের মাথাপিছু আয় যথাক্রমে ৫৭ ডলার এবং ৩৪ ডলার।

সারণি নং ২

১৯৭০ এ মালয়েশিয়া দ্বীপপুঞ্জে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর আয়ের শতকরা হিসাব

মাসিক আয়ের সীমা (ডলার)	মালয়ী	চীনা	ভারতীয়	অন্যান্য
১ - ৯৯	৪০.৩০	৮.৩	১১.৬০	২৫.০০
১০০ - ১৯৯	৩৩.৭০	২৫.০০	৩৯.৩০	১২.৫০
২০০ - ৩৯৯	১৮.৩০	৩৮.০০	৩১.৩০	১২.৫০
৪০০ - ৬৯৯	৫.৩০	১৭.০০	১০.৭০	১২.৫০
৭০০ - ১৪৯৯	২.০০	৯.২০	৫.৩০	১২.৫০
১৫০০ - ২৯৯৯	০.৪০	২.২০	০.৯০	১২.৫০
৩০০০ এবং এর উর্ধ্বে	সামান্য	০.৩০	০.৯০	১২.৫০
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

উপরোক্ত সারণি থেকে বোঝা যায় মালয়েশিয়া দ্বীপপুঞ্জের ৪০.৩ শতাংশ মালয়ীদের মাসিক আয় ১০০ মালয়েশিয়ান ডলারের থেকেও কম যেখানে ৭৪ শতাংশের বেশির মাসিক আয় ২০০ মালয়েশিয়ান ডলার। চীনাদের মধ্যে মাত্র ৮.৩ শতাংশের মাসিক আয় ১০০ ডলার এবং ৩৩.৩ শতাংশের মাসিক আয় ২০০ ডলারের কম। একইভাবে ভারতীয় জনগোষ্ঠীর ১১.৬ শতাংশের মাসিক আয় ১০০ ডলারের থেকে কম, এবং ৫০.৯ শতাংশের মাসিক আয় ২০০ ডলারের থেকে কম। অন্যান্যদের তুলনায় মালয়ী জনগোষ্ঠীর দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থার জন্যে দায়ী তাদের শিল্প এবং বাণিজ্যে যোগদান না করা। গড় আয় বিবেচনা করলেও ১৯৭০ সালে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর তুলনায় মালয়ীদের অবস্থান ছিল অনেক নৈরাশ্যজনক।

২.৪ জাতিদাঙ্গা এবং নতুন অর্থনৈতিক নীতি

১৯৫৭ সালে বৃটিশরাজের অবসানের পর নতুন মালয়েশিয়া সরকার International Bank for Reconstruction and Development (IBRB)-এর সাহায্যে এবং নির্দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে রফতানীযোগ্য সামগ্রী প্রস্তুতে বেশি বিনিয়োগ করা শুরু করে এবং অন্যান্য আমদানিকৃত সামগ্রীর পরিবর্ত সামগ্রীর প্রস্তুত ও নির্মাণে জোর দেন। এই নতুন দেশ বিশ্বব্যাঙ্কের পরামর্শ অনুযায়ী বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহ দান করে। এই পুঁজিকে উৎসাহ দেবার জন্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন (যথা, উন্নত

যোগাযোগ ব্যবস্থা, ভূমি পরিষ্কার কর্মসূচী), ভর্তুকি ও শুল্ক ছাড় দেওয়া ইত্যাদির প্রবর্তন করা হয়। এর ফলে স্থানীয় কলকারখানাগুলি উন্নত শিল্পসংস্থার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং তাদের উন্নয়ন নির্ভর করে বিদেশী বিনিয়োগ, বিদেশী প্রযুক্তি ও বিশেষজ্ঞের উপর। এই ধরণের শিল্পায়ন অবশ্য স্থানীয় অর্থনীতিকে পরিবর্তন করতে পারেনি কারণ স্থানীয় অর্থনীতি এভাবে শক্তিশালী হয় না বা গতি লাভ করেনা। ষাটের দশকে মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতির আলোচনা নয়, মূল বিবেচ্য ছিল অর্থনৈতিক সুফল। সব শ্রেণীর জনগণ সমানভাবে লাভ করেন নি এবং মূলতঃ মালয়ীরা দিনে দিনে আরও দরিদ্র হয়ে পড়েছে। যদিও মালয়েশিয়ান সংবিধানে মালয়ীদের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন করার কথা বলা হয়েছিল, বাস্তবপক্ষে এ ব্যাপারে কোন ধরণের সরকারী হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়নি। সম্পদের এই অসম বন্টনের ফলে শহর এবং গ্রাম, এক জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে অন্যের অর্থনৈতিক অসাম্য দিন দিন বেড়েই চলতে লাগলো। এর ফলে বিভিন্ন জাতি এবং ভাষাভাষীর মধ্যে মালয়েশিয়ার কাঠামোতেই সামাজিক উত্তেজনা বেড়ে চলতে লাগলো, মালয়ীদের দুর্বল অর্থনৈতিক স্থিতি এবং চীনাদের সাথে তাদের অসাম্য মালয়দের কাছে অসন্তোষের কারণ হয়। ফলস্বরূপ সরকারের খোলামেলা অর্থনীতির সবচেয়ে বড় সমালোচক হয়ে উঠে মালয়ী জাতি গোষ্ঠীর মানুষজন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ১৯৫৭ সালে জোট সরকার সেই ঔপনিবেশিক সরকারের আমলের অর্থনীতিই চালু রাখার জন্য চীনা গোষ্ঠীর অর্থনীতি উন্নত হলেও মালয়ীদের অবস্থা উন্নত করতে ব্যর্থ হয়। মালয় জনগোষ্ঠীর মতে, জোট সরকার চীনাদের স্বার্থরক্ষায় বেশি তৎপর এবং এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য মালয়ীদের জন্য শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক স্থিতির উন্নতির প্রয়োজন যাতে তারা অমালয়ীদের সঙ্গে একসাথে কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে চলতে পারে। মালয়েশিয়া ১৯৫৭ সালে স্বাধীন হবার পর সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল সমাজের বহুবিভক্ত জনগোষ্ঠীকে নিয়ে সরকার পরিচালনা করা। এই জোট সরকারে অংশগ্রহণকারী দলগুলি ছিল মালয় পার্টি, ইউনাইটেড মাল্কয়স ন্যাশানাল অর্গানাইজেসান (UMNO), মালয়েশিয়ান চাইনিস অ্যাসোসিয়েশন (MCA) এবং মালয়েশিয়ান ইন্ডিয়ান কংগ্রেস (MIC)। বিরোধী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল চাইনিস ডেমোক্রেটিক পার্টি (DAP)। প্রতিটি রাজনৈতিক দল প্রতিটি পূর্ববর্তী নির্বাচনে জাতিগোষ্ঠীগত এবং সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে নিজেদের সমর্থন সংঘবদ্ধ করত। (উদাহরণ ১৯৫৯ এবং ১৯৬৪ সাল)।

এই পরিস্থিতি আরো বিস্ফোরক হয়ে উঠেছিল কারণ চীনা জনগোষ্ঠীও যথেষ্ট হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল। চীনাদের মনে হয়েছিল সরকার মালয়ী জনগোষ্ঠীর জন্য অনেক কিছু করছে এবং তারা উপেক্ষিত হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের মনে হয়েছিল সরকার মালয়ীদের প্রতি অত্যন্ত পক্ষপাতদুষ্ট এবং "মালয় স্পেশাল রাইটস" বা মালয়ীদের জন্য বিশেষ আইনের (১৯৫৭ সালের সংবিধানের ১৫৩

অনুচ্ছেদ নির্দিষ্ট) তারা তীব্র বিরোধীতা করেছিল। এই জনগোষ্ঠীদের মধ্যে বেড়ে যাওয়া উত্তেজনার ফলে ১৩ই মে ১৯৬৯ সালে জাতি দাঙ্গা শুরু হয়। এই দাঙ্গা বেশ কিছুদিন ধরে চলতে থাকে এবং বহু জীবনহানির ঘটনা ঘটে। সরকারী হিসেব অনুযায়ী এই দাঙ্গায় ১৯৬ জন মানুষের মৃত্যু হয়, ৯১৪৩ জন গ্রেপ্তার হন, এবং ৭৫৩ টি ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটা অনুভব করা যায় চীনা এবং মালয়ী জাতিগোষ্ঠীর পরস্পরের প্রতি গভীর সন্দেহ এই দাঙ্গার মূল কারণ। রাজনৈতিকভাবে বিরোধী শক্তির ক্রমবর্ধমান আত্মপ্রকাশ এবং আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলে চীনা গোষ্ঠীর ক্রমান্বয়ে উন্নতি মালয়ী গোষ্ঠীকে, নিজেদের ক্ষয়িষ্ণু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, নিরাপত্তাহীন ভাবতে সাহায্য করে। অপরদিকে চীনারাও ভীত হয়ে ভাবতে থাকে যে তাদের জীবন ধারা, সংস্কৃতি এবং স্বাধীনতা সংখ্যাগুরু মালয়ীদের চাপে বিপন্ন হয়ে গেছে।

জাতিগত দাঙ্গা উন্নত মালয়েশিয়ায় নীতির নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচক হিসেবে পরিগণিত হয়। এর ফলে মালয়ী গোষ্ঠীর অনুকূলে নতুন ভাবে নীতি নির্ধারিত করার সূচনা হয়। সরকার উপলব্ধি করেন রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা এবং জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে সংখ্যাতত্ত্বের বিচার্যে প্রধান নির্বাচকমণ্ডলী সেই মালয়ী গোষ্ঠীর দারিদ্র্য দূরীকরণ সবচেয়ে জরুরী। এই চিন্তাভাবনা থেকে ১৯৭১ সালে NEP প্রবর্তিত হয় যা দ্বিতীয় প্লানের (১৯৭০-৭৫) অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং কুড়ি বছরের জন্য গৃহিত Perspective Plan (1970-90)-এর অঙ্গ হিসেবে গৃহিত হয়। এই NEP এর দুটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল (ক) আয়ের মাত্রা বাড়িয়ে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং গোষ্ঠী নির্বিশেষে সমস্ত মালয়েশিয়ান নাগরিকের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা, (খ) মালয়েশিয়ান সমাজকে নতুন ভাবে গড়ে তোলার গতি বৃদ্ধি করা যাতে অর্থনৈতিক অসাম্য দূর হয় এবং অর্থনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে এক নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর অনুভাবিতা (Identification) দূর করা যায়। NEP প্রকল্পের মূল অভিমুখ ছিল মালয়ী এবং অন্যান্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিয়ে আর্থ সামাজিক অসাম্য দূর করা। এর আসল উদ্দেশ্য জাতীয় ঐক্য সুসংহত করা এবং জাতি গঠনে সহায়তা করা। চীনা গোষ্ঠী সমস্ত অর্থনৈতিক ক্ষমতা যাতে একচেটিয়াভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ না হয় তার উদ্দেশ্যেই এই NEP এর লক্ষ্য ছিল মালয়ীদের পক্ষে সম্পদের ভাগ সমানভাবে বন্টন করা।

সামাজিক পুনর্গঠন NEP এর যে মূল লক্ষ্য তাতে ভূমিপুত্রদের দেশের বড় বড় শিল্প সংস্থায় মালিকানা এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ১৯৭০ এর ২.৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৯০ তে ৩০ শতাংশতে পর্যবসিত হয়। অমালয়ী গোষ্ঠীভূক্তরা (চীনা ২৭.২ শতাংশ ভারতীয়রা ১.১ শতাংশ) বার্ষিক শতকরা ১২ শতাংশ হারে অংশগ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছিল যাতে ১৯৯০ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ

মূলধনী অংশীদারত্ব অর্জন করা যায় এবং একই সময়ের মধ্যে বিদেশী অংশগ্রহণ ৬৩.৩ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশে নেমে আসে। এই ধরণের সামাজিক পুনর্গঠন যা NEP-এর মাধ্যমে দ্বিতীয় প্লানে (১৯৭১-৭৫) রূপায়িত করার কথা ভাবা হয়েছিল। তার মূল উদ্দেশ্য ছিল শিল্প ও বাণিজ্যের দিক দিয়ে সফল ও উন্নত মালয় গড়ে তোলা এবং গোষ্ঠীর সমানুপাতিক হারে সমস্ত মানুষকে উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত করে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে NEP সমাজকে তিনভাগে পুনর্গঠিত করে। প্রথমতঃ আধুনিক শিল্পে ভূমিপুত্রদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, দ্বিতীয়তঃ কর্পোরেট মালিকানায় ভূমিপুত্রদের মালিকানার হার বৃদ্ধি করা এবং তৃতীয়তঃ ম্যানেজেরিয়াল (Managerial) কাজে ভূমিপুত্রদের সংখ্যা বাড়ানো।

নতুন অর্থনৈতিক নীতি ভূমিপুত্রদের আর্থিক অবস্থা উন্নত করতে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছিল। কিন্তু এটা অভিযোগ করা হয় নতুন নীতি দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে স্বজন পোষণ ও দুর্নীতির নতুন দরজা খুলে দেয়। যেমন, দারিদ্র্য দূরীকরণের সমস্ত কর্মসূচী দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী ভূমিপুত্রদের পক্ষেই লাভদায়ক হয়েছিল যদিও সমস্ত গোষ্ঠীরই সমানভাবে উপকৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে নীতি প্রণয়ন করা হয়। বিভিন্ন সংস্থা যেমন MARA এবং Bank Negara মালয়ী গোষ্ঠীর উদ্যোগপতিদের উৎসাহিত করার অভিপ্রায়ে স্থাপন করা হয়। চীনা জাতিগোষ্ঠীর মানুষরা বুঝতেন নীতিকে-প্রভাবিত করার ক্ষমতা তাদের নেই। সুতরাং তারা নতুন নীতিতে নিজেদের মানিয়ে নেওয়া শুরু করে। যেটা চীনাদের সবচেয়ে বিচলিত করেছিল তা হল মালয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার ব্যাপারে উত্তরোত্তর গুরুত্ব দেওয়া এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষতঃ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামিকরণের প্রক্রিয়া চালু করা। এটা আরও পরিষ্কার হয় একটা পরিসংখ্যানের মাধ্যমে যেখানে দেখা যায় ১৯৭০ সালে স্নাতক স্তরে মালয়ী এবং চীনা গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে ৩৯.৭ শতাংশ এবং ৪৯.২ শতাংশ হলেও ১৯৮৮ সালে তা পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬৩ শতাংশ এবং ২৯ শতাংশ। এমনকি মারডেকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মান্দারিনকে শিক্ষার মাধ্যমে হিসাবে চালু করার জন্য গোষ্ঠীর প্রয়াসকে মালয়েশিয়া সরকার বন্ধ কার দেয় যেখানে UMNO প্রধান দল হিসেবে সরকার নিয়ন্ত্রণ করত। ১৯৭০ এবং ১৯৭৭ সালের মধ্যে নতুন তৈরী হওয়া ১৬২০০০ পদের ৬৮ শতাংশ পদে মালয়ীরা নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং ১৯৭৯-৮০ সালের মধ্যে ৯৩ শতাংশ নতুন পদে তাদের নিযুক্তি ঘটেছিল।

২.৫ নয়া অর্থনৈতিক নীতি প্রবর্তনের পর মালয়েশিয়া

নতুন অর্থনৈতিক নীতি (The New Economic Policy) ১৯৯০ সাল পর্যন্ত কার্যকরী ছিল। পরে এই নীতির বদলে ন্যাশানাল ডেভলপমেন্ট পলিসি (The National Development Policy) গ্রহণ করা হয়। এই নতুন পলিসি মালয়েশিয়ার দ্বিতীয় পারস্‌পেকটিভ প্ল্যানের (Perspective Plan)

অন্তঃস্থল (core element) বলে মনে করা হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই NDP দশ বছরের জন্যে কার্যকরী থাকবে যা NEP এর মোট সময়সীমার অর্ধেক। এর ফলে এই প্ল্যানের অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে প্রকৃত মূল্যায়ণ করা যায়। NDP গঠন করা হয়েছিল ভিসন ২০২০ এর লক্ষ্যে। ভিসন ২০২০ এর উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় ঐক্যকে মূল লক্ষ্য হিসেবে রেখে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করা এবং রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা ও অর্থনৈতিক উন্নতি নিশ্চিত করা। NDP অবশ্য মূল ভাবধারা এবং পরিকল্পনায় NEP কে অনুসরণ করেছে। NEP এর ঘোষিত লক্ষ্য ব্যতিরেকে ও NDP এর লক্ষ্য ছিল ঃ প্রথমতঃ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দিক পরিবর্তন করে চরম দারিদ্র্য এবং আপেক্ষিক দারিদ্র্য দূর করার দিকে বেশি নজর দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ অর্থনীতির আধুনিক শাখাতে ভূমিপুত্রদের সার্থক যোগদান বাড়ানোর প্রয়াসে কর্মসংস্থান এবং দ্রুত উন্নতির জন্য ভূমিপুত্রদের সাহায্য করা এবং তাদের শিল্প ও বাণিজ্যে ব্যাপক উন্নতি ঘটানো। তৃতীয়তঃ বেসরকারী ক্ষেত্রের উপর বেশি নির্ভরতা যাতে উন্নতির সুযোগ বিস্তৃত হয়। চতুর্থতঃ সামাজিক পরি কাঠামোতে মানবসম্পদ উন্নয়নের উপর বেশি জোর দেওয়া। সংক্ষেপে NEP-কে অনুসরণ করে NDP ভূমিপুত্রদের সমর্থনে রক্ষাকারী বৈষম্যের (protective discrimination) নীতি গ্রহণ করেছিল যা ১৯৫৭ সালের সংবিধানের ১৫৩ নং ধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। যদিও NDP ভূমিপুত্রদের সমাজে আরও গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে তবু NEP এর মতো কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা ধার্য্য করা হয়নি এই সব ভূমিপুত্রদের অন্ততঃ ৩০ শতাংশকে সার্বিকভাবে উন্নীত করার ক্ষেত্রে।

এই পর্যায়ে আলোচনার মর্মার্থ হল, শুধু মালয়েশিয়ার সংবিধান নয়, পরবর্তী সরকারী নীতি বরাবরই ভূমিপুত্রদের সমর্থন করে এসেছে এবং ক্রমবর্ধমান চীনা গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কতৃত্বকে প্রতিহত করার প্রয়াসে ভূমিপুত্রদের শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে যোগদানকে উৎসাহ দান করা হয়েছে। চীনা প্রবাসী এবং ভারতীয়দের বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা বরাবরই পছন্দ করত কারণ এরা অনেক শৃঙ্খলাপরায়ণ এবং উদ্যমী ছিল। ঔপনিবেশির্ক শাসনের অবসানের পর ১৯৫৭ সালে মালয়েশিয়ার স্বাধীনতার পর থেকেই সরকার ভূমিপুত্রদের সমর্থক হিসেবে কাজ করে এবং ১৯৬৯ সালের জাতিদাঙ্গার পর এটাও আরও জোরদার হয়। NEP এবং NDP এর পরেও অর্থনৈতিক আধিপত্যের ক্ষেত্রে চীনাদের যথেষ্ট নজরে পড়ে যদিও NEP এবং NDP এর প্রভাবে ভূমিপুত্রদের উন্নতিও নজরে এড়ায় না।

২.৬ সিঙ্গাপুরে চীনাদের অবস্থান

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ উপনিবেশ ছিল সিঙ্গাপুর। ১৮১৯ সালে স্যার স্ট্যামফোর্ড রাফ্‌ল্‌স্ এটির প্রতিষ্ঠা করেন। স্যার র‍্যাফেল্‌স্ জাভার লেফটেন্যান্ট ছিলেন এবং পরে হল্যাণ্ডে পুনর্বহাল

হন। যখন ব্রিটিশরা সিঙ্গাপুর অধিগ্রহণ করে তখন তা মূলতঃ জলা জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। র‍্যাফেলসের পরিকল্পনাতেই সেখানে একটি বন্দর গড়ে তোলা হয় যেখানে কোন বাধা নিষেধ থাকবে না এবং সমস্ত দেশের ব্যবসায়ীরা এটি ব্যবহার করতে শুরু করে। এর ফলে এই বন্দরের দ্রুত উন্নতি হয় এবং মালাক্কা এবং পেনাং বন্দর দুটির তুলনায় উন্নততর হয়ে ওঠে। এটি উনিশ শতকের প্রধান বাণিজ্যিক ও গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

১৮২৪ সালে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান কোম্পানী ডাচেদের কাছ থেকে সুমাত্রায় ব্রিটিশ ব্যবস্থা কেন্দ্রের বিনিময়ে মালাক্কা অধিগ্রহণ করে। এই তিনটি ব্রিটিশ উপনিবেশ—পেনাং, সিঙ্গাপুর ও মালাক্কা ১৮২৬ সাল থেকে "Straits Settlement" হিসেবে ব্রিটিশদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই তিনটি স্থানকে প্রশাসন অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে পরিচালনা করেন কারণ এদের অবস্থিতি এবং নৌবন্দরের সুবিধা। ব্রিটিশরা পার্শ্ববর্তী রাজ্য মালয়ের সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে নিজেদের যুক্ত করতে শুরু করে। উনিশ শতকে মালয়ে বিরাট অর্থনৈতিক উন্নতি হয় টিন ধাতুর খনিজ শিল্পে যেখানে মূলতঃ দেশান্তরীত চীনারাই শ্রমিক হিসেবে কাজ করতো (যারা মালয়ীদের থেকে বেশি পরিশ্রমী ছিল) এবং পরবর্তীকালে রবার চাষের ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়ে। রবার চাষে দক্ষিণ ভারত থেকে প্রচুর শ্রমজীবী মানুষ এসেছিলেন। এই বিভিন্ন জাতির মিশ্রণের ফলে স্থানীয় মালয়ীরা কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হয় বিশেষতঃ বিপুল সংখ্যক চীনাদের কারণে যাদের মোট জনসংখ্যা সিঙ্গাপুরের জনসংখ্যার প্রায় তিন চতুর্থাংশ হয়ে পড়েছিল।

চীনাদের সিঙ্গাপুরে বসবাসের প্রথম তথ্য ভিত্তিক প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৭৮ সালে। নিকটবর্তী মালাক্কা এবং রিয়ডি দ্বীপ থেকে চীনারা সিঙ্গাপুরে চলে আসেন যখন তাঁরা ডাচ ঔপনিবেশিক শাসনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ছিলেন। কিন্তু তার আগেও সিঙ্গাপুরে যথেষ্ট পরিমাণে চীনাদের উপস্থিতির কথা জানা যায়। ১৮৬৬ সালে সিঙ্গাপুরের আইনসভায় আইন দ্বারা নথীভুক্ত ১৭৮টি জাহাজ বা জলযানের মধ্যে স্থানীয় চীনাদের ১২০টির মালিকানা এবং ইউরোপিয়ান, ভারতীয় ও মালয়ীদের মিলিতভাবে মালিকানা ছিল ৫৮টির। অবশ্য, সিঙ্গাপুরে চীনাদের দেশান্তরিত হওয়া গতি লাভ করে ব্রিটিশ রাজত্বকালে। মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরের শাসক হিসেবে ব্রিটিশরা সস্তা ও দক্ষ শ্রমে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের তাগিদে চীনাদের এই সব দেশে চলে আসাকে উৎসাহ দান করে। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সিঙ্গাপুর বন্দরকে প্রবেশদ্বার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ব্রিটিশদের প্রয়োজন ছিল চীনের শ্রমজীবি মানুষ। বিশ্বের প্রবেশদ্বার হিসাবে সিঙ্গাপুরের গড়ে তোলার সাথে সাথে চীনা ব্যবসায়ীরা সমুদ্র বন্দরে কাজে লাগাবার এবং ইউরোপীয় প্রযুক্তিবিদ্যায় নিজেদের ব্যবসা উন্নয়নে পুরোপুরি কাজে লাগায়। সিঙ্গাপুর এবং চীনা রাষ্ট্রের সাংঘাই প্রদেশের মধ্যে সরাসরি বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল শুরু হয়। এর ফলে মূল ভূখণ্ডে বসবাসকারী

জাতিগোষ্ঠীকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে। এর ফলস্বরূপ বর্তমান সিঙ্গাপুর এক আকর্ষক বহুজাতিক এবং অতুলনীয় ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে বিশ্বের দরবারে নিজেদের হাজির করেছে।

২.৭ সারসংক্ষেপ

এই আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হল প্রবাসী চীনারা কিভাবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে অভিবাসন করেছিল, তার বিস্তৃত আলোচনা করা। এখানে মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরের উদাহরণ দিয়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে। মালয়েশিয়াতে চীনা জনগোষ্ঠীর কিভাবে অভিবাসন হয় এবং তারা কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয় তার আলোচনা করা হয়েছে। চীনাদের আগমনের ফলে মালয়েশিয়ার ভূমিপুত্রদের মধ্যে তুমুল প্রতিক্রিয়া হয় এবং তার ফলে দেখা দেয় ভয়ানক জাতিগত দাঙ্গা। এর সামাল দিতে মালয়ী গোষ্ঠীর অনুকূলে মালয়েশিয়ার সরকার তৈরী করনে নতুন অর্থনৈতিক নীতি যার ফলে ভূমিপুত্রদের অবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়। নতুন অর্থনীতির পরে প্রবর্তিত হয় ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট পলিসি। সেটির দ্বারাও ভূমিপুত্রদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করা হয়। এই এককে চীনাদের সিঙ্গাপুরে অভিবাসন-এর ইতিবৃত্ত ও আলোচনা করা হয় এবং ধীরে ধীরে দেশান্তরী চীনারা তাদের সমস্যাগুলি থেকে কিভাবে বেরিয়ে এসে নিজেদের প্রধান শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে তাই আলোচনা করা হয়েছে।

২.৮ নমুনা প্রশ্ন

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

১। মালয়েশিয়ার নতুন অর্থনৈতিক নীতির (নিউ ইকোনমিক পলিসি) বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করুন।

২। সিঙ্গাপুরের চীনাদের উপর টীকা লিখুন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী

১। মালয়েশিয়াতে চীনা জনগোষ্ঠীর অভিবাসনের কারণগুলি লিখুন।

২। মালয়েশিয়াতে জাতিগত বিরোধের বিষয় সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১। মালয়েশিয়ার চীনা এবং ভূমিপুত্রদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

২। নিউ ইকোনমিক পলিসির পর মালয়েশিয়ার পরিস্থিতি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২.৯ নির্বাচিত গ্রন্থ

1. Victor Purcell, *The Chinese in Malaya*, Oxford University Press, London, 1967.
2. T. H. Silcock, *The Economy of Malaya*, Malaya Publishing House Limited, Singapore, 1954.
3. David Brown, *The state and ethnic politics in Southeast Asia*, Routledge, London, 1994.
4. Kalyani Bandopadhyay, *Political Economy of Non- Alignment: Indonesia and Malaysia*, South Asian Publishers, New Delhi, 1970.
5. K. S. Sandhu and A. Mani (eds.), *Indian Communities in Southeast Asia*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 1993.
6. Tridib Chakraborti, "Democracy and Development in Malaysia : A Case-Study of Malaysian Indiana," In Anjali Ghosh et el (eds.), *Nationalism Democracy Development : Threats & Challenges in the Global Future*, ASIHSS programme, Department of International Relations, Jadavpur University, Kolkata, 2007.
7. Tridib Chakraborti, "Minority underclassed : Negating a Sociological Truism in Malaysia", in Lipi Ghosh and Ramkrishna Chatterjee (eds.), *Indian Diaspare in Asian and Pacific region : Culture, People Interaction*, Rawat Publications, Jaipur and New Delhi, 2004.

একক—৩ ❑ থাইল্যাণ্ড ও মায়ানমারের সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রনীতি

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ ভূমিকা

৩.৩ থাইল্যাণ্ড ও মায়ানমারের সমাজব্যবস্থা, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রনীতি

৩.৩.১ থাইল্যাণ্ডের রাজনৈতিক চিত্র

৩.৩.২ থাইল্যাণ্ডের সমাজ ও সংস্কৃতি

৩.৩.৩ মায়ানমারের সমাজ ও সংস্কৃতি

৩.৩.৪ মায়ানমারের রাজনীতি

৩.৪ সারসংক্ষেপ

৩.৫ নমুনা প্রশ্ন

৩.৬ নির্বাচিত গ্রন্থ

৩.১ উদ্দেশ্য

- এই এককে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দুটি দেশ, যথাক্রমে, থাইল্যাণ্ড ও মায়ানমার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর সেই আলোচনার উদ্দেশ্য হল ঃ
- এই দুটি দেশের প্রচলিত সমাজব্যবস্থার কাঠামো এবং সাংস্কৃতিক নিয়ম শৃঙ্খলা ও তাদের প্রভাব সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের একটি প্রাথমিক ধারণা দেওয়া।
- এই দুটি দেশের রাজনৈতিক বিবর্তনের একটি ইতিহাস সংক্ষেপে উপস্থাপন করা।

৩.২ ভূমিকা

থাইল্যাণ্ড ও হাজার হাসির দেশ (The Land of a Thousand Smiles) সরকারি ভাবে পরিচিত থাইল্যাণ্ড সাম্রাজ্য (The kingdom of Thailand) বা মুয়াং থাই (Muang Thai) বা প্রথেট থাই (Prathet Thai) নামে। থাইল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাঙ্কক আর এখানকার মুদ্রার নাম বাট (Baht)। দেশটির আয়তন ৫১৩১১৫ বর্গ কিলোমিটার এবং এর জনসংখ্যা ৬৭০৭০০০ থেকে কিছু বেশী থাইল্যাণ্ডে যে ভাষাগুলির প্রচলন আছে সেগুলি হল থাই, লাও, চাইনীজ, ইংলিশ এবং মালয়। এখানে প্রধানত তিনটি

ধর্মের প্রচলন আছে যেগুলি হল থেরাভাডা বৌদ্ধধর্ম, ইসলাম ধর্ম ও খ্রীশ্চান ধর্ম। এখানকার সমাজে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মানুষ অর্থাৎ পায় পঁচানব্বই শতাংশ (৯৫%) মানুষ থেরাভাডা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী আর চার শতাংশ (৪%) মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী।

থাইল্যাণ্ড আগে পরিচিত ছিল সিয়াম (Siam) নামে আর বিশ্বাস করা হয় এই সিয়াম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ইংরেজীর 1238 খ্রীষ্টাব্দে। প্রথমে এখানে প্রতিষ্ঠা হয় সুখেটাই (Sukhotai) যুগের এবং তারপর প্রতিষ্ঠিত হয় আয়ুথায়া (Ayutthaya) যুগ এবং অবশেষে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র (Absolute Monarchy) ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে। এরপর ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে পিপল্‌স পার্টি (people's party) এই নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের অবসান ঘটায় এবং দেশে প্রবর্তিত হয় সংবিধানিক রাজতন্ত্র।

মায়ানমার, সরকারিভাবে মায়ানমার যুক্তরাষ্ট্র আগে পরিচিত ছিল বার্মা নামে। এটি পরিচিত "দূর প্রাচ্যের অন্ন ভাণ্ডার" নামে। দেশটির আয়তন ৭৬,৫৫৩ বর্গ কিলোমিটারের কিছু বেশী এবং এদেশের মুদ্রার নাম 'কিয়াট' (Kyat)। ২০১৪ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে পাওয়া তথ্যানুসারে এদেশের জনসংখ্যা ৫, ৪১,৬৪,২৬২ থেকে কিছু বেশী।

৩.৩ থাইল্যান্ড ও মায়ানমারের সমাজব্যবস্থা, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রনীতি

৩.৩.১ থাইল্যাণ্ডের রাজনৈতিক চিত্র

উনিশশো তিরিশ এবং চল্লিশের দশক ছিল এক অনিশ্চয়তার অধ্যায় যেসময় রাজতন্ত্রকামী জাতীয়তাবাদী এবং বামপন্থী দলগুলি পরস্পরের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সিয়াম সাম্রাজ্যের (The Kingdom of Siam) নতুন নাম দেওয়া হয় থাইল্যাণ্ড সাম্রাজ্য (The Kingdom of Siam Thailand)। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সারিট (Sarit) অভ্যুত্থান এর সঙ্গে সঙ্গেই এ দেশে কায়েম হয় সামরিক একনায়কতন্ত্র (military dictatorship)। যাইহোক, তাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও একনায়কতান্ত্রিক শাসনের জন্য ক্রমেই এই সামরিক সরকার জনগণের মধ্যে তাদের জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে এবং ক্রমাগত তাদের উপর চাপ বাড়তে থাকে। সামরিক শাসনের প্রতি ক্রম বর্ধমান অসন্তোষ অবশেষে রূপ নেয় ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের গণ অভ্যুত্থানের, যার মূল কারিগর ছিল কমিউনিষ্ট দল। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে আবার একটি রক্তক্ষয়ী সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে এবং সেনাবাহিনী আবার সরকারের দখল নেয়। উনিশশো আশির দশকের মধ্য ভাগে এই রাষ্ট্রটি তার গণতান্ত্রিকিকরণের প্রয়াসকে শক্তিশালী করছিল এবং পরিণতিতে ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এক গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু হঠাৎ ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত চাটচাই (Chatchai) সরকারের পতন ঘটিয়ে সামরিক শাসক (military junta) ক্ষমতার দখল নেয়।

মিলিটারি শাসনের বিরুদ্ধে জনমত সোচ্চার হওয়ার মধ্যেই ১৯৯৭ সালের ১১ই অক্টোবর, থাইল্যাণ্ডের জনগণের সংবিধান (People's Constitution of Thailand) কার্যকরী হয়। আবারও নতুন করে শুরু হয় গণতান্ত্রিকিকরণের প্রয়াস এবং ২০০১ খ্রীষ্টাব্দে থাকসিন সিনাওয়াত্রার থাই রাক থাই দল সাধারণ নির্বাচনে বিজয়লাভ করে। ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় থাকসিনের দল বিপুল ভাবে দ্বিতীয়বার নির্বাচনে জয়ী হয়। কিন্তু দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর বিশেষত ২০০৩ সালের রাটচাডা জমিজমা সংক্রান্ত চুক্তি/বিল ব্যবস্থা (Ratchada real estate deal) র কথা জনসমক্ষে আসার পর, থাকসিন সরকারের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণ ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রবল ভাবে উঠতে থাকে। ২০০৬ সালের গোড়ার দিকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য জনগণের আঁতাত (People's Alliance) শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। ২০০৬ সালে ১৯শে সেপ্টেম্বর আবার একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে যেটি থাকসিন সরকারের পতন ঘটায়, থাইল্যাণ্ডের জনগণের সংবিধানকে বাতিল ঘোষণা করে, থাকসিনের টি. আর. টি. দলকে বেআইনী ঘোষণা করে এবং টি. আর. টি. দলের কার্যনির্বাহকদের পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার হরণ করে। ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দে সামরিক শাসক একটি নতুন সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করে। ২০০৮ সালের ২১শে অক্টোবর দেশের সর্বোচ্চ আদালত থাকসিনকে ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য, বিশেষ করে জমি-জমা সংক্রান্ত চুক্তির জন্য, ২ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। এই বছরেরই ১৫ই ডিসেম্বর, "গণতান্ত্রিক দলের" অভিসিত ভেজ্জাজিভো থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন এবং থাকসিন দেশ থেকে পলায়ন করেন। ২০০৯ সালের ১১ই এপ্রিল, কিছু থাকসিন অনুগামী বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী যাঁরা নিজেদের লাল জামা (Red Shirts) প্রদর্শনকারী হিসেবে দাবী করেন, তাঁরা পাঠায়তে অনুষ্ঠিত ASEAN কনফারেন্সে গণ্ডগোল শুরু করেন যার ফলে অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিতে হয় এবং প্রধানমন্ত্রী অভিসিতকে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে আগত প্রতিনিধিদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের সুব্যবস্থা করতে হয়। এসবের মধ্যেই আবার ২০১১ সালে থাইল্যাণ্ড কাম্বোডিয়ার সঙ্গে একটি সীমান্ত নিয়ে বিরোধ জড়িয়ে পড়ে, কারণ এই দুই দেশই তাদের সীমান্তে অবস্থিত Preah Vihear Promontory র উপর তাদের নিজের নিজের সার্বভৌমত্ব দাবী করছিল।

দেশের দিকে তাকালে, থাইল্যাণ্ডের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের দিন ছিল ৩রা জুলাই, ২০১১ সাল। ইঙ্গলুক সিনাওয়াত্রা (ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রার বোন) দেশের প্রধানমন্ত্রী হন। ২০১৩ সালের শেষে দিকে আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International court of justice) মতপ্রকাশ করে যে ১৯৬২ সালে একটি রায়ের মাধ্যমে কাম্বেডিয়াকে Preah Vihear Promontoryর ওপর সার্বভৌমত্ব দান করে এবং সেই অনুসারে থাইল্যাণ্ডকে তার সীমান্ত থেকে সৈন্য অপসারণ করে নিতে বলে। আন্তর্জাতিক ন্যায়ালয়ের এই ঘোষণার পরেই থাইল্যাণ্ডের সীমান্ত সমস্যার সমাধান হয়। ২০১৩ সালের শেষের দিকে ইঙ্গলুক সরকারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড জাতীয় চাপ আসতে থাকে। এরফলে আবারও একবার রাজ্যে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের সূত্রপাত ঘটে এবং ইঙ্গলুক সরকারের বিরুদ্ধে জনগণ বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করেন।

বিরোধীপক্ষ সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন। ইঙ্গলুক সিনাওয়াত্রা সংসদের নিম্ন কক্ষ ভেঙ্গে দেন এবং ২০১৩ সালের ২৫শে নভেম্বর একটি জরুরী সুরক্ষা আইন (Emergency Security Law) লাগু করেন যাতে দেশের মধ্যে আরও বেশী শত্রুতার পরিমণ্ডল তৈরী না হয়। ২০১৪ সালের ২৫শে আগষ্ট থাইল্যাণ্ডের Junta নেতা জেনারেল প্রায়ুথ চান ওচা (Gen. Prayuth Chan Ocha) দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিমণ্ডল এখনও শান্ত হয়নি।

৩.৩.২ থাইল্যাণ্ডের সমাজ ও সংস্কৃতি

থাই সমাজ ও সংস্কৃতি চীনা ও ভারতীয় সংস্কৃতি দ্বারা প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হয়েছে। থাই সমাজের ওপর সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাব আছে থেরাভাডা বৌদ্ধধর্মের। মার্গীয় (classical) থাই চিত্রকলা সবসময়ই ভীষণ ভাবে প্রভাবিত হয়েছে বিভিন্ন বৌদ্ধ মন্দিরগুলিতে দেখতে পাওয়া মুরাল (Mural) চিত্রকলা দ্বারা। এই চিত্রগুলির বেশীরভাগের মধ্যেই গৌতম বুদ্ধের জীবনের নানা ঘটনা চিত্রিত আছে। থাই স্থাপত্যের কেন্দ্রে আছে স্মৃতিস্তম্ভ, প্যাগোডা ও মন্দির আর এগুলি তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে কাঠ, স্ট্যাকো (এক ধরনের প্লাস্টার), গালা ইত্যাদি জিনিষ। এছাড়া চীনা পোর্সেলেনও থাই স্থাপত্যে এক অতি ব্যবহৃত সামগ্রী এরই পাশাপাশি আমরা লক্ষ্য করি থাই সাহিত্যের ওপর ভারতীয় প্রভাব যখন আমরা দেখি থাই মহাকাব্য "রামকিয়ান" ভারতীয় মহাকাব্য রামায়নের ছাঁচে লেখা। এই দুই সাহিত্য কীর্তির মধ্যে আমরা একই ধরনের চরিত্র যেমন, হনুমানের দেখা পাই। একে অন্যকে অভিবাদন জানানোর জন্য ভারতীয়রা যেমন "নমস্তে" বলেন, প্রায় একইরকম ভাবে থাইরা বলেন "ওয়াই" (Wai)। একই রকম ভাবে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য তাঁরা প্রার্থনার ভঙ্গীতে হাত দুটিকে একসঙ্গে জড় করেন। তাদের সমাজ ব্যবস্থা আবশ্যিক ভাবে ক্রমোচ্চস্তর বিন্যাসে বিভক্ত এবং তাদেরকে উচ্চস্তরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে শেখানো হয়। সেকারণে থাইল্যাণ্ডের রাজপরিবার থাই সমাজের সমস্ত লোকের শ্রদ্ধাভাজন। থাই সমাজে ওয়াট্ (Wat) খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বৌদ্ধ মন্দির ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আবাসস্থল মিলিয়ে যে জায়গা তাকে ওয়াট্ বলে এবং এখানেই চিরাচরিত ভাবে বিদ্যার্জন, ধর্মীয় কাজকর্ম, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। থাই ভাষার নাম 'ফাসা থাই' (Phasa Tai)। এগুলি প্রধানতঃ একমাত্রিক শব্দ এবং এর বর্ণগুলি তৈরী করেছিলেন মহামতি রাজা রামখামহায়েং ১২৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। বলা হয় যে এই বর্ণমালার ওপর সংস্কৃত এবং পালির প্রভাব স্পষ্টতই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু চীনা ভাষার মত থাই শব্দগুলিরও আলাদা আলাদা উচ্চারণ হয়। উচ্চারণের বিভিন্নতার কারণে একই শব্দ আলাদা আলাদা জিনিষ বোঝায়। থাইল্যাণ্ডের সমাজ একেবারেই সমজাতীয় নয়।

যেহেতু থাইল্যাণ্ডের উত্তর সীমান্তে মায়ানমার (পূর্ববর্তী বার্মা) এবং লাওস অবস্থিত, তাই উত্তর থাইল্যাণ্ডের সমাজ ও সংস্কৃতি বার্মা দেশের সংস্কৃতির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। থাইল্যাণ্ডের পশ্চিমাঞ্চল বিশাল পর্বতশ্রেণী দ্বারা ঘেরা থাকায় এখনকার সমাজব্যবস্থা দেশের অন্যান্য অংশের সমাজ ব্যবস্থার চেয়ে

একেবারেই আলাদা। আর থাইল্যাণ্ডের মধ্যবর্তী অঞ্চলে থাই জাতির মানুষেরা খুব ঘনভাবে বসবাস করেন যার ফলে জনবসতির ঘনত্ব দেশের অন্যান্য সব অঞ্চলের চেয়ে এখানে সবচেয়ে বেশী এবং দেশের রাজধানী ব্যাঙ্কক এই মধ্যাঞ্চলেই অবস্থিত। এটা সত্য যে থাইল্যাণ্ডের মধ্যে উত্তর পূর্বাঞ্চল অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিক থেকে অনেকটা পিছিয়ে। এখানে বসবাসকারী মানুষের মাথাপিছু রোজগার দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের মাথাপিছু রোজগারের থেকে তুলনামূলক ভাবে কম। থাইল্যাণ্ডের মোট জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ থাই জাতির মানুষ বাকি এক তৃতীয়াংশের মধ্যে আছে চীনা, ভিয়েতনামী, খেমার, হমং (Hmong) এবং অন্যান্য মানুষ। দেশের দক্ষিণাংশে ইসলামের প্রভাব বেশ স্পষ্ট। অতএব এটা বলা যায় যে, থাই সংস্কৃতির সামগ্রিক ঐক্যের মধ্যেও ভৌগোলিক কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন জন জাতির অবস্থানের ফল স্বরূপ কিছু কিছু পার্থক্য আছে এবং বিশেষ কোন একটি সংস্কৃতিকে গোটা দেশের আদর্শ হিসেবে তুলে ধরা যায় না।

মায়ানমার

মায়ানমার জনসংখ্যা সারা পৃথিবীর জনসংখ্যার ০.৭৪ শতাংশ। এখানকার জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৮০ জন এবং জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশ লোক শহরাঞ্চলে বাস করেন। এখানে ব্যবহৃত ভাষাগুলি হল বার্মিজ, কারণ ও শান। এখানকার প্রায় ৮৯ শতাংশ মানুষ থেরাভাডা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪ শতাংশ মানুষ খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী যাঁরা মুখ্যত ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টান। জনসংখ্যার ৪ শতাংশ মুসলমান এবং ২ শতাংশ হিন্দু। জনসংখ্যার ১ শতাংশ প্রকৃতির পূজারী পার্বত্য উপজাতিরাই প্রধানত এই প্রকৃতির পূজারী মায়ানমারে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর আনুপাতিক হার নীচে দেওয়া হল।

ক্রমিক সংখ্যা	গোষ্ঠীর নাম	মোট জংসংখ্যার কত শতাংশ
১	বামার	৬৮.০০
২	শান	৯.০০
৩	কায়িন	৭.০০
৪	রাখিন	৩.৫০
৫	চাইনীজ	২.৫০০
৬	মঙ্	২.০০
৭	কাচিন	১,৫০
৮	ইণ্ডিয়ানস্	১.২৫
৯	কায়াহ্	০.৭৫
১০	অন্যান্য গোষ্ঠী	৪.৫০

সূত্র ঃ মর্টেন বি পেডারসন, এমিলি রুডল্যান্ড এবং রোনাল্ড জেমস্ মে (এডি), বার্মা মায়ানমার স্ট্রং রেডিম উইক স্টেট? ক্রফোর্ড হাউস, বিলেয়ার, ২০০০।

৩.৩.৩ মায়ানমারের সমাজ ও সংস্কৃতি

মায়ানমারে একশো পঁয়ত্রিশটির ও বেশী আলাদা আলাদা জাতি গোষ্ঠীর মানুষ বাস করেন এবং সেই প্রত্যেক গোষ্ঠীরই ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ভাষা আছে। এদের মধ্যে প্রধান বর্মন (বামার) জাতিগোষ্ঠী দেশের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ যার অন্তর্ভুক্ত এবং এই গোষ্ঠীই দেশের সৈন্যবাহিনী ও সরকার পরিচালনা করে। সংখ্যালঘু এক তৃতীয়াংশ মানুষের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী প্রধানত সম্পন্ন সীমান্তবর্তী এলাকা এবং বার্মার পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করে। অবশ্য এর মধ্যে অনেক গোষ্ঠীর মানুষকেই সৈন্যবাহিনীর মদতপুষ্ট সরকার জোর করে তাঁদের মাতৃভূমি থেকে উৎখাত করে সেসব জায়গা দখল করে নিয়েছে উন্নয়নের কাজ এবং সম্পদ আহরণের জন্য। এর ফলে এইসব সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর হাজার হাজার মানুষ দেশের মধ্যেই আভ্যন্তরীণ ভাবে বাস্তুহারা হয়ে পড়েছে অথবা পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে উদ্বাস্তু হিসেবে স্থান পেয়েছে। মায়ানমারের সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বৃহত্তম সাতটি হল চিন, কাচিন, কারেনি (কখনও কখনও কায়াহ্ বলা হয়), কারণ (কখনও কখনও কায়িন নামে পরিচিত), মং রাখিন এবং শান। মায়ানরারে এই সাতটি জাতি গোষ্ঠীর নাম অনুসারে সাতটি প্রদেশ আছে এবং সাতটি অঞ্চল (আগে যেগুলিকে বিভাগ বলা হত) আছে যেগুলিতে প্রধানত বামার (বর্মন)রা বসবাস করেন। মায়ানমার সরকার রোহিঙ্গ জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের বার্মার জাতীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকৃতি দেন না বলে এই বার্মার অন্যান্য মানুষেরা এই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মানবাধিকার আইন ভঙ্গের বহু কাজ করে থাকেন এবং এই রোহিঙ্গ সম্প্রদায় ভয়ঙ্কর জাতিবিদ্বেষের শিকার হন। হিসাব করে দেখা গেছে যে মায়ানমারে প্রায় দুলক্ষ রোহিঙ্গ সম্প্রদায়ের মানুষ আছেন যাঁরা প্রধানত রাখিন প্রদেশে বাস করেন এবং এঁদের বেশীরভাগ লোকই পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে, বিশেষত বাংলাদেশে উদ্বাস্তু হিসাবে বসবাস করেন।

প্রথম সহস্রাব্দে বার্মাতে প্রতিষ্ঠিত মং রাজত্বে এবং প্যু রাজত্বের সময় কালে সেদেশে বৌদ্ধধর্মকে জনপ্রিয় করে তোলা হয়। কিন্তু বার্মার আদি বসবাসকারী জনগণ প্রধানত প্রকৃতির পূজারী ছিলেন। ঔপনিবেশিক শাসনকালে এদেশে বিশেষ করে রেঙ্গুন (বর্তমান ইয়াঙ্গন) অঞ্চলে হিন্দু এবং মুসলমান জনসংখ্যার প্রচুর অনুপ্রবেশ ঘটে। খ্রীষ্টধর্মে প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল এখনকার আদি অ-বৌদ্ধধর্মাবলম্বী জন-জাতি, যেমন কারেন, কাচিন এবং চিন সম্প্রদায়ের মধ্যে। এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বাধাদান করে এসেছে এবং কারেনরা প্রকৃতপক্ষে সরকারের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধে

নিজেদের সামিল করে ফেলে। যাইহোক, ২০০৪ সালের জানুয়ারী মাসে কারন জাতীয় ইউনিয়ন সামরিক সরকারের সঙ্গে তাদের বিরোধ মিটিয়ে নিতে স্বীকৃত হয়, একটি ঘটনা যা মায়ানমারের সমাজে বিগত কয়েক বছরে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে সেটি হল রাখিন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে রোহিঙ্গা মুসলমানদের বিরোধ। বাংলাদেশ সমীপবর্তী রাখিন অঞ্চল মুসলমান প্রধান এবং এই দুই গোষ্ঠীর মানুষ সেখানে এমনভাবে যুদ্ধ-মারামারিতে জড়িয়ে পড়েছে যার ফলে আন্তর্জাতিক দুনিয়ার নজর পড়েছে তাদের ওপর।

হিন্দুধর্মে প্রচলিত "কর্ম" ফলে বিশ্বাসের অনুরূপ মায়ানমারে hpon এর উপর বিশ্বাস করা হয়, অর্থাৎ মনে করা হয় মানুষের অতীতের করা কাজই তার বর্তমান জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। মায়ানমারের সমাজ জীবন সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হয়েছে বৌদ্ধ সংস্কৃতি, আচার অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসের দ্বারা। সাধারণ মায়ানমার বাসীর দৈনন্দিন জীবনে ভারতবর্ষ এবং চীনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উল্লেখযোগ্য প্রভাব আছে। পরম্পরা মেনে চলা বার্মিজ লোকেদের অভিবাদনের নাম মিঙ্গালাবা (Mingalaba) আর তাদের সবচেয়ে বড় উৎসবের নাম থিঙ্গিয়ান জল উৎসব (Thingyan water Festival) যেটি প্রতি বৎসর এপ্রিল মাস নাগাদ অনুষ্ঠিত হয়। জল সকল রকমের পাপ ধুয়ে দেয় এই বিশ্বাসের জন্যই এই জল উৎসব পালন করা হয়। এছাড়াও কচিন মানাও (Kachin Manaw), আনন্দ প্যাগোডা (Ananda Pagoda), টামেন (Tamane), কাক্কু প্যাগোডা (Kaku Pagoda) হস্তী নৃত্য (Elephant Dance) এবং গরম হওয়ার বেলুন (Hot Air ballon) ইত্যাদি উৎসবগুলি মহা আড়ম্বরে পালিত হয়। মায়ানমারের মানুষেরা ভারতীয়দের মতো দিওয়ালি উৎসব পালন করে। ভারতীয় ও চীন খাবার মায়ানমারে যথেষ্ট লোকপ্রিয়। মায়ানমারে উৎপাদিত দৈনন্দিন ব্যবহারের দেশীয় পণ্যগুলিকে চীন পণ্য যথেষ্ট প্রতিযোগিতার সামনে ফেলে দিয়েছে। স্থানীয় লোকদের মধ্যে চীনা ও ভারতীয় ভাষা শেখার জন্য ক্রমবর্ধমান উৎসাহ দেখা যাচ্ছে।

৩.৩.৪ মায়ানমারের রাজনীতি

রাজা অনাওরাহটা (Anawrahata) ১০৫৭ সালে পাগান ও প্রথম সংযুক্ত বার্মা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি নিজে থেরাভাজা বৌদ্ধথর্ম গ্রহণ করেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বার্মাতে একে একে মঙ্গল (Mongal) সাম্রাজ্য, টুঙ্গু (Toungoo) সাম্রাজ্য এবং কংবাউং (Konbaung) সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশরা বার্মা সাম্রাজ্যকে জয় করতে শুরু করে এবং প্রথম ইঙ্গ-বার্মিজ যুদ্ধের সূচনা হয়। যুদ্ধ শেষে ইয়ানডাবো (Yandabo) চুক্তি ঘোষিত হয় যার ফলে আরকান উপকূলবর্তী ভূমিখণ্ড ব্রিটিশদের দখলে চলে যায়। ১৮৫২ সালে দ্বিতীয় ইঙ্গ-বার্মিজ যুদ্ধের পরিণতিতে বার্মার নিম্নাঞ্চল ব্রিটিশদের

অধিকার ভুক্ত হয়। ব্রিটিশদের বার্মা বিজয় সম্পূর্ণ হয় ১৮৮৬ সালে যখন তারা মাণ্ডালয় দখল করে এবং বার্মাকে ব্রিটিশ-ভারতের একটি অংশ ছিল, কিন্তু এরপরই ব্রিটিশরা বার্মাকে ভারতের থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বতন্ত্র উপনিবেশ হিসাবে গণ্য করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৪২ সালে জাপান (যারা ব্রিটিশ বিরোধী গোষ্ঠীতে ছিল) এই ব্রিটিশ উপনিবেশটিকে আক্রমণ করে ও সেটি অধিকার করে।

যাইহোক, ১৯৪৫ সালে ব্রিটিশরা বার্মাকে জাপানের অধিকারমুক্ত করতে সক্ষম হয়। এই জাপানের অধিকারমুক্ত করার সময় ব্রিটিশরা স্থানীয় পর্য্যায়ে আঙ্ সান (Aung San), যিনি এ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট পিপলস্ ফ্রিডম লিজ (AFPFL) এর নেতা ছিলেন তাঁর কাছে থেকে প্রভুত সাহায্য পায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯৪৭ সালে আঙ্ সান তাঁর অর্ন্তবর্তী সরকারের ছয়জন সদস্যসহ উ স (U Saw)র দ্বারা নিহত হন। জাতীয়স্তরে উ স ছিলেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী পরবর্তীকালে উ নু (U Nu) কে, যিনি অন্তবর্তী সরকারের বিদেশ মন্ত্রী ছিলেন, AFPFL এবং সরকারের নেতৃত্ব দিতে বলা হয়। ১৯৪৮ সালে ৪ঠা জানুয়ারী বার্মা স্বাধীনতা অর্জন করে এবং ইউ নু দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৫০ এর দশকের শেষের দিকে শাসনকল AFPFL এর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং সামরিক প্রধান নে উইন (Ne Win) এর নেতৃত্বাধীন তদারকি (caretaker) সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৬০ সালের সাধারণ নির্বাচনে উ নু-র দল দারুণ ভাবে জিতে ক্ষমতায় আসে কিন্তু নে উইন ১৯৬২ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে উনু-র দলকে ক্ষমতাচ্যুত করে।

১৯৬২ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ ৪৯ সাল ধরে বার্মা সামরিক শাসনের অধীনে ছিল, ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে নে উইন সরকারের উপর তাঁর প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছিলেন, এমনকি পদত্যাগের পরেও তিনি সরকারের ওপর তাঁর অনেকখানি প্রভাব জিইয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর সময় কালে নে উইন বার্মার পথে সমাজতন্ত্র (Burmese Way Tosocialism) চালু করেন যার দ্বারা তিনি দেশের অর্থনীতির জাতীয়করণ করেন এবং একটি মাত্র দল দ্বারা দেশ যাতে পরিচালিত হতে পারে সেই জন্যে সোস্যালিষ্ট প্রোগ্রাম পার্টি নামে একটি দল সৃষ্টি করেন যেটি সেদেশের একমাত্র রাজনৈতিক দল। এর মাঝে ১৯৭৪ সালে তিনি একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করেন অন্যান্য সামরিক নেতাদের সঙ্গে নিয়ে এবং চূড়ান্ত ক্ষমতা সম্পন্ন একটি জনগণের এসেমব্লি গঠন করেন। ১৯৮১ সালে নে উইন পদত্যাগ করেন এবং সান য়ু (San Yu), অপরএকজন অবসর প্রাপ্ত সেনা প্রধান প্রেসিডেন্ট হন। শাসন ক্ষমতায় থাকা সোস্যালিষ্ট প্রোগ্রাম পার্টির চেয়ারম্যান হিসাবে নে উইন ক্ষমতার উপর নিজের প্রভুত কর্তৃত্ব বজায় রাখেন। ১৯৮৮ সাল থেকে সরকারের বিরুদ্ধে ধিকিধিকে জ্বলতে থাকা নানা অসন্তোষ বিক্ষোভ প্রদর্শন ও বড় বড় বিদ্রোহের আকারে আত্মপ্রকাশ করে এবং তৎকালীন সামরিক শাসনের রাজনৈতিক বৈধতা প্রশ্ন তুলে দেয়। আইন শৃঙ্খলজনিত সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য

শাসন সামরিক জুন্টা স্টেট ল এ্যান্ড অর্ডার রেস্ট্রোরেশন কাউনসিল (SLORC) গঠন করে যারা বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের ধর-পাকর করে দীর্ঘদিনের জন্য তাদের রাজনৈতিক বন্দী হিসারে রেখে দেয়। এমনকি প্রধান বিরোধী দল ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমেক্রেসী (NLD)-র নেত্রী আঙ সান উউ কি (Aung San Suu Kyi) কে গৃহবন্দী করে রাখে। এই সু কি নিহত জাতীয়তাবাদী নেতা আঙ সান এর কন্যা।

১৯৯০ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে NLD দল বিপুল ভাবে জয়লাভ করে, কিন্তু সরকার জনগণের এই রায়কে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে সামরিক শাসন চালিয়ে যেতে থাকে। ১৯৯২ সালে খান শওয়ে (Than Shwe) SLORC-র চেয়ারম্যান হন। ১৯৯৭ সালে বার্মাকে ASEAN-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং SLORC-র নতুন নামকরণ করা হয় স্টেট পীস এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল (SPDC)। দেশের গণতান্ত্রিকীকরণের প্রয়াস শুরু হয় ২০০৩ সালের আগস্ট মাসে, যখন খিন ন্যুন্ট (Khin Nyunt) দেশের প্রধানমন্ত্রী হন এবং তিনি একটি নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্য ২০০৪ সালে একটি মহাসভা ডাকার প্রস্তাব দেন। যাইহোক সামরিক জুন্টার এই দীর্ঘকালীন শাসনের বিরুদ্ধে আর্ন্তজাতিক স্তরে বিশেষত, পশ্চিমী দেশগুলির তরফে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল যাতে গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়। ইতিমধ্যে, সরকার এবং কারেন, কাচিন ও শান বিদ্রোহী জাতিগোষ্ঠীর বিরোধ এমন পর্যায়ে চলে যায় যাতে বার্মার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধ বলবৎ থেকে যায়। দেশের গণতান্ত্রিকীকরণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা জন্য আন্তর্জাতিক চাপ দিনের পর দিন বাড়তেই থাকে, কারণ আঙ সান সু কি-কে মাঝে মাঝেই দীর্ঘদিনের জন্য গৃহবন্দী করে রাখা হচ্ছিল এবং অন্যান্য বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী ও এম এল ডি নেতাদের রাজনৈতিক বন্দী করে রাখা হচ্ছিল। সেইজন্য, যখন ২০০৪ সালের মে মাসে নতুন সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করার জন্য মহাসভা আরম্ভ হল, এন এল ডি সেটিতে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকল কারণ সেসময় আঙ সান সু কি-কে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছিল।

সামরিক জুন্টা শুধু যে জাতীয় স্তরেই অভিযুক্ত হয়েছে তা নয়, তারা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক স্তরে, যেমন আন্তর্জাতিক রেড ক্রশ সমিতির দ্বারাও অভিযুক্ত হয়েছে মায়ানমারের জনগণের অধিকার হরণের দায়ে। ইউনাইটেড নেশনস সিকিউরিটি কাউন্সিল এ ২০০৭ সালের জানুয়ারী মাসে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র একটি প্রস্তাব আনে যাতে বার্মাকে চাপ দেওয়া হয় বিরোধীপক্ষ ও তার নেতাদের দমন ও পীড়ন করা থেকে বিরত হতে। কিন্তু চীন ও রাশিয়া এই প্রস্তাবে ভোটো প্রয়োগ করায় প্রস্তাবটির পরিণতি দুর্ভাগ্যজনক হয়। ২০০৮ সালের মাঝামাঝি, সরকার প্রস্তাবিত নতুন সংবিধানটি প্রকাশ করে কিন্তু রিবোধীনেত্রী আঙ সান সু কির পদগ্রহণের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করে। আঙ সান সু কি গৃহবন্দী রয়ে যান, কিন্তু তিনি সামরিক নেতাদের সঙ্গে কথোপকথন শুরু করেন। ২০১০ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে সামরিক মদত পুষ্ট

প্রধান দল দি ইউনিয়ন সলিডিরাটি এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (USDP) বিপুল জয় দাবী করে, কিন্তু বিরোধীপক্ষ এই দাবী মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। ইতিমধ্যে নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আঙ সান সু কি কে গৃহবন্দী দশা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। ২০১১ সালে মার্চ মাসে থেইন শেইন (Thein Sein) দেশের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি চেষ্টা করেন কিছু গণতান্ত্রিক সংস্কার সাধনের যথা, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান, ট্রেডইউনিয়ন করা ও শান্তপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শনের অনুমতি দেওয়া এন এল ডি-কে রাজনৈতিক দল হিসাবে পুনরায় নথিভুক্ত করা এবং তাদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার দেওয়া এবং প্রচার মধ্যম, বিশেষত সংবাদপত্রের ওপর থেকে সেন্সরশিপের অবসান ঘটানো। এইসব ব্যবস্থা যদিও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মায়ানমারের মুখ কিছুটা উজ্জ্বল করেছে পাশ্চাত্যের দেশগুলি, যেমন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু এই মায়ানমারের ওপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করে রেখেছে কারণ তারা এখনো বিশ্বাস করে যে মায়ানমার মানবধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা এখনো যথেষ্ট মাত্রায় বিদ্যমান। তবে বর্তমান মায়ানমার সরকার এখন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথকেই বেছে নিয়েছে।

৩.৪ সারসংক্ষেপ

উপরিউক্ত আলোচনায় আলোকপাত করা হল থাইল্যান্ডের (১৯৪৮-২০১৪) এবং মায়ানমারের (১০৫৭ বর্তমান যুগ) রাজনৈতিক চিত্র। তাদের ভৌগোলিক অবস্থান কাছাকাছি হলেও তাদের রাজনৈতিক পথ ভিন্ন। এই দুটি দেশের সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়েও বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে এই এককে। তাদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে ভৌগোলিক ভাবে তাদের কাছাকাছি অবস্থিত ভারত এবং চীন-এর প্রভাব নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা যেমন রয়েছে, তেমনি আছে হিন্দুধর্মের ও বৌদ্ধধর্মের থাই ও মায়ানমারের সামাজিক বিবর্তন ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার উপর প্রভাব নিয়ে আলোচনা।

৩.৫ নমুনা প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

১। থাইল্যাণ্ডের রাজনৈতিক চিত্রের আলোচনা করুন।

২। মায়ানমারের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশদ বর্ণনা দিন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী ঃ

১। থাই সমাজ ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

২। মায়ানমারের সামরিক জুন্টার শাসনের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ

১। টীকা লিখুন — থাই সংস্কৃতি

২। মায়ানমারের সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৩.৬ নির্বাচিত গ্রন্থ

1. Morten B.Pederson, Emily Rudland and Ronald James May (eds.), *Burma Myanmar: strong regime, weak state?*, Crawford House, Belair, 2000.
2. Juliane Schober, *Modern Buddhist Conjunctures in Myanmar: Cultural Narratives, Colonial Legacies and Civil Society*, University of Hawai'i Press, Honolulu, 2011.
3. David I. Steinberg, *Burma : The State of Myanmar*, George University Press, Washington, D.C, 2001
4. Wendell Blanchard, *Thailand, Its People, Its Society, Its Culture*, HRAF Press, Connecticut, 1966
5. Arne Kislenko, *Culture and Customs of Thailand*, Greenwood Publishing Group, California, 2004.
6. Pasuk Phongpaichit and Christopher John Baker, *Thailand: Economics and Politics*, OUP, London, 2002.

একক—৪ ❑ বিশ্বায়ন এবং ঠাণ্ডা যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংস্কৃতি

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ ভূমিকা

৪.৩ বিশ্বায়ন এবং ঠাণ্ডাযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংস্কৃতি

৪.৩.১ এশিয় মূল্যবোধ বিতর্ক

৪.৩.২ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামিক মৌলবাদের বিকাশ

৪.৩.৩ গণতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের মধ্যে সংগ্রাম

৪.৩.৪ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপর বিকল্প আলোচনা

৪.৪ সারসংক্ষেপ

৪.৫ নমুনা প্রশ্নাবলী

৪.৬ নির্বাচিত গ্রন্থ

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্যগুলি হল

- বিশ্বায়নের শুরুতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের উপর তার প্রভাব বিষয়ে শিক্ষার্থীর সম্যক ধারণা গঠনে সাহায্য করা।
- এশীয় মূল্যবোধ বিতর্ক বলতে কি বোঝায় তা অনুধাবনে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা।
- বিশ্বায়নের সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে যে প্রধান বাধাগুলি উপস্থিত হয়েছিল সে বিষয়ে জ্ঞানার্জনে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা।

৪.২ ভূমিকা ঃ

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বিশ্বায়ন বিশেষত ১৯৯০ এর দশকে, বৃহত্তর বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের বিচারে

সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল অপরিসীম তথ্যের প্রবাহ, জিনিষপত্র, সম্পদ, তথ্যপ্রযুক্তি, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের ধারণা আর ক্ষুদ্র বা স্থানীয় ক্ষেত্রের বিচারে এনেছিল গঠনতান্ত্রিক পরিবর্তন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির জন্য বিশ্বায়ন সঙ্গে করে আরও এনেছিল তুলনাহীন পারস্পরিক অর্থনৈতিক নির্ভরতা, দেশের সীমা অতিক্রম করে অন্যদেশে মূলধনের বিনিয়োগ, এবং অতি দ্রুত নিজেদের মধ্যে তথ্য প্রযুক্তিগত জ্ঞানের বিনিময়। তাছাড়াও, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতি ও দেশগুলির উপর একদিকে চাপ বাড়তে থাকে যাতে সেখানের আইনের শাসন, দায়বদ্ধতার ওপর জোর এবং স্বচ্ছতার মতো বিষয়গুলি পাশ্চাত্য ধাঁচে গঠন করা হয়, অন্য দিকে জাতি, ধর্ম এইসব নিয়ে অস্থিরতা, সংগঠিত অপরাধের জাল, ব্যাপকহারে দেশান্তর এবং স্থানচ্যুত ব্যক্তিদের সমস্যা ইত্যাদি নানান সমস্যা, যেগুলি আসলে আর্ন্তমহাদেশীয় সমস্যা, সেগুলি ক্রমাগত বাড়তে থাকে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বলা ভালো, আমাদের বিশ্লেষণের বিষয়বস্তু হ'বে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ঐতিহ্যবাহী সমাজব্যবস্থার ওপর বিশ্বায়নের ফলে কিভাবে পাশ্চাত্য প্রভাবিত আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি প্রভাব ফেলেছে তা খতিয়ে দেখা। বিশ্বায়ন ও তার সহযোগী বস্তুগুলির সাহায্যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে সর্বত্র প্রবেশ করানোর প্রচেষ্টা কিন্তু যথেষ্ট উদ্বেগ সৃষ্টি করে কারণ তার ফলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির জাতীয় স্বাতন্ত্র্য এবং পরম্পরাগত মূল্যবোধের অবক্ষয় শুরু হয়। দেখা গেল যে গ্রামীন মানুষেরা ক্রমশ তাঁদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে জাতীয় সংস্কৃতির ও রীতি রেওয়াজের দিকে বেশী করে ঝুঁকছেন যাতে শেষ পর্য্যন্ত বিশ্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিশে যাওয়া যায়।

৪.৩ বিশ্বায়ন এবং ঠাণ্ডাযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংস্কৃতি

৪.৩.১ এশিয় মূল্যবোধ বিতর্ক

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি আসলে আদৌ সমমনোভাবাপন্ন গোষ্ঠীভুক্ত নয়, আর বিশ্বায়নকে তাদের সমাজের, বিশেষত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের, কতখানি অভ্যন্তরে প্রবেশ করার সুযোগ দেওয়া হবে, এই প্রশ্নে এই দেশগুলির মধ্যে প্রচুর মত পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন, হলিউডের ছবি ও গান নিয়ে কিছু কিছু দেশ প্রচণ্ড স্পর্শকাতর, অন্যদেশগুলি ততটা নয়। চীনা ছবিকে থাইল্যান্ডে সাদর অর্ভ্যথনা জানানো হয়, কিন্তু মালয়েশিয়ায় নয়। অনুরূপভাবে, বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সিঙ্গাপুর ছাড়া সব দেশেই অনেক প্রয়াস করা হয়েছে যাতে বিবিধ নীতি নির্ধারণ ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজের দেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটানো যায়। এই দেশগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস চালানো হোয়েছে যাতে বৌদ্ধ, ইসলাম, কনফুসিয়ান, মূল্যবোধ, জাতীয় পতাকা, রাজতন্ত্র, সামরিক বাহিনী, সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শ, যোগ্যতার পুরস্কার ইত্যাদি জাতীয় চিহ্ন ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে শক্তিশালী করে তোলা যায়।

কেউ কেউ এই বলে তর্ক করেন যে বিশ্বায়নের সময়ে উদ্ভূত সামাজিক পরিবর্তনের অনিশ্চয়তা এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির পারস্পরিক ঘষাঘষির ফলে আসলে পরম্পরাগত মূল্যবোধ পুনরায় শক্তিশালী হোয়ে উঠেছে। যদিও শিক্ষা, গণতন্ত্র এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাহ্যিকভাবে পশ্চিমমুখীনতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু তার তীব্র সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে স্থানীয় মূল্যবোধকে নতুনভাবে আবিষ্কার করার সুযোগ ঘটে। বেশী জনপ্রিয় ও উদার মতটি হ'ল বিশ্বায়নের এই প্রক্রিয়াটিতে যত দ্রুততার সঙ্গে অভিজ্ঞতা ও আদব-কায়দার আদান-প্রদান বাড়তে থাকে, ততই সংস্কৃতিগত পার্থক্য কমতে থাকে এবং ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে পড়ে। এটা অনস্বীকার্য্য যে আধুনিকীকরণ, শিল্পায়ন, নগরায়ন, শিক্ষা-বিস্তার এবং গণতান্ত্রিককরণের এইটিই স্বাভাবিক পরিণতি। পূর্ব-এশিয়ার নেতৃগণ বিশ্বায়নের সুযোগ-সুবিধাগুলি কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার অনুগামীরা বিশ্ব-সংস্কৃতিকে বাধা দিতে চেয়েছিলেন। এখান থেকেই শুরু হয় এশীয় মূল্যবোধের উপর বিতর্ক। স্যামুয়েল পি. হানটিংটনের বই "দি ক্ল্যাশ অফ্ সিভিলাইজেসেন্স" উপর ভিত্তি করেই এই বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৯০ এর দশকের প্রথম দিকে অনেক এশীয় রাজনৈতিক নেতাদের, বিশেষত লী কুয়ান ইউ এবং মহাথীর মহম্মদের দ্বারা এই এশীয় মূল্যবোধের ধারণার বিকাশ ঘটে এবং এই দুজন যুক্তি দেখান যে যুদ্ধ পরবর্তী পর্যায়ে এশিয়ার উল্লেখযোগ্য উন্নতির মূলে রয়েছে এই এশীয় মূল্যবোধ। এই দুই নেতা মত প্রকাশ করেন যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এশীয় মূল্যেবোধ পুরুষতন্ত্রের ছাঁচে তৈরী কর্তৃত্বপূর্ণ বা স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের যেমন সহায়ক হয়েছিল, তেমনই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই মূল্যবোধ কর্মনীতি, সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি, শিক্ষা এবং আরও বেশ কিছু আচার-আচরণ যা অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য জরুরী, তার সহায়ক হয়েছিল। এশীয় মূল্যবোধ পাশ্চাত্য জীবনধারার বিরুদ্ধে যেন একটি রক্ষাকবচ। এই মূল্যবোধের পাঁচটি নীতি আছে, যথা, মানবতা, ন্যায়পরায়নতা, সামাজিক ও নৈতিক সততা, জ্ঞান ও বিশ্বস্ততা। এই মূল্যবোধের মধ্যে নিহিত আছে কর্ম, সুশিক্ষা, পরিবার-কেন্দ্রিকতা ও কৃতজ্ঞতাবোধ এবং এগুলিই ধারণ করে রাখে সংস্কৃতি, পরম্পরা, নীতিবোধ, ধর্ম ও চিন্তাধারাকে। এছাড়াও, "এশীয় মূল্যবোধ" বিশ্বাস করে কর্তব্যে, অধিকারে নয়। এই দুই নেতা একথা মনে করেন যে পাশ্চাত্যের ছাঁচটি সহজে রপ্তানীযোগ্য বস্তু নয়, তাছাড়া সেটি আবশ্যিকভাবে কাম্য তাও নয়। তাঁরা এটাও উল্লেখ করেন যে নেশার সামগ্রী, অপরাধীর দল, অস্ত্রশস্ত্র, নিয়মিত সংঘটিত হিংসাত্মক অপরাধ, অসুরক্ষিত পথঘাট, ক্রমবর্ধমান বিবাহ বিচ্ছেদের হার ইত্যাদি স্পষ্টতই পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে পারিবাবিক মূল্যবোধের দ্রুত অবক্ষয় ঘটিয়েছে। তবে কেউ কেউ "এশীয় মূল্যবোধ" কে সরকার, নাগরিক স্বাধিকার, অর্থনৈতিক সুব্যবস্থা, নাগরিক অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার একটি দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক বিকল্পস্বরূপ মনে করেন। ভাবনাটিকে এক কথায় বলতে গেলে বলা যায় যে সবকিছু করারই একটি

এশীয় পদ্ধতি আছে। সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায় যে "এশীয় মূল্যবোধ" পাশ্চাত্য মূল্যবোধের থেকে আলাদা এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে পশ্চিমের দেখানো পথই যে এক ও একমাত্র সঠিক পথ, একথা মানতে এশীয় মূল্যবোধ রাজী নয়।

পাশ্চাত্যের অনেকেই এটি মেনে নিতে প্রবলভাবে অনিচ্ছুক ছিলেন যে একগুচ্ছ পৃথক কিন্তু সমানভাবে যুক্তি গ্রাহ্য মূল্যবোধ বিদ্যমান আছে। চরমপন্থীরা তো উত্তম শাসনব্যবস্থা কাকে বলে অথবা মানবাধিকার রক্ষার সবচেয়ে ভালো উপায় কি হতে পারে এইসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ব্যতীত অন্য কোনো বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবতেই পারেন না। তাঁরা এই সমস্যাগুলিকে বিশ্বজননী সমস্যা হিসেবে গণ্য করেন; আর সেজন্যই তাঁদের যুক্তি হ'ল, এর সমাধানও হতে হবে অবশ্যই বিশ্বজনীন। তাঁরা পাশ্চাত্যের উদার গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার রক্ষার জন্য বাধ্যতামূলক আইন প্রণয়ন, এই দুটি বিষয়কে লক্ষ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে সারা পৃথিবীর সমস্ত দেশ, সমাজ, মানুষকে সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যাকুলভাবে আগ্রহী হতে উৎসাহ দান করতে চেয়েছেন। আর সেইজন্যই, এই দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই, এশীয় মূল্যবোধ ও পাশ্চাত্য মূল্যবোধের বিতর্ক সবচেয়ে তীব্র আকার ধারণ করেছে। এশীয় দেশগুলির অনেকের কাছেই পাশ্চাত্যের কর্মপ্রণালী ঔদ্ধত্যপূর্ণ, প্ররোচনামূলক এবং মূলত একটি ভিন্ন ধরণের ঔপ্যনিবেশিকতা। আর পাশ্চাত্যের অনেকেই এই ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন যে এশীয় মূল্যবোধ আসলে পীড়নমূলক সরকারের একটি আবরণ। দুপক্ষের জনগণের মধ্যে বা মাঝেমাঝে সরকারের তরফেও তিক্ত বাদানুবাদের ফলে বিষয়টি আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছে। এর ফলে, এই বিষয়ের সঙ্গে জড়িত দেশগুলির মধ্যে অনাকাঙ্খিত সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে। পরিণামে, দুই পক্ষের মধ্যে পরিলক্ষিত পার্থক্যগুলি দূর করার জন্য একসঙ্গে বসে কাজ করাও অসম্ভব হয়ে পড়েছে কারণ তারা উভয়েই বিশ্বাস করে যে অপর পক্ষের থেকে শিক্ষা নেওয়ার মতো কিছুই তাদের নেই। উদাহরণস্বরূপ মানবাধিকারের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করা যেতে পারে। মানবাধিকার বিশ্বজনীন, কিন্তু সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ একেক দেশে একেক রকম। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা অথবা মানুষের স্বাধীনতা রক্ষা করার মতো বিষয়ে কোনো একটি বিশেষ কর্মপদ্ধতিকে এক এবং একমাত্র পদ্ধতি হিসেবে ধরা যায় না। এই কথাটি শুনলে পাশ্চাত্য দেশগুলির অনেকেই খুব বিস্ময়বিষ্ট হবেন, কারণ, প্রমাণ ছাড়া তাঁরা এটাকেই সত্য বলে মেনে নিয়েছেন যে পাশ্চাত্য ধাঁচের গণতন্ত্রের প্রতিই সকলের ব্যাকুলভাবে আগ্রহী হওয়া উচিৎ এবং একমাত্র তার মাধ্যমেই রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতির পরিমাপ করা যায়। কিন্তু অন্যেরা জিনিষটিকে সেভাবে দেখতে চায় না। ঠিক যেমন পাশ্চাত্যের ভাষ্যকার ও রাজনীতিবিদরা এশিয়ার দেশগুলির ও অন্যান্য দেশগুলির মানবাধিকার সংক্রান্ত আইনের ফাঁকফোকর নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ

করেন, একইরকমভাবে এশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে সেই সন্দেহ আসতেই পারে যে সুশাসন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মতো বিষয়গুলি পাশ্চাত্যের মানুষের ক্ষেত্রে বাস্তবে প্রযোজ্য হয় না, কেবলমাত্র ধারণা বা মতবাদ হিসেবেই রয়ে যায়। এছাড়া আবার কিছু পাশ্চাত্য পণ্ডিত দাবী করেন যে ১৯৯৭ সালের 'অর্থনৈতিক সঙ্কট'-এর জন্য এশীয় মূল্যবোধ প্রধানত দায়ী। তাঁরা যুক্তি দেখান যে এশীয় মূল্যবোধ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিন্যাসের উপযুক্ত চরিত্র গঠনে ব্যর্থ হয়। তাঁরা এটাও বলেন যে এশীয় মূল্যবোধ স্বাধীন চিন্তাধারা ও সৃজনশীলতাকে প্রতিহত করে এবং স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থাকে, যেমন চীন, ভিয়েতনাম ও মায়ানমারের একনায়কতন্ত্রী সরকারকে লালন-পালন করে। এটা স্পষ্ট যে এশীয় মূল্যবোধের ওপর বিতর্কের জন্ম হয়েছে বিশ্বায়নের পটভূমিতে। যাইহোক, এশীয় মূল্যবোধ, তার অনেক বৈচিত্র্য নিয়ে, এশিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলির রূপরেখা তৈরীতে একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে এবং এশিয়ার সমাজগুলিকে পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলির তুলনায় একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরের সামাজিক শৃঙ্খলা দান করেছে।

৪.৩.২ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামিক মৌলবাদের বিকাশ

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির কাছে ইসলামিক মৌলবাদের উত্থান, যেটি বিশ্বের নব বিন্যাস (New World Order)-এর সঙ্গে সঙ্গে আরও ভয়ংকর আকার ধারণ করে, একটি বড় আশংকার কারণ হিসেবে গণ্য হয়। বলা হয়, এই অঞ্চলে ইসলামের প্রথম প্রবেশ ঘটে চতুর্দশ শতাব্দীতে ভারতের মধ্যে দিয়ে। বর্তমানে যেসব অঞ্চল ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড ইত্যাদি নামে পরিচিত, সেখানে পৌঁছানোর আগেই ইসলামের মধ্যে ভারতীয় সুফী অতীন্দ্রিয়বাদ সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল। ফলত ইসলামকে এই অঞ্চলের মানুষের মনে আগে হতেই গভীরভাবে প্রোথিত হিন্দু বৌদ্ধ পরম্পরার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়েছিল। অর্থাৎ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামের যে ব্রান্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা আবশ্যিকভাবেই ছিল কিছুটা নরমপন্থী।

কিন্তু, সাম্প্রতিকালে ইসলামি মৌলবাদ বা চরমপন্থার বৃদ্ধি এবং তাদের সঙ্গে বিভিন্ন আতঙ্কবাদী সংগঠনের যোগাযোগ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির কাছে রাজনৈতিকভাবে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, এমনকি বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপেরও প্রয়োজন হয়েছে, যেমন ফিলিপিনস্-এ যেখানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আবু সৈয়াফের দলের বিরুদ্ধে তাদের সামরিক কার্যকলাপ শুরু করেছে। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার নেতৃগণ বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাবে চিন্তা শুরু করেছেন। তাঁদের পক্ষে এটিই বিচক্ষণতার কাজ হবে, যদি তাঁরা সংহতিনাশক শক্তিগুলিকে শৃঙ্খলিত করে, উদারতা ও সহিষ্ণুতা, যা তাঁদের সমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল, তার পুনস্থাপনা করতে পারেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামিক মৌলবাদ কোনো নতুন জিনিস নয়। আগেও একাধিকবার এর পরিচয় পাওয়া গেছে।

এর একটি উদাহরণ হ'ল ইন্দোনেশিয়ার পাদ্রী আন্দোলন (Padri Movement)। উত্তর মালয়েশির কেলানটন্ এবং থাইল্যান্ডের দক্ষিণাংশে ইসলামিক মৌলবাদের প্রকাশ ঘটেছে। বর্তমানে, উত্তরের সমস্ত রাজ্যগুলি ইসলামিক মৌলবাদী দলগুলির রাজনৈতিক কর্তৃত্বাধীন আছে। ইন্দোনেশিয়ায় মৌলবাদের প্রবেশ ঘটেছে সাম্প্রতিক অতীতে, বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট সুহার্তোর পতনের পর। ইন্দোনেশিয়ার জেমাহ্ ইস্লামিয়াহ (Jemaah Islamiyah), যেটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইসলামিক আতঙ্কবাদী সংগঠন, তাদের সঙ্গে আল কায়দার যোগ আছে এবং তাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় সংযোগও আছে যার শিকড় চলে গেছে ১৯৪০ এর দশকের দার-উল-ইসলাম পর্য্যন্ত। একইভাবে, খ্রীষ্টান রাজ্যে ফিলিপিন্সেও, ইসলামিক মৌলবাদের উপস্থিতি খুবই স্পষ্ট। এখানে চরমপন্থী বিচ্ছিন্নতাকামী আবু সৈয়াফ, যারা মোরো ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্ট (MILF) এর একটি দলছুট গোষ্ঠী, পাশ্চাত্যের পর্যটকদের পণবন্দী করে রাখে। বিশ্বাস করা হয় যে এই আবু সৈয়াফ দলটি মুক্তিপণ হিসেবে লক্ষ লক্ষ পেসো আদায় করে তার বিনিময়ে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেছে এবং আল্ কায়দা গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পরিণতিতে, দক্ষিণের দ্বীপ বাসিলান, যেখানে বিচ্ছিন্নতাপন্থীরা অনেককে পণবন্দী করে রেখেছিল, সেখানে হাজার হাজার ফিলিপিনী সৈন্য ও শয়ে শয়ে আমেরিকান সৈন্য নিয়োজিত হয়েছিল। বেশ কয়েক মাসের প্রশিক্ষণ ও সহায়তার পর আমেরিকান সৈন্যরা সেখান থেকে সরে আসে। যাই হোক্, আবু সৈয়ফ কিন্তু দক্ষিণে অশান্তি চালাতেই থাকে। ২০০৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী এম. আই. এল. ফ. এবং সরকারের বিরুদ্ধে বোমা নিয়ে যে আক্রমণ হয়েছিল তার জন্য দায়ী ছিল এই গোষ্ঠী। এই যুদ্ধে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিদ্রোহী ২০০ জন সৈন্য মারা যায় এবং বিদ্রোহীদের শক্তঘাঁটী দক্ষিণ ফিলিপিনের কোটাবাটো (cotabato) প্রদেশটি সামরিক বাহিনীর দখলে চলে যায়।

যাই হোক্, মূল প্রশ্ন হ'ল কেন দক্ষিণ-পূর্ব ইসলামিক সম্প্রদায়, যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের সহিষ্ণুতা ও উদারতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন, তাঁর পশ্চিম এশিয়ার মার্কা মারা ইসলামিক মৌলবাদের শিকার হ'লেন? এতে কোন সন্দেহ নেই যে সৌদী ও উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলির টাকা মৌলবাদী কাজকর্মের গতিকে অনেকাংশে ত্বরান্বিত করেছিল। কিন্তু মৌলবাদের উত্থানে রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরীন আঞ্চলিক অর্থনৈতিক প্রভেদ একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এই অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলি হতেই গত ১০—১৫ বছর তরুণ সম্প্রদায়ের একটি বিরাট অংশ পাকিস্তান ও সৌদি আরবে ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনা সভাগুলিতে অংশগ্রহণ করতে চলে গিয়েছে। মৌলবাদের বিকাশের আরও একটি কারণ হল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে নির্বাচনী রাজনীতিতে এটির একটি বড় হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ানো। অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে ইসলাম পরিচিত ছিল নরমপন্থী ও গঠনাত্মক শক্তি হিসেবে, আন্তর্রাষ্ট্রীয় চরমপন্থী ইসলামের বিকাশ

এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামের পুনরুত্থান, তার সেই ভাবমূর্তিকে পরিবর্তিত করে এক চরমপন্থী ও হিংসাত্মক শক্তি হিসেবে এবং সৃষ্টি করে এক রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আঞ্চলিক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির।

৪.৩.৩ গণতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের মধ্যে সংগ্রাম

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গণতান্ত্রিক ও স্বৈরাতান্ত্রিক শাসনের মধ্যে সংঘর্ষ এই অঞ্চলের পক্ষে, বিশেষ করে বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের পরবর্তী সময়ে, একটি বড় ধরণের সংকট সৃষ্টি করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রায় সব কটি দেশেই রাজনৈতিক পরিকাঠামো দাঁড়িয়ে আছে হয় সামরিক শাসন, নয় আপাত-গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অথবা দলীয় একনায়কতন্ত্র ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে। ১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে গণতান্ত্রিকীকরণের প্রক্রিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি দেওয়া হচ্ছিল যে এই অঞ্চলের উচ্চগতি সম্পন্ন অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার যোগ আছে। সামরিক শাসনের বদলে আপাত-গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর প্রতিষ্ঠা করেও কিন্তু কখনই সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার কোনও পরিবর্তন করা যায়নি—সেটা স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা অথবা আইনের শাসন, যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন। এই তথাকথিত গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা করতেও ব্যর্থ হয়েছিল। ২০০১ সালের মার্চ মাসে 'পেটালিঙ্ জয়া সেলানটান' জবরদখল বসবাসের জায়গায় ভারতীয় ও মালয়ীদের মধ্যে যে জাতিগত দাঙ্গা বাধে তা গোটা মালয়েশিয়ায় প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং মালয়েশীয় সমাজের এতকালের প্রচলিত বহুমাত্রিক চরিত্রের সামনে একটি বিরাট প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দেয়। ফিলিপিন্স-এ ক্যাথোলিক ও মুসলিমদের মধ্যে সংঘর্ষ, যা সংখ্যা গুরু দ্বারা সংখ্যালঘুর বিরুদ্ধে স্থানীয়ভাবে বিভেদ সৃষ্টি করা ও বঞ্চনা করার অভিমতে ঘৃতাহুতি দিয়েছিল, সিঙ্গাপুরে তথাকথিত গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলি (যথা, একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র এবং মিটমাট করা বা সহমত তৈরী করার মতো কুশল উপায়ে রাজনৈতিক কাজকর্মের পরিচালনা, বিচার ব্যবস্থা ও সংবাদমাধ্যমের উপর সুকৌশল প্রভাব খাটানো ইত্যাদি)-র উপর পিপলস্ এ্যাকশন পার্টির কর্তৃত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলি পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে প্রোথিত গণতান্ত্রিক নিয়ম-নীতির অনুপস্থিতি স্পষ্ট করে দিয়েছিল। মায়ানমারে বিভিন্ন স্থানীয় জাতিগোষ্ঠীর উপর 'মায়ানমারীজ' জাতিগোষ্ঠীর স্বৈরাচারী উপায়ে কর্তৃত্বস্থাপনা স্পষ্ট ও জোরালোভাবে স্বৈরাচারী সামরিক জুনটার অবস্থানকে আইনসঙ্গত করে তুলেছিল। বার্মার সামরিক বাহিনী, যদিও বাস্তবে তারাই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছিল, আসলে নৈতিকভাবে তারা অন্তঃসার শূন্য হয়ে পড়েছিল এবং টিকে থাকার জন্য লড়াই করছিল, আর সেজন্যই গণতান্ত্রিকীকরণের জন্য সচেষ্ট হওয়ার মতো অবস্থায় ছিল না।

যদিও ইতিহাস সবসময় খুব নির্ভরযোগ্য পথ প্রদর্শক হয় না, তবুও অতীতে বার্মা ও ইন্দোনেশিয়ায় এবং বর্তমানে কাম্বোডিয়া, লাওস এবং ইন্দোনেশিয়ায় (১৯৯৬ সালে সুহার্তোর পতনের পর) রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়েছে একেবারেই আকস্মিক ও ভয়ানক হিংসাশ্রয়ী। কাম্বোডিয়াতে, ১৯৯৩ সালের শান্তি রক্ষা অভিযানের পর, গণতন্ত্র, আগামী দিনের চলার জন্য জাতীয় স্তরে সহমত প্রতিষ্ঠার বদলে যেন একটি চলমান "যুদ্ধে" পর্যবসিত হয়েছে। আগের মতো নিয়মিত হিংসাশ্রয়ী সংঘর্ষ এখন হয়তো আর ঘটে না, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বিজয়ী এবং দ্বিতীয় স্থানাধিকারী, অর্থাৎ বিরোধীপক্ষের মধ্যে ভালোরকম মিটমাট হচ্ছে, সমাজ ও রাজনীতি সামগ্রিকভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে রয়েছে এবং স্পষ্টভাবেই জাতীয় স্তরে সহমত স্থাপন ও গণতান্ত্রিকীকরণের প্রক্রিয়ায় বাধা দান করেছে। থাইল্যান্ডে, তার সামরিক শাসনের দীর্ঘ ইতিহাসের পর, ১৯৯২ সালে, মে-র ঘটনাবলী সুচিন্ডা সামরিক সর্বাধিনায়কত্বের অবসান ঘটায় এবং সংসদীয় প্রথার প্রবর্তন করে যাতে এখনও পর্য্যন্ত ক্ষমতা একটি শক্তিশালী সংসদীয় জোট সরকার হতে অন্য শক্তিশালী সংসদীয় জোট সরকারের হাতে ন্যস্ত হয়েছে।

বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া, যেটি ১৯৯০ এর দশকের প্রথম থেকে আরও দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়, সেটি গণতান্ত্রিকীকরণের এক নতুন জোয়ার এনেছিল এবং স্বৈরাচারী সরকারের দুর্বলতাগুলিকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছিল। এই দুর্বলতাগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংগঠনের অনুপস্থিতি এবং রাজনৈতিক বৈধতা বজায় রাখার জন্য অর্থনৈতিক সাফল্যের উপর নির্ভরশীলতা। যদিও বিশ্বের নতুন বিন্যাসের পটভূমিতে স্বৈরতান্ত্রিক মতবাদ তার গুরুত্ব ক্রমেই হারিয়ে ফেলছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তার স্থলাভিষিক্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লবও গত কয়েক বছরে তার স্রোত হারিয়ে ফেলেছে। প্রায় সবকটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রে, অবাধ নির্বাচন, দলগত প্রতিদ্বন্দ্বীতা, ক্ষমতার পৃথকীকরণ ইত্যাদি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলি তাদের অভিনবত্ব নষ্ট করে ফেলে গণতান্ত্রিক কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত প্রচুর অসন্তোষের উৎসের সন্ধান দেয় এবং তারপরেই রাষ্ট্রদ্রোহী অভিজাত সম্প্রদায় স্বৈরতান্ত্রিক শাসনকে উৎখাত করে তাদের নিজেদের পছন্দমতো শাসন ব্যবস্থার ছক কষে। তাছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই অঞ্চলে একটা সন্দেহ থেকেই যায় যে এখানে গণতন্ত্রের মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের, সেটা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীগত, জাতিগত বা ধর্মগত, যে কোন কারণেই হোক না কেন, স্বার্থরক্ষা আদৌ সম্ভব কিনা, কারণ গণতন্ত্র, সংজ্ঞা অনুযায়ী সংখ্যাগুরুদের দ্বারা তৈরী শাসনব্যবস্থা। যেমন, এটা মোটেও পরিষ্কার নয় যে, থাইল্যান্ডে, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ থাই-রা সবকিছু প্রভাবিত করে, সেখানের মুসলিমদের পক্ষে, স্বৈরাচারী সরকারের চেয়ে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বেশী ভালো কিনা। এটা খুবই স্পষ্ট যে, ১১ বছরের গণতন্ত্র দক্ষিণ

ফিলিপিনস্-এর মুসলিমদের জন্য কোনো উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক লাভ এনে দিতে পারেনি। অর্থাৎ, সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় স্বৈরাচারী শাসনের মান গণতান্ত্রিক সরকারের সময়ের চেয়ে খুব বেশী খারাপ ছিল না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক রাজনীতির ক্ষেত্রে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিতে গণতান্ত্রিক বনাম স্বৈরতান্ত্রিক শাসন নিয়ে বিতর্ক অথবা ভিন্ন ভিন্ন গণতান্ত্রিক কাঠামোকে নিয়ে বিতর্ক প্রায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। এছাড়াও, অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের কথা বলতে গেলে, ইন্দোনেশিয়ার ১৯৯৭ সালের অর্থনৈতিক সংকট এশিয়ান (ASEAN) সদস্যভুক্ত দেশগুলির ওপর এবং সংঘের নির্দিষ্ট প্রকৃতির উপর খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল। অর্থনৈতিক সংকটের 'সদর্থক' পরিণতি হিসাবে ইন্দোনেশিয়ায় যে রাজনৈতিক সংস্কার সংঘটিত হয় তা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ইন্দোনেশিয়ায় নতুন আশার সঞ্চার করে। এছাড়াও, এটা বাস্তব সত্য যে গণতন্ত্রের কোনও অমোঘ সর্বজনীন মূল্যবোধ একভাবে সকল রাষ্ট্রের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না, এবং এটা মনে হয় যে আশিয়ানের (ASEAN)-এর কোনও কোনও সদস্য রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্র অপেক্ষা অধিকতর গণতান্ত্রিক। পরিণামে, এটাই আশিয়ান-এর সদস্যদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করতে পারে।

৪.৩.৪ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপর বিকল্প আলোচনা

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি, বিশেষতঃ আশিয়ান (ASEAN)-এর সদস্য রাষ্ট্রগুলি, ১৯৬৭ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় থেকেই বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিল। এটির সূচনাকাল থেকে ঠাণ্ডা লড়াই (Cold War) শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সময়কালে, এশিয়ানের প্রধান দুশ্চিন্তার বিষয় ছিল রাষ্ট্রগুলির সুরক্ষার বিরুদ্ধে সামরিক হুমকির মোকাবিলা করা। ঠাণ্ডা লড়াই শেষ হওয়ার পর, যখন সামরিক সংঘর্ষ থিতিয়ে গেল, তখন সমস্যা শুরু হল অন্য দিক থেকে, যেমন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সহযোগিতা এইসব প্রশ্নে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তার মধ্যে 'পূর্ব-এশিয়ার অর্থনৈতিক সংকট'-ই সম্ভবত সবচেয়ে বড় সমস্যা। অর্থনৈতিক সংকটের ফলে এশিয়ার অর্থনৈতিক বিস্ময়-এর উপর বিশ্বাস প্রবলভাবে ধাক্কা খায়। দ্রুতগতির বিশ্বায়ন এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে পারস্পরিক নির্ভরতার 'সুফল' বিষয়ে এই অঞ্চলের মানুষের মনে প্রবল সন্দেহের জন্ম হয়। বিশ্বায়ন, যেটি এই অঞ্চলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা ছিল, তার উপর অর্থনৈতিক সংকটকে একটি দেশ থেকে সমগ্র অঞ্চলে সংক্রমিত করে দেওয়ার জন্য দোষারোপ করা হয়।

বিশ্বায়নের ফলাফল ছিল বহুমুখী। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এর সুরক্ষা সংক্রান্ত পরিবেশকে বিশ্বায়ন এমনভাবে তৈরী করে দিয়েছিল যাতে ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি ও সরকারের

পারস্পরিক সম্পর্ক সেই পরিকাঠামোর উপর নির্ভর করেই চলতে পারে। এর নামমাত্র ইতিবাচক দিক ছাড়াও, বিশ্বায়নের নেতিবাচক দিকও আছে যেটি প্রকাশিত হয়েছে অর্থনৈতিক সংকটের সংক্রামক প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে। অতএব, এখন প্রশ্ন উঠেছে যে বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার বিকল্প কোনও ব্যবস্থা গড়ে কি সম্ভব? নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার মতাদর্শভিত্তিক এবং অর্থনৈতিক সম্পাদ্য কর্মসূচীগুলি ছিল বিশ্বায়িত সরকারী নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত পুঁজিবাদ যা আসলে "মুক্ত-বাণিজ্য", "বর্জিত প্রতিযোগিতার মনোভাব" ইত্যাদি আলংকারিক শব্দগুচ্ছ দিয়ে ঢাকা ছিল। তথাকথিত মুক্ত-বাণিজ্যের চুক্তিগুলি কিন্তু বাণিজ্য বিষয়ে হয়নি, হয়েছিল বিশ্বের অর্থনৈতিক উপাদানের যোগান ও শ্রমিক সরবরাহ যাতে বহুজাতিক সংস্থাগুলি অনিয়ন্ত্রিত শোষণের অধীনে আসতে পারে সেই বিষয়ে। নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীর বিষয় ছিল সমাজ ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে রাষ্ট্রের গুরুত্ব নষ্ট করে দেওয়া। নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার ভাবধারা প্রচারের প্রধান বাহক ছিল বিশ্বব্যাপী গণ মাধ্যম যার মালিকানা ক্রমশই কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল মুষ্টিমেয় যৌথ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের হাতে। এই সংবাদ সংস্থাগুলি, মনোরঞ্জনের মাধ্যমে ও প্রচার মাধ্যমগুলি নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার স্বার্থ ও কর্মসূচী অনুযায়ী বিশ্বে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর প্রচণ্ড রকমের একপেশে এবং পছন্দমতো ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করতে থাকে। যাইহোক্, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে এই নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা হ'ল নিম্নরূপ ঃ

১। অন্তর্নিহিত ভাবেই সামাজিক দিক থেকে অনৈতিক। এর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল যৌথ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের শক্তির প্রসার ঘটানো ও গরীবের সম্পদ একত্রিত করা এবং সমগ্র পৃথিবীব্যাপী এমন একটি রাজনৈতিক পরিমণ্ডল তৈরী করা যাতে ঐ গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যগুলি দ্রুতগতিতে সাধিত হয়।

২। চারিত্রিক ভাবে এটি আগ্রাসী

৩। অন্তর্নিহিতভাবে এটি অ-গণতান্ত্রিক গুণবিশিষ্ট।

৪। এটি সরাসরিভাবে জাতীয় সার্বভৌমত্বের বিরোধিতা করে এবং স্পষ্টতই দায়বদ্ধতাহীন আর্ন্তজাতিকতার পৃষ্ঠপোষকতা করে।

ব্যাঙ্ককে ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত জাতি সংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়নের সভায় (ইউনাইটেড নেশনস্ কনফারেন্স অন ট্রেড এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নেতৃবৃন্দ নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নতুন বিশ্বব্যাপী ব্যবস্থার (নিউ গ্লোবাল অর্ডার) দাবী জানান। এই সভায় সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী গো চক্ টঙ্ দাবী করেন যে

এমন একটা সময়ে যখন এর সুফলভোগের আওতার বাইরে রাখা রাষ্ট্র ও গোষ্ঠীগুলির কাছ থেকে মুক্ত বাণিজ্য ও উদারীকরণ প্রক্রিয়া বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হ'চ্ছে, তখন আঙ্কটাড এর উচিৎ এমন ব্যবস্থার সৃষ্টি করা যাতে বাণিজ্য ও উন্নয়নের একটি নিরপেক্ষ নীতির প্রণয়ন ঘটে। গো চক টঙের মতোই মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মহাথীর মহম্মদ ও দৃঢ়ভাবে দাবী করেন যে সমগ্র বিশ্বের বাজারে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া আছে তাতে উন্নয়নশীল দেশগুলিকেও অংশগ্রহণের অধিকার দেওয়া উচিৎ যাতে উদারীকরণ ও বিশ্বায়নের গতি ও দিশা সঠিকভাবে পরিচালিত হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি ১৯৯৬ সালের আগষ্ট মাসে ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত "দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ২০০০ সালের পরে ঃ একটি রূপরেখার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ" (সাউথ-ইষ্ট এশিয়া বিয়ণ্ড দি ইয়ার ২০০০ ঃ এ স্টেটমেন্ট অফ্ ভিশন) শীর্ষক একটি আলোচনা চক্রে এই অঞ্চলটির ভবিষ্যতের চলার পথ সুদৃঢ়ভাবে প্রকাশ্যে নিয়ে আসেন এবং নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে নতুন কিছু নিয়ম জনসমক্ষে অনুমোদন করেন। এটি জোর দেয় "জনগোষ্ঠী তৈরী" (কমিউনিটি বিল্ডিং)-র মানসিকতার উপর, যেটি আসলে একটি নতুন ধরণের মানসিক অনুভূতি তৈরীর প্রক্রিয়া। এটি নির্দেশ করে একটি "মানবিক কর্মসূচী" (হিউম্যান এজেন্ডা)র যেটি আঞ্চলিক সরকারগুলির ব্যক্তি বিশেষের ও সমষ্টির অগ্রাধিকারের সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত ব্যাপ্ত করে দিতে হবে একবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জনগোষ্ঠী (সাউথ-ইষ্ট এশিয়ান কমিউনিটি) তৈরীতে মানবিক কর্মসূচীর সফল প্রয়োগকেই সিদ্ধিলাভের মূলনীতি হিসেবে গণ্য করতে হবে। এই দেশগুলি কতকগুলি বিশেষ মূলতত্বের নির্দেশ করেছিল যেগুলি হল ঃ

১। আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও অন্তদেশীয় সর্বস্তরে শান্তি।

২। শারিরীক ও জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য, যার অর্থ যারা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে না তাদের রক্ষার্থে অথবা নিতান্ত প্রয়োজন হ'লে নিরপেক্ষতা রক্ষার স্বার্থে, এগুলি ব্যতীত সরকার কখনই হস্তক্ষেপ করবে না এবং দক্ষতা ও বন্টনব্যবস্থা নির্ধারিত হ'বে খোলা বাজার অর্থনীতির নিয়মানুসারে। এই কর্মসূচীর সঠিক রূপায়নের জন্য এই অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক সীমানা ছাড়িয়ে এবং অঞ্চলের বাইরে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের মধ্যেও মালপত্র ও পরিষেবা, মূলধন ও শ্রম, তথ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যা ইত্যাদির অবাধ চলাচল প্রয়োজন।

৩। পরিবার নামক প্রথাটিকে সুরক্ষিত রাখা।

৪। আইনের শাসন, পরম্পরাগত মূল্যবোধ, শিক্ষা ও নিয়োগের মাধ্যমে প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের মর্য্যাদা রক্ষা করা এবং মর্য্যাদা বৃদ্ধি করা।

৫। স্থানীয় স্তরে সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার মনোভাব জোরদার করা।

৬। আরও বেশী যুক্তি সম্মত, সম অধিকার সম্পন্ন, সহিষ্ণু ও সহানুভূতিশীল সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজন।

৭। অধিকতর সামাজিক নিরপেক্ষতাকে উৎসাহিত করা।

৮। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা।

৯। "সংস্কৃতিক ঐক্য" গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরী।

১০। সবাইকে খোলা মনে এগিয়ে আসতে হবে।

এই চিন্তাধারা কিছুটা অবাস্তব মনে হলেও নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার পটভূমিকায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির এটিই সাধারণ মনোভাব।

৪.৪ সারসংক্ষেপ

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি গত চার দশক ধরে তাদের আঞ্চলিক সংগঠন এশিয়ান (ASEAN) এর মাধ্যমে শুধু যে টিকে আছে তাই নয়, আন্তর্জাতিকভাবে নিজে দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক শান্তি ও সুরক্ষাকে আরও জোরদার করতে এবং এখানকার সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে 'এশিয়ান'-এর উপস্থিতি নিঃসন্দেহে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এশিয়ান উপলব্ধি করেছে যে তার সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এবং মানুষের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। কিন্তু সেই পার্থক্যগুলি কখনই এশিয়ানের মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে রচিত করা সাধারণ লক্ষ্যে পৌঁছতে এশিয়ানের সদস্য রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সহযোগিতার ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করবে না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিকে ১৯৯৭ সালের অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে পড়তে হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তারা সেই সঙ্কটের মোকাবিলা করে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। সর্বোপরি, তাদের একই ধরণের সমস্যা ও সংঘর্ষ তাদের নিজেদের মধ্যের সহযোগিতা, সংহতি ও সাংস্কৃতিক পরিপূরকত্বকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছিল।

নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার পটভূমিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি বিদেশী বিনিয়োগকারীদের কাছে নিজেদের আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য আরও বেশী করে সচেষ্ট হয়ে উঠেছিল, কিন্তু বিশ্বায়নের জন্য তাদের

নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যেতে দেয়নি। বিশ্বায়নের সদর্থক দিকের বিস্তারের কথা বলতে গেলে এখনও পর্য্যন্ত এই পরিবর্তনগুলো সদর্থকই বলা যায়। এছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি, এশিয়ানের মাধ্যমে, বিশ্বে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধির ব্যাপারটি একদম শুরুতেই স্বীকৃতি দেয়। এই উদ্দেশ্যে তারা উন্নত ও উন্নতিশীল দুই ধরণেরই বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস চালায়। অন্যভাবে বলতে গেলে, বিশ্বের সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য আগে বিভিন্ন দেশে যেভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতো সেই জাতীয় স্তরে দৃঢ়ভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করে অন্যের মান্যতা আদায় করার পথে নয়, এশিয়ান এগিয়ে এসেছিল বৃহত্তর আঞ্চলিক সংহতি ও সহযোগিতার পথে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে গড়ে ওঠা এই নতুন ধরণের সংহতিকে প্রভাবশালী পাশ্চাত্য (আমেরিকার দ্বারা চালিত) মডেলের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি মডেল হিসেবে দেখা হবে কিনা অথবা পরম্পরাগত দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার থেকে আলাদা করে দেখা হবে কিনা তা সুস্পষ্ট পর্য্যবেক্ষণের পরেই বোঝা যাবে।

৪.৫ নমুনা প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী ঃ

১। এটা কি সত্যি যে বিশ্বায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত শক্তিগুলি এই অঞ্চলে অধিকতর গণতান্ত্রিক পদ্ধতি আনয়ন করেছিল? ব্যাখ্যা করুন।

২। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গণতান্ত্রিক এবং স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির মধ্যে যে সংঘর্ষ তার বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করুন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী ঃ

১। এশিয়ার মূল্যবোধ বিতর্ক (ASIAN VALUES DEBATE) পরিষ্কারভাবে আলোচনা করুন।

২। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামিক মৌলবাদের বিকাশ বিশ্বায়নের সঙ্গে সরাসরিভাবে কতটা জড়িত বলে আপনি মনে করেন?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ

১। এশিয় মূল্যবোধ বলতে কি বোঝেন?

২। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দৃষ্টিতে বিশ্ব ব্যবস্থার প্রকৃতি লিখুন।

৪.৬ নির্বাচিত গ্রন্থ

1. Tridib Chakraborti, "Emerging Threats in Southeast Asia in the Post-Cold War Era : Towards an Alternative Discourse," in Partha Pratim Basu, Purushottam Bhattacharya, Rochona Das, Anjali Ghosh and Kanak Chandra Sarkar(eds.), *State, Nation and Democracy: Alternative Global Futures*, Concept Publishing Company, New Delhi, 2007.
2. David Brown, *The state and ethnic politics in Southeast Asia*, Routledge, London, 1994.
3. Tridib Chakraborti, "Terrorism and the ASEAN States: A Classificatory and Perspective Analysis," in Omprakash Mishra and Sucheta Ghosh (eds.), *Terrorism and low Intensity Conflict in South Asian Region*, Manak Publications Pvt. Ltd., New Delhi, 2003.
3. Globalization and the new Realities, Selected Speeches of Dr. Mahathir Mohammed, Pelanduk Publications (M) Sdn. Bhd, Selangor, Malaysia, 2002.

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে ; সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

—সুভাষচন্দ্র বসু

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

—Subhas Chandra Bose

Price : Rs. 225.00

(NSOU-র ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নয়)

Published by : Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-I, Salt Lake, Kolkata-700 064
and Printed at : SEVA MUDRAN, 43, Kailash Bose Street, Kolkata-700 006